জননী

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়



জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড
১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক: শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ
জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ
১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা

আড়াই টাকা
দ্বিতীয় সংস্করণ
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫২

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেডের
মুদ্রণ বিভাগে [অবিনাশ প্রেস—১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট,
কলিকাতা] শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস এম-এ কর্তৃক মুদ্রিত

এক

সাত বছর বধূজীবন যাপন করিবার পর বাইশ বছর বয়সে শীতলের দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী শ্যামা প্রথমবার মা হইল। এতকাল অনুর্বরা থাকিয়া সন্তানলাভের আশা সে একরকম ছাড়িয়াই দিয়াছিল। ব্যর্থ আশাকে মানুষ আর কতকাল পোষণ করিতে পারে। সাতবছর বন্ধ্যা হইয়া থাকা প্রায় বন্ধ্যাত্বের প্রমাণেরই সামিল। শ্যামাও তাই জানিয়া রাখিয়াছিল। সে তার মায়ের একমাত্র সন্তান। একমাত্র সন্তান না হইয়া তার উপায় অবশ্য ছিল না, কারণ সে মাতৃগর্ভে থাকিতেই তার বাবা ব্রহ্মপুত্রে নৌকাডুবি হইয়া মারা যায়। তারপর তার আর ভাইবোন হইলে সে বড় কলঙ্কের কথা হইত। শ্যামার যেন তাহা খেয়াল থাকে না। সে যেন ভুলিয়া যায় যে তার বাবা বাঁচিয়া থাকিলে সাতভাই চম্পার একবোন পারুলই হয়ত সে হইত, বোনও যে তাহার দু'পাঁচটি থাকিত না তাই বা কে বলিতে পারে? তবু, একটা যুক্তিহীন ছেলেমানুষী ধারণা সে করিয়া রাখিয়াছিল যে সে নিজে যখন একমাত্র একমেয়ে দুটি একটির বেশী ছেলেমেয়ে তারও হইবে না।—বড় জোর তিনটি। গোড়ার কয়েক বছরের মধ্যেই এরা আসিয়া পড়িবে এই ছিল শ্যামার বিশ্বাস। তৃতীয় বছরেও মাতৃত্বলাভ না করিয়া সে তাই ভীত হইয়া উঠিয়াছিল। তার পরের চারটা বছর সে পূজা, মানত, জলপড়া, কবচ প্রভৃতি দৈব উপায়ে নিজেকে উর্বরা করিয়া তুলিতেই একরকম ব্যয় করিয়াছে। শেষে, সময়মত মা না হওয়ার জন্য এবং দৈব উপায়ে মা হইবার চেষ্টা করার জন্য নানাবিধ মানসিক বিপর্যয়ের পর তার যখন প্রায় হিস্টিরিয়া জন্মিয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছে তখন ফাল্গুনের এক দুপুরবেলা ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া শীতলপাটিতে গা ঢালিয়া ঘুমের আয়োজন করিবার সময় সহসা বিনাভূমিকায় আকাশ হইতে নামিয়া আসিল সন্দেহ। বাড়িতে তখন কেহ ছিল না। দুপুরে বাড়িতে কেহ কোনদিনই প্রায় থাকিত না,

থাকিবার কেহ ছিল না—আত্মীয় অথবা বন্ধু। সন্দেহ করিয়াই শ্যামার এমন বুক ধড়ফড় করিতে লাগিল যে তার ভয় হইল হঠাৎ বুঝি তার ভয়ানক অসুখ করিয়াছে। সারাটা দুপুর সে ক্রমান্বয়ে শীত ও গ্রীষ্ম এবং রোমাঞ্চ অনুভব করিয়া কাটাইয়া দিল। সন্দেহ প্রত্যয় হইল একমাসে। কড়া শীতেব সঙ্গে শ্যামার অজ্ঞাতে যাহার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল সে জন্ম লইল শবৎ-কালে। জগজ্জননী শ্যামা জগতে আসিয়া মানবী শ্যামাকে একেবারে সাত-দিনের পুরাতন জননী হিসাবে দেখিলেন।

শ্যামার বধূজীবনের সমস্ত বিস্ময় ও রহস্য, প্রত্যাশা ও উত্তেজনা তখন নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। নিঃশেষ হইবার আগে ওসব যে তাহার খুব বেশি পরিমাণে ছিল তা বলা যাম না। জীবনে শ্যামাব যদি কোনদিন কোন অসাধারণত্ব থাকিয়া থাকে সে তাহার আ[illegible]ের একান্ত অভাব। জন্মের পর জগতে শ্যামার আপনার বলিতে ছিল মা আর এক মামা। এগার বছর বয়সে সে মাকে হারায়। মামাকে হারায বিবাহের এক বছরের মধ্যে। মামার কিছু সম্পত্তি ছিল। প্রকৃতপক্ষে, উত্তরাধিকারীবিহীন এই মামাটির কিছু সম্পত্তি না থাকিলে শীতল শ্যামাকে বিবাহ করিত কিনা সন্দেহ।

মৃত্যুর মধ্যে মামাকে হারাইলে সম্পত্তি শ্যামা পাইত সন্দেহ নাই। কিন্তু শ্যামার বিবাহের পর একা থাকিতে থাকিতে মামার মাথার কি যে গোলমাল হইয়া গেল, নিজের যা-কিছু ছিল চুপিচুপি জলেব দামে সমস্ত বিক্রয় করিয়া দিয়া একদিন তিনি উধাও হইয়া গেলেন। একা গেলেন না। শ্যামার মামাবাড়ির গ্রামে আজীবন সন্ন্যাসীঘেঁষা প্রৌঢ়বযসী ব্রহ্মচাবী মামাটির কীর্তি এখনো প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। প্রসিদ্ধ হইয়া আছে এইজন্য যে শ্যামার মামা সামান্যলোক হইলেও আসল কলঙ্ক যাদের তাদের চেয়ে বনেদী ঘর আশে পাশে দশটা গ্রামে আর নাই। এই গেল শ্যামার দিকের হিসাব। স্বামীর দিকের হিসাব ধরিলে বিবাহের পর শ্যামা পাইয়াছিল শুধু একটি বিবাহিতা রুগ্না ননদকে।

সে মন্দাকিনী।

প্রথমবার স্বামীগৃহে আসিয়া শ্যামা কোনদিকে তাকানোর অবসর পায় নাই। মন্দাকিনী তখন সুস্থ ছিল। নিজের নানাপ্রকার বিচিত্র

অনুভূতি, প্রতিবেশিনীদের ভিড়, বৌভাতের গোলমাল সব মিলিয়া তাহাকে একটু উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। মামার কাছে ফিরিয়া যাওয়ার সময় সে শুধু সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল কয়েকটা হৈ-চৈ ভরা দিনের স্মৃতি। ছ'মাস পরে এক আসন্ন-সন্ধ্যায় আবাব এ বাড়িতে পা দিয়া চোখে সে দেখিয়াছিল অন্ধকার। একি অবস্থা বাড়ি-ঘরের? বাড়িতে মানুষ কই? লণ্ঠন দুটা ধোঁয়া ছাড়িতেছে, উঠানে পোড়া কয়লা ছাই ও হাজার রকম জঞ্জালের গাদা, দেয়ালে দেয়ালে ঝুল, পায়ের তলে ধুলোবালির স্তর! আর একঘরে মরমর একটা মানুষ।

সে মন্দাকিনী।

শীতল বলিয়াছিল, সব দেখে শুনে নাও। এবাব থেকে সব ভার তোমার।

বলিয়া সে উধাও হইয়া গিয়াছিল। বোধ হয খাবার কিনিতে,-- এ বাড়িতে রান্নাব কোন ব্যবস্থা আছে শ্যামা তাহা ভাবিতে পারে নাই। সেইখানে, ভিতবের রোযাকে তাহাব ট্রাঙ্কটার উপর বসিয়া, ভয়ে ও বিষাদে শ্যামাব কান্না আসিতেছে, এমন সময় সদরের খোলা দরজা দিয়া বাড়িতে ঢুকিয়াছিল লম্বা-চওড়া যোয়ান একটা মানুষ।

সে রাখাল। মন্দাকিনীর স্বামী।

এই রাখালের সাহায্য না পাইলে শ্যামা তাহার নূতন জীবনের সঙ্গে নিজেকে কিভাবে খাপ খাওযাইযা লইত জানিবাব উপায় নাই, কারণ রাখালের সাহায্য সে পাইয়াছিল। শুধু সাহায্য নয়, দরদ ও সহানুভূতি। এতদিন রাখাল যে সব ব্যবস্থা করিতে পারিত কিন্তু করে নাই, এবার শ্যামার সঙ্গে সমস্তই সে করিয়া ফেলিল। প্রথমে বাড়িঘর সাফ হইল। তারপর আসিল কুকারের বদলে পাচক, ঠিকা ঝির বদলে দিবারাত্রির পরিচারিকা। হাটবাজার রান্নাখাওয়া সব অনেকটা নিয়মিত হইয়া আসিল।

মন্দার চিকিৎসার জন্য রাখাল আরও পাঁচ ছয় মাস এখানে ছিল। সে সময়টা শ্যামার বড় সুখে কাটিয়াছিল। সে সময়মত স্নানাহার করে কিনা রাখাল সেদিকে নজর রাখিত, হাসি তামাসায় তাহার বিষণ্ণতা দূর করিবার চেষ্টা করিত, শ্যামার বয়সোচিত ছেলেমানুষীগুলি সমর্থন পাইত তারই

কাছে। শীতলের মাথায় যে একটু ছিট আছে এটা শ্যামা গোড়াতেই টের পাইয়াছিল। শীতলকে সে বড় ভয় করিত, পুরানো হইয়া আসিলেও এখন পর্যন্ত সে ভয় তাহার রহিয়া গিয়াছে। শীতলের না ছিল নেশার সময়-অসময়, না ছিল খেয়ালের অন্ত ও মেজাজের ঠিক-ঠিকানা। প্রথম ছেলেকে কোলে পাইয়া শ্যামা পূর্ববর্তী সাতটা বছরের ইতিহাস আঁতুড়েই অনেক-বার স্মরণ করিয়াছে—যে সব দোষের জন্য শীতল তাহাকে শাস্তি দিয়াছিল তাহা মনে করিয়া জ্বলিবার নয়—শীতল সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিয়াছিল নিজের এমন একটিমাত্র লঘু অপরাধের কথা যদি মনে পড়িয়া যায়, এই আশায়। শীতলের কাছে তাহার কোন ত্রুটির মার্জনা না থাকাটা ছিল এত বড় নিরেট সত্য! কেবল রাখালের কাছেই শ্যামার অপরাধও ছিল না, ত্রুটিও ছিল না। রাখালের এই সহিষ্ণুতা শ্যামার কাছে আরও পূজ্য হইয়া উঠিবার অন্য একটি কারণ ছিল। সে মন্দার গালাগালি। মন্দার অসুখটা ছিল মারাত্মক। স্বভাবও তাহার হইয়া উঠিয়াছিল মারাত্মক। মন্দার পান হইতে চুনটি শ্যামা কখনো খসাইত না বটে—পান মন্দা খাইত না, কারণ পান খাওয়ার ক্ষমতা তাহার ছিল না—অনুরূপ তুচ্ছ অপরাধে চিঁচিঁ করিয়া সে এত এবং এমন সব খারাপ কথা বলিত যে শ্যামার মন তিক্ত হইয়া যাইত। শীতলের কোলে গরম চা ফেলিয়া (ভয়ে) গালে একটা চড় খাওয়ার পরক্ষণেই বার্লি দিতে পাঁচমিনিট দেরি করার জন্য (গালে চড় খাইলে মিনিট পাঁচেক না কাঁদিয়া সে পারিত না) মন্দার গাল খাইয়া নিজেকে যখন শ্যামার বিনা-মূল্যে কেনা দাসীর চেয়ে কম দামী মনে হইত, রাখাল তখন তাহাকে কিনিয়া লইত দুটি মিষ্টি কথা দিয়া।

শুধু সান্ত্বনা ও সহানুভূতি নয়, রাখাল তাহার অনেক লাঞ্ছনাও বাঁচাইয়া চলিত। কতদিন গভীর রাত্রিতে শীতল বাড়ি ফিরিলে (বন্ধুরা ফিরাইয়া দিয়া যাইত) রাখাল তাহাকে বাহিরে আটকাইয়া রাখিয়াছে, শ্যামার কত অপরাধের শাস্তি দিতে আসিয়া শীতল দেখিয়াছে রাখাল সে অপরাধের অংশীদার, শ্যামাকে শাসন করিবার উপায় নাই। শীতলের কত অসম্ভব সেবার আদেশ রাখাল যাচিয়া বাতিল করিয়া দিয়াছে।

স্বামীর বিরুদ্ধে এভাবে স্ত্রীর পক্ষ অবলম্বন করা বিপজ্জনক,

বিশেষ স্ত্রীটির যদি বয়স বেশি না হয। স্বামী নানারকম সন্দেহ করিয়া বসে। কিন্তু রাখাল ছিল অত্যন্ত বুদ্ধিমান, চালাকিতে সংসারে শ্যামা তার জুড়ি দেখে নাই। যেসব আশ্চর্য কৌশলে শীতলকে সে সামলাইয়া চলিত, শ্যামাকে আড়াল করিয়া রাখিত, আজও মাঝে মাঝে অবাক হইয়া শ্যামা সে সব ভাবে। মন্দা সুস্থ হইযা উঠিলে রাখাল তাহাকে লইযা চলিয়া গিয়াছিল বনগাঁ। কলিকাতায় এত আপিস থাকিতে বনগাঁয়ে তাহার চাকরী করিতে যাওযা শ্যামা পছন্দ কবে নাই। একদিন, বাখালদের চলিয়া যাওয়ার আগের দিন, ওই কথা লইয়া বাগারাগিও সে করিয়াছিল। বযস তো শ্যামার বেশি ছিল না। জগতে কাবো স্নেহে যে কারো দাবী জন্মে না এটা সে জানিত না। আকুল আগ্রহে বিনা দাবীতেই স্বামীর চেযে আপনার লোকটিকে সে ধবিয়া বাখিতে চাহিযাছিল। বাখাল চলিয়া গেলে সে দু'চাবদিন চোখের জল ফেলিযাছিল কিনা, আজ, প্রথম সন্তানের মা হওয়ার পর, শ্যামার আর তাহা স্মবণ নাই। সমস্ত নালিশ সে ভুলিযা গিযাছে। সেই উদ্‌ভ্রান্ত দিনগুলিকে হযত সে রহস্যে ঢাকিযা বাখিতে ভালবাসে, কারণ তাহাই স্বাভাবিক। যতই আপনার হইযা উঠুক, বাখালকে শ্যামা একফোঁটা বুঝিত না, লোকটার প্রকাণ্ড শবীরে যে মনটি ছিল তাহা শিশুব না সয়তানের কোনদিন তাহা সঠিক জানিবাব ভরসা শ্যামা বাখে না। তখন দ্বিপ্রহরে গৃহ থাকিত নির্জন, সন্ধ্যাব পর দু'টি ভাঙ্গা লণ্ঠনেব আলোয় বাড়ির অর্ধেকও আলো হইত না। শীতল যেদিন বাত্রে দেরী কবিযা বাড়ি ফিবিত, দাওয়ায় ঠেস দিয়া বসিযা তাহার প্রতীক্ষা করিতে করিতে নিযমাধীন জীবনযাপন স্বভাবতই শ্যামার কাছে অবাস্তব হইযা উঠিত,- বযস তো তাহার বেশি ছিল না। সুতরাং বাখালকেও তাহার মনে হইত নির্মম, মনে হইত লোকটা স্নেহ করে, কিন্তু স্নেহের প্রত্যাশা মিটায় না।

শীতলের তখন নিজের একটা প্রেস ছিল, মন্দ আয় হইত না। তবু, অভাব তাহাব লাগিযাই থাকিত। শীতলের মাথায ছিট ছিল রকমারি, অর্থ সম্বন্ধে একটা বিকৃত উদাসীনতা ছিল তার মধ্যে সেরা। তাহার মনকে বিশ্লেষণ করিলে যোগাযোগ খুঁজিয়া পাওযা যায় সন্দেহ নাই, কেবল, সে চেষ্টা করিবার মত অসাধারণ মানসিক বৈশিষ্ট ইহা নয। টাকার প্রতি

মমতার অভাবটা অনেকেই নানা উপায়ে ঘোষণা করিয়া থাকে। শীতলের উপায়টা ছিল বিকারগ্রস্ত—তাহার ভীরুতা ও দুর্বলতার বিষে বিষাক্ত। যেসব বোকার দল চিরকাল বুদ্ধিমানদের ভোজ দিয়া আসিযাছে, সে ছিল তাদের রাজা। বন্ধুরা পিঠ চাপড়াইয়া তাহার মনকে গড়ের মাঠের সঙ্গে তুলনা করিত, তাই পাছে কেহ টের পায় যে মন তাহার আসলে বড়বাজারের গলি, এই ভযে সর্বদা সে সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিত। ফেরত পাইবে না জানিযা টাকা ধার দিত সে, চাঁদাব খাতায় মোটা টাকা সই করিত সে, থিয়েটারের বক্স ভাড়া করিত সে, মদ ও আনুষঙ্গিকের টাকা আসিত তাহারই পকেট হইতে। বিকালের দিকে প্রেসের ছোট আপিসটিতে হাসিমুখে সিগারেট টানিতে টানিতে দুচাব জন বন্ধুর আবির্ভাব হইলে ভযে তাহাব মুখ কালো হইযা যাইত। পাগলামি ছিল তাহার এইখানে। সে জানিত বোকা পাইযা সকলে তাহাব ঘাড় ভাঙ্গে, তবু ঘাড় ভাঙ্গিতে না দিযাও সে পারিত না।

শেষে, শ্যামার বিবাহের প্রায় চারবছব পরে, শীতলের প্রেস বিক্রয হইয়া গেল। আবোল তাবোল যেমনি খরচ করুক আয় ভাল থাকায এতকাল মোটামুটি একরকম চলিয়া যাইত, প্রেস বিক্রয় হইযা যাওয়ার পর তাহাদেব কষ্টের সীমা ছিল না। বাড়িটা পৈত্রিক না হইলে মাঝখানে কিছুদিনের জন্য হযত তাহাদের গাছতলাই সার করিতে হইত। এই অভাবের সময় শ্যামার মামার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হওযার শোক শীতলের উথলিযা উঠিয়াছিল, সব সময শ্যামাকে কথার খোঁচা দিয়াই তাহার সাধ মিটিত না। শ্যামার গাযে তাহার প্রমাণ আছে। প্রথম মা হওযার সময শ্যামার কোমরের কাছে যে মস্ত ক্ষতের দাগটা দেখিয়া বুড়ী দাই আপশোষ করিযাছিল এবং শ্যামা বলিয়াছিল ওটা ফোঁড়ার দাগ, ছড়ির ডগাতেও সেটা সৃষ্টি হয নাই, ছাতির ডগাতেও নয়। ওটা বঁটিতে কাটার দাগ। বঁটি দিযা শীতল অবশ্য তাহাকে খোঁচায় নাই, পা দিয়া পিঠে একটা ঠেলা মারিয়াছিল। দুঃখের বিষয়, শ্যামা তখন কুটিতেছিল তরকারী।

তরকারী সে আজো কোটে। সুখে দুঃখে জীবনটা অমনি হইয়া গিয়াছে, সিদ্ধ করিবার চাল ও কুটিবার তরকারী থাকার মত, চলনসই। অনেকদিন প্রেসের মালিক হইয়া থাকার গুণে একটা প্রেসের ম্যানেজারির

চাকরী শীতল মাসছয়েক চেষ্টা করিয়াই পাইযাছিল। শ্যামা প্রথমবার মা হওয়ার সময় শীতল এই চাকরীই করিতেছিল।

বিবাহের সাত বছব পবে প্রথম ছেলে হওয়াটা খুব বেশি বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। অমন বিলম্বিত উর্বরতা বহু নারীর জীবনেই আসিয়া থাকে। শ্যামার যেন সব বিষয়েই বাড়াবাড়ি। প্রথম ছেলেকে প্রসব করিতে সে সময় লইল দুদিনেব বেশি এবং এই দুটি দিন ভাবিয়া বারবার মূর্ছা গেল।

শেষ মূর্ছা ভাঙ্গিবার পর শ্যামা এক মহামুক্তির স্বাদ পাইয়াছিল। দেহে যেন তাহার উত্তাপ নাই, স্পন্দন নাই, সবগুলি ইন্দ্রিয় অবশ বিকল হইয়া গিয়াছে। সে বাতাসের মত হাল্কা। শীতকালেব পুঞ্জীভূত কুয়াশার মত সে যেন আলগোছে পৃথিবীতে সংলগ্ন হইয়া আছে। তাহার সমগ্র বিস্ময়কব অস্তিত্ব ব্যাপিযা এক তরঙ্গায়িত স্তিমিত বেদনা, মৃদু অথচ অসহ্য, দুর্জ্ঞেয় অথচ চেতনাময। একবার তাহার মনে হইল সে বুঝি মরিয়া গিয়াছে, ব্যথা দিয়া ফাঁপানো এই শূন্যময় অবস্থাটি তাহার মৃত্যুরই পরবর্তী জীবন। ভোঁতা ক্লান্তিকর যাতনা তাহার অশরীরী আত্মার দুর্ভোগ।

তারপব চোখ মেলিয়া প্রথমটা সে কিছুই বুঝিতে পারে নাই। চোখের সামনে সাদা দেয়ালে একটি শায়িত মানুষের ছায়া পড়িয়াছে। ছায়ার হাতখানেক উপরে জানালার একটা পাট অল্প একটু ফাঁক করা। ফাঁক দিয়া খানিকটা কালো আকাশ ও কতগুলি তারা দেখা যাইতেছে। একটা গরম ধোঁয়াটে গন্ধ শ্যামার নাকে লাগিয়াছিল। কাছেই কাদের কথা বলিবার মৃদু শব্দ। খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিবার পর দেয়ালের ছায়াটা তাহার নিজের বলিয়া চিনিতে পারিয়া সে একটু আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিল। এমনভাবে সে শুইয়া আছে কেন? তাহার কি হইয়াছে? কাঠকয়লা পুড়িবার গন্ধ কিসের? কথা বলিতেছে কারা?

হঠাৎ সব কথাই শ্যামার মনে পড়িয়া গিয়াছিল। পাশ ফিরিতে গিয়া সর্বাঙ্গে বিদ্যুতের মত তীব্র একটা ব্যথা সঞ্চারিত হইয়া যাওয়ায় সে আবার দেহ শিথিল করিয়া দিয়াছিল। মনের প্রশ্নকে বিহ্বলের মত উচ্চারণ

করিয়াছিল এই অর্থহীন ভাষায় ঃ কোথায় গেল, কই? কে যেন জবাব দিযাছিল ঃ এই যে বৌ এই যে, মুখ ফিরিয়ে তাকা হতভাগি।

কাছে বসিয়াও অনেকদূব হইতে যে কথা বলিয়াছিল সেই বোধ হয শ্যামার একখানা হাত তুলিযা একটি কোমল স্পন্দনেব উপব রাখিয়াছিল। জাগিয়া থাকিবার শক্তিটুকু শ্যামার তখন ঝিমাইয়া আসিয়াছে। সে অতি-কষ্টে একটু পাশ ফিরিয়াছিল।

দেখবি বৌ? এই দ্যাখ্—

এবাব স্বর চিনিতে পারিযা কম্পিতকণ্ঠে শ্যামা বলিয়াছিল, ঠাকুরঝি?

মন্দাকিনী আলোটা উঁচু করিযা ধবিযা বলিয়াছিল, আব ভাবনা কি বৌ? ভালয় ভালয় সব উৎবে গিযেছে। খোকা লো, ঘব আলো করা খোকা হয়েছে তোর।

মাথা তুলিয়া একবারমাত্র খানিকটা রক্তিম আভা ও দুটি নিমীলিত চোখ দেখিয়া শ্যামা বালিশে মাথা নামাইযা চোখ বুজিযাছিল।

শ্যামার যে সব বিষয়েই বাড়াবাড়ি ছিল তাহা নিঃসন্দেহ। পরদিন সকালেই সে তাহার প্রথম ছেলেক ভালবাসিযা ফেলিযাছিল। অনেক বেলায ঘুম ভাঙ্গিয়া নিজেকে শ্যামাব অনেকটা সুস্থ মনে হইযাছিল। ঘরে তখন কেহ ছিল না। কাত হইযা শুইয়া পাশে শাযিত শিশুব মুখেব দিকে এক-মিনিট চাহিয়া থাকিয়াই তাহাব মনে হইযাছিল ভিতরে একটা অদ্ভুত প্রক্রিয়া ঘটিয়া চলিবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলের মুখখানা তাহার চোখে অভিনব হইযা উঠিতেছে। কতটুকু মুখ, কী পেলবতা মুখেব! মাথা ও ভুবুতে চুলের শুধু আভাষ আছে। বেদানাব জমানো রসেব মত টুলটুলে আশ্চর্য দুটি ঠোঁট। একি তার ছেলে? এই ছেলে তার? গভীর ঔৎসুক্যে সন্তর্পণে শ্যামা হাত বাড়াইয়া ছেলের চিবুক ও গাল ছুঁইয়াছিল, বুকের স্পন্দন অনুভব করিয়াছিল। এই বিচ্ছিন্ন ক্ষীণ প্রাণস্পন্দন কোথা হইতে আসিল? শ্যামা কাঁপিয়াছিল, শ্যামার হইয়াছিল বোমাঞ্চ। স্নেহ নয়, তাহার হৃদয় যেন ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিয়া তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া দিতে চাহিযাছিল। প্রসবের পর নাড়ীসংযোগ বিচ্ছিন্ন সন্তানের জন্য একি কাণ্ড ঘটিতে থাকে মানুষের

মধ্যে? আশ্বিনের প্রভাতটি ছিল উজ্জ্বল। দুদিন দুরাত্রির মরণাধিক যন্ত্রণা শ্যামা দুঃস্বপ্নের মত ভুলিয়া গিয়াছিল। আজ সকালে তাহার আনন্দের সীমা নাই।

তখন ঘটিয়াছিল এক কাণ্ড।

ঘুম ভাঙ্গিয়া হঠাৎ শিশু যেন কি-রকম করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। টানিয়া টানিয়া শ্বাস নেয় চঞ্চলভাবে হাত পা নাড়ে চোখ কপালে তুলিয়া দেয়। ভয়ে শ্যামা বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ডাকিয়াছিল ঠাকুরঝি গো, ও ঠাকুরঝি!

রান্না ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া ব্যাপার দেখিয়া মন্দা হইয়াছিল রাগিয়া আগুন!

চোখ নেই বৌ? সরো তুমি সরো। গলা শুকিয়ে এমন করছে গো আহা। মধুর বাটি গেল কোথা? মিছরির জল? দিয়েছো তো উল্টে? আশ্চর্যি!

তাকের উপর শিশিতে মধু ছিল। ছোট একটি বাটিতে মধু ঢালিয়া আঙ্গুলে করিয়া ছেলের মুখ ভিজাইয়া চোখের পলকে মন্দা তাহাকে শান্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। বিড় বিড় করিয়া বলিয়াছিল আনাড়ি বলে আনাড়ি এমন আনাড়ি জন্মে চোখে দেখিনি মা! কচি ছেলে পলকে পলকে গলা শুকোবে তাও যদি না টের পাও তবে মা হওয়া কেন? দাইমাগীও মানুষ কেমন? তামাকপাতা আনতে গিয়ে বুড়ী হ'ল।

এই তুচ্ছ ঘটনাটি শ্যামার মনে গাঁথা হইয়া আছে প্রথম সন্তানকে সে যে বারোদিনের বেশি বাঁচাইতে পারে নাই তার সবটুকু অপরাধ চিরকাল শ্যামা নিজের বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে সন্তান পরিচর্যার কিছুই সে যে তখন জানিত না এই ঘটনাটি শ্যামার কাছে হইয়া আছে তাহার আদিম প্রমাণের মত। তখন অবশ্য সে জানিত না বারোদিন পরে পেট ফুলিয়া ছেলে তাহার মরিয়া যাইবে। মন্দা চলিয়া গেলে ছেলের দিকে চোখ রাখিয়া সে শান্তভাবেই শুইয়া ছিল, গলা শুকানোর লক্ষণ দেখা গেলে মুখে মধু দিবে। অন্যমনে সে অনেক কথা ভাবিয়াছিল। দরজা দিয়া দুটি চড়াই পাখী ঘরে ঢুকিয়া খানিক এদিক ওদিক ফড়ফড় করিয়া উড়িয়া জানালা দিয়া বাহির

হইয়া গিয়াছিল জানালা দিয়াই রোদ আসিয়া পড়িয়াছিল শ্যামার শিয়রে। ...মৃত্যুর কথা শ্যামার তখন মনে পড়ে নাই, ভগবানের কাণ্ডকারখানা বুঝিতে না পারিয়া সে অবাক হইয়া গিয়াছিল। বুকে তাহার দুদিন দুধ আসিবে না। নবজাত শিশুর জন্য ভগবান দুদিনের উপবাস ব্যবস্থা করিয়াছেন। মন্দার হুকুম স্মরণ করিয়া মাঝে মাঝে ছেলের মুখে সে শুষ্ক স্তন দিয়াছিল। সন্তানের ক্ষুধার আকর্ষণ অনুভব করিয়া ভাবিয়াছিল, হয়ত এ ব্যবস্থা ভগবানের নয়। বুকে তাহার যথেষ্ট মমতার সঞ্চার হয় নাই, তা হওয়ার আগে দুধ আসিবে না।

তবু কোন্ মা সন্তানের জীবনকে অস্থায়ী মনে না করিয়া পারে? বেলা বাড়িলে পাড়ার কয়েকবাড়ির মেয়েরা শ্যামার ছেলেকে দেখিতে আসিয়া যখন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছিল শ্যামার তখন যেমন গর্ব হইয়াছিল তেমনি হইয়াছিল ভয়। ভয় হইয়াছিল এইজন্য দেবতারা গোপনে শোনেন। গোপনে শুনিয়া কোন দেবতার হাসিবার সাধ হয় কে বলিতে পারে? তাই বিনয় প্রকাশের জন্য নয় দেবতার গোপন কানকে ফাঁকি দিবার জন্য শ্যামা বলিয়াছিল: কাণাখোঁড়া যে হয়নি মাসিমা তাই ঢের। বলিয়া তাহার এমনি আবেগ আসিয়াছিল যে ঘর খালি হওয়ামাত্র ছেলেকে সে চুম্বনে চুম্বনে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিল।

ছেলের গলা শুকানোর স্মৃতি মনে পুষিয়া রাখিবার আরেকটি কারণ ঘটিয়াছিল সেদিন রাত্রে। গভীর রাত্রে।

সারাদুপুর ঘুমানোর মত স্বাভাবিক কারণও নিশীথ জাগরণ মানুষের মনে অস্বাভাবিক উত্তেজনা আনিয়া দেয়। দূরে কোথায় পেটা ঘড়িতে তখন বারোটা বাজিয়াছে। শ্যামার কল্পনা একটু উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া আসিয়াছিল। ঘরের একদিকে বুড়ী দাই অঘোরে ঘুমাইতেছিল। কোণে জ্বলিতেছিল প্রদীপ। এগারটি দিবারাত্রি এই প্রদীপ অনির্বাণ জ্বলিবে জাতকের এই প্রদীপ্ত প্রহরী। শিয়রের কাছে মেঝেতে খড়ি দিয়া মন্দা দুর্গানাম লিখিয়া রাখিয়াছে। সকালে আঁচল দিয়া মুছিয়া ফেলিবে কেহ না মাড়াইয়া দেয়। সন্ধ্যায় আবার দুর্গানামের রক্ষাকবচ লিখিয়া রাখিবে। আঁতুড়ের রহস্য ভয়ে পরিপূর্ণ: এমনি কত তাহার প্রতিবিধান। হঠাৎ

শ্যামার একটা অদ্ভুত অনুভূতি হইয়াছিল। একটা অদৃশ্য জনতা যেন তাহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। চারিপাশে যেন তাহার অলক্ষ্য উপস্থিতি, অশ্রুত কলরব। সকলেই যেন খুসি, সকলের অনুচ্চারিত আশীর্বাদে ঘর যেন ভরিয়া গিয়াছিল। শ্যামার বুঝিতে বাকী থাকে নাই এ'রা তাহার সন্তানেরই পূর্ব্বপুরুষ, ভিড় করিয়া সকলে বংশধরকে দেখিতে আসিয়াছেন। কিন্তু একি? বংশধরকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহার দিকে এমন ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে সকলে চাহিতেছেন কেন? ভয়ে শ্যামার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল। হাতজোড় করিয়া সে ক্ষমা চাহিয়াছিল সকলের কাছে। মিনতি করিয়া বলিয়াছিল, আর কখনো সে মা হয় নাই, সকালে ছেলে যে তাহার গলা শুকাইয়া মরিতে বসিয়াছিল এ অপরাধ যেন তাঁহারা না নেন, আর কখনো এরকম হইবে না। জননীর সমস্ত কর্ত্তব্য সে তাড়াতাড়ি শিখিয়া ফেলিবে।

তারপর ছেলে মানুষ করার বিপুল কর্তব্য আঁতুড়েই নিখুঁতভাবে সুরু করিয়া দিতে শ্যামার আগ্রহের সীমা ছিল না। নিজে সে বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, উঠিয়া বসিতে গেলে মাথা ঘুরিত। শুইয়া শুইয়া সে খুঁতখুঁত করিত, এটা হল না ওটা হল না,—মন্দা বিরক্ত হইত, মাঝে মাঝে রাগিয়াও উঠিত। কিন্তু শ্যামার সঙ্গে পারিয়া ওঠা দায়। ছেলের অফুরন্ত সেবার এতটুকু ত্রুটি ঘটিলে সে শুধু ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে বাকি রাখিত। ছেলেকে খাওয়ানো হাঙ্গামার ব্যাপার ছিল না, কাঁদিলে মুখে স্তন তুলিয়া দিলে চুকচুক করিয়া টানিয়া পেট ভরিয়া আসিলে সে আপনি ঘুমাইয়া পড়িত। খুঁটিনাটি সেবাই ছিল অনন্ত। স্নান করাইয়া চোখে কাজল দিলেই শুধু চলিত না, কি কারণে ছেলের চোখে বড় পিঁচুটি পড়িতেছিল, ঘণ্টায় ঘণ্টায় পরিষ্কার ভিজা ন্যাকড়ায় তাহা মুছিয়া লইতে হইত। মিনিটে মিনিটে আবিষ্কার করিতে হইত কাঁথা বদলানোর প্রয়োজনকে। ছেলের বুকে একটু সর্দি বসিয়াছিল, ব্যাপারটা সামান্য বলিয়া কেহ তেমন গ্রাহ্য করে নাই, কেবল শ্যামার তাগিদে লণ্ঠনের উপর গরম তেলের বাটি বসাইয়া বার বার বুকে মালিশ করিয়া দিতে হইত। এমনি আরও কত কি। নাড়ী কাটিবার দোষেই সম্ভবত ছেলের নাভিমূল চার দিনের দিন পাকিয়া ফুলিয়া উঠিয়া-

ছিল। শ্যামা নিজে এবং মন্দা ও বুড়ী দাই এই তিনজনে ক্রমাগত ছেলের নাভিতে সেক দিয়াছিল।

দিনের বেলাটা একরকম কাটিয়া যাইত শ্যামার ভয় করিত রাত্রে। পূর্বপুরুষদের আবির্ভাবের ভয় নয় তারা একদিনের বেশি আসেন নাই —অসম্ভব কাল্পনিক সব ভয়। শ্যামা যেন কার কাছে গল্প শুনিয়াছিল এক ঘুমকাতুরে মার ঘুমের ঘোরে যে একদিন আঁতুড়ে নিজের ছেলেকে চাপা দিয়া মারিয়া ফেলিয়াছিল। নিজের ঘুমন্ত অবস্থাকে শ্যামা বিশ্বাস করিতে পারিত না। নাকে মুখে পাতলা কাপড় এক মুহূর্তের জন্য চাপা পড়িলে যে ক্ষীণ অসহায় প্রাণীটি দম আটকাইয়া মরিতে বসে ঘুমের মধ্যে একখানা হাতও যদি সে তাহার উপর তুলিয়া দেয় সে কি আর তবে বাঁচিবে? শ্যামা নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতে পারিত না। পাশ ফিরিলেই ছেলেকে পিষিয়া ফেলিয়াছে ভাবিয়া চমকিয়া জাগিয়া যাইত। কান পাতিয়া সে ছেলের নিশ্বাসের শব্দ শুনিতে চেষ্টা করিত। মনে হইত নিশ্বাস যেন পড়িতেছে। কানকে বিশ্বাস করিয়া তবু সে নিশ্চিন্ত হইতে পারিত না। মাথা উঁচু করিয়া ছেলেকে দেখিত নাকের নিচে গাল পাতিয়া নিশ্বাসের স্পর্শ অনুভব করিত। তারপর ছেলের বুকে হাত রাখিয়া স্পন্দন গুণিত—ধুক ধুক। হঠাৎ তাহার নিজের হৃৎপিণ্ড সজোরে স্পন্দিত হইয়া উঠিত। একি ছেলের হৃৎস্পন্দন যেন মৃদু হইয়া আসিয়াছে!

নিশীথ স্তব্ধতায় এই আশঙ্কা শ্যামাকে পাইয়া বসিত। সে যেন বিশ্বাস করিতে পারিত না যে এতটুকু একটা জীব নিজস্ব জীবনীশক্তির জোরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাঁচিয়া থাকিতে পারে। শ্যামার কেবলি মনে হইত এই বুঝি দুর্বল কলকব্জাগুলি থামিয়া গেল। পৃথিবীর সমস্ত মানুষ একদিন এমনি ক্ষুদ্র এমনি ক্ষীণপ্রাণ ছিল দিনের বেলা এ যুক্তি শ্যামার কাজে লাগিত রাত্রে তাহার চিন্তাধারা কোন যুক্তির বালাই মানিত না ভয়ে ভাবনায় সে আকুল হইয়া থাকিত। সৃষ্টির রহস্যময় স্রোতে যে ভাসিয়া আসিয়াছে নিঃশব্দ নির্বিকার রাত্রির অজানা বিপদের কোলে সে মিশিয়া যাইবে, শ্যামার ইহা স্বতঃসিদ্ধের মত মনে হইত। ছেলে কোলে সে জাগিয়া বসিয়া থাকিত। দুর্বলতায় তাহার মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করিত। প্রত্যাহত নিদ্রা

চোখের সামনে নাচাইত ছায়া। প্রদীপের নিষ্কম্প শিখাটি তাহাকে আলো দিত ভরসা দিত না।

এই আশঙ্কা ও দুর্ভাবনার ভাগ শ্যামা কাহাকেও দিত না।

ভাগ লইবার কেহ ছিলও না। এক দিন শীতল আঁতুড়ের ধারে কাছেও সে ভিড়িত না। ষষ্ঠীপূজার রাত্রে সে কেবল একবার নেশার আবেশে কি মনে করিয়া আতুড়ে ঢুকিয়াছিল। ছেলের শিয়রের কাছে ধপাস করিয়া বসিয়া পড়িয়াছিল এবং অকারণে হাসিয়াছিল।

শ্যামা বলিয়াছিল তুমি কি গো, বিছানা ছুঁয়ে দিলে?

শীতল বলিয়াছিল খোকাকে একটু কোলে নিই! বলিয়া ছেলের বগলের নিচে হাত দিয়া তুলিতে গিয়াছিল। শ্যামা ঝটকা দিয়া তাহার হাত সরাইয়া দিয়া বলিয়াছিল কি কর, ঘাড় ভেঙ্গে যাবে যে!

ঘাড় শক্ত হয়নি

নাকে গন্ধ লাগায় এতক্ষণে শ্যামা টের পাইয়াছিল।

গিলেছ বুঝি? তুমি যাও বাবু এখান থেকে যাও।

নেশা করিলে শীতলের মেজাজ জল হইয়া করুণ রসে মন থমথম করে। সে ছলছল চোখে বলিয়াছিল আর করব না শ্যামা। যদি করি তো খোকার মাথা খাই!

শ্যামা বলিয়াছিল কথার কি ছিরি। যাও না বাবু এখান থেকে!

শীতল বড় দমিয়া গিয়াছিল। যেন কাঁদিয়াই ফেলিবে। খানিক পরে শ্যামার বালিশটাকে শোনাইয়া বলিয়াছিল একবার কোলে নেব না বুঝি!

শ্যামা বলিয়াছিল কোলে নেবে তো আসনপিঁড়ি হয়ে বোসো। তুলবার চেষ্টা করলে কিন্তু ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।

শীতল আসনপিঁড়ি হইয়া বসিলে শ্যামা সন্তর্পণে ছেলেকে তাহার কোলে শোয়াইয়া দিয়াছিল। লোকে যেভাবে অচল দুয়ানি দ্যাখে ঝুঁকিয়া তেমনিভাবে ছেলের মুখ দেখিয়া শীতল বলিয়াছিল যমজ নাকি এাঁ?

নেশার সময় মাঝে মাঝে শীতলের চোখের সামনে একটা জিনিস দুটো হইয়া যাইত।

শুধু সেই একদিন। ছেলে কোলে করার সাধ শীতলের আর কখনো

আসে নাই। যে ক'দিন ছেলে বাঁচিয়াছিল আনন্দ ও ভয় উপভোগ করিয়াছিল শ্যামা একা। পাড়ায় শ্যামার সখী কেহ ছিল না। ছেলে হওয়ার খবর পাইয়া কয়েক বাড়ির কৌতূহলী মেয়েরা একবার দেখিয়া গিয়াছিল এই পর্যন্ত। শ্যামা মন খুলিয়া কথা বলিতে পারে এমন কেহ আসে নাই। একজন, যে কখনো এ বাড়িতে পা দেয় নাই শ্যামার সঙ্গে ভাব করিতে চাহিয়াছিল। সে পাড়ার মহিম তালুকদারের স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া। পাড়ায় মহিম তালুকদারের চেয়ে বড়লোক কেহ ছিল না। ভাব করা দূরে থাক শ্যামাকে দেখিতে আসাটাই বিষ্ণুপ্রিয়ার পক্ষে এমন অসাধারণ ব্যাপার যে শ্যামা শুধু বিনয় করিয়াছিল, ভাব করিতে পারে নাই।

তখন শীতল ছাপাখানায় গিয়াছে মন্দা রান্না শেষ করিয়া শ্যামার ছেলেকে স্নান করানোর আয়োজন করিতেছে। কে জানিত এমন অসময়ে বিষ্ণুপ্রিয়া বেড়াইতে আসিবে—গয়না-পরা দাসীকে সঙ্গে করিয়া?

শ্যামা বলিয়াছিল ও ঠাকুরঝি ওঘর থেকে কার্পেটের আসনটা এনে বসতে দাও।

মন্দা বলিয়াছিল, কার্পেটের আসন তো বাইরে নেই বৌ, তোরঙ্গে তোলা আছে।

মন্দার বুদ্ধির অভাবে শ্যামা ক্ষুণ্ন হইয়াছিল। একটা তুচ্ছ কার্পেটের আসন তাও যে তাহারা তোরঙ্গে তুলিয়া রাখে বিষ্ণুপ্রিয়াকে এ কথাটা কি না শোনাইলেই চলিত না!

খুলে আন না?

দাদা চাবি নিয়ে ছাপাখানায় চলে গেছে বৌ।

অগত্যা একটা মাদুর পাতিয়াই বিষ্ণুপ্রিয়াকে বসিতে দিতে হইয়াছিল। মাদুরে বসিতে বিষ্ণুপ্রিয়ার কোনই অসুবিধা হয় নাই, কেবল শ্যামার মনের মধ্যে এই কথাটা খচ খচ করিয়া বিঁধিয়াছিল যে এত বড়লোকের বৌ যদিবা বাড়ি আসিল তাহাকে বসিতে দিতে হইল ছেঁড়া মাদুরে।

গরম জল কি হবে ঠাকুরঝি?—বিষ্ণুপ্রিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল।

ছেলেকে নাওয়াবো।

নাওয়ান, দেখি বসে বসে।

মন্দা হাসিয়া বলিয়াছিল, দেখাও হবে শেখাও হবে, না? আপনার দিনও তো ঘনিয়ে এল।—বলিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার গলায় মুক্তার মালা আর কানে হীরার দুল চোখে পড়ায় অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া মন্দা আবার বলিয়াছিল, তবে আপনি কি আর নিজে ছেলে নাওয়াবেন, ছেলে নাওয়াবার ক'টা দাই থাকবে আপনার!

বিষ্ণুপ্রিয়া এ ধরণের কত মন্তব্য শুনিয়াছে। সে মৃদু হাসিয়া বলিয়াছিল, আপনার ছেলেমেয়ে ক'টি ঠাকুরঝি?

মেয়ে নেই, তিনটি ছেলে, দুটি যমজ। কোলেরটিকে সঙ্গে এনেছি, বড় দুটি শাশুড়ীর কাছে আছে।

স্নানের জলে পাঁচটি দূর্বা ছাড়িয়া মন্দা জানালা বন্ধ করিয়াছিল। শ্যামা উৎকণ্ঠিতা হইয়া বলিয়াছিল, জল বেশি গরম নয় তো ঠাকুরঝি?

মন্দা বলিয়াছিল, আমি কি পাগল বৌ গরম জলে তোমার ছেলেকে পুড়িয়ে মারব?

শ্যামা বলিয়াছিল, নরম চামড়া যে ঠাকুরঝি, একটু গরম হলেই সইবে না। জলে হাত দিয়া সে চমকাইয়া উঠিয়াছিল, জল যে দিব্যি গরম গো।

জল বুঝি ঠাণ্ডা হতে জানে না বৌ?

ইহার পরেই বিষ্ণুপ্রিয়ার বসিবার ভঙ্গি অত্যন্ত শিথিল হইয়া আসিয়াছিল। শ্যামার মধ্যে সে যেন হঠাৎ কি আবিষ্কার করিয়াছে। আর সে সহজে শ্যামার সঙ্গ ছাড়িবে না। বাড়ি হইতে বার বার তাগিদ আসিয়াছিল। বিষ্ণুপ্রিয়া বাড়ি যায় নাই। বসিয়া বসিয়া শ্যামার সঙ্গে রাজ্যের গল্প করিয়াছিল।

কয়েকদিন পরে বিষ্ণুপ্রিয়া আবার আসিয়াছিল। কেহ টের পায় নাই যে সান্ত্বনা দিতে নয়, সে ছেলের জন্য শ্যামার শোক দেখিতে আসিয়াছিল। শ্যামার প্রথম সন্তান বাঁচিয়াছিল বারো দিন।

দুই

দুবছরের মধ্যে শ্যামার কোলে আবার ছেলে আসিল। সেই বাড়িতে সেই ছোট ঘরে শরৎকালের তেমনি এক গভীর নিশীথে। কিন্তু মানুষের জীবনে অভাবের পূরণ আছে ক্ষতির পূরণ নাই বলিয়া প্রথম সন্তানকে শ্যামা ভুলিতে পারে নাই। ছেলে মরিয়া যাওয়ার পর কয়েকমাস সে মুহ্যমানা হইয়াছিল এই অবস্থাটি অতিক্রম করিতে তাহার মধ্যে যে পরিবর্তন আসিয়াছিল এখনো তাহা স্থায়ী হইয়া আছে। সন্তানের আবির্ভাবে এবার আর তাহার সেই অসংযত উল্লাস আসে নাই উদ্দাম কল্পনা জাগে নাই। সে শান্ত হইয়া গিয়াছে। সংসারধর্ম করিলে ছেলেমেয়ে হয় ছেলেমেয়ে হইলে মানুষ সুখী হয় এবারের ছেলে হওয়াটা তাহার কাছে শুধু এই। এতে না আছে বিস্ময় না আছে উন্মত্ততা চোখের পলকে একটা বিরাট ভবিষ্যতকে গড়িয়া তুলিয়া বহিয়া বেড়ানো ক্ষণে ক্ষণে নব নব কল্পনার তুলি দিয়া এই ভবিষ্যতের গায়ে রঙ মাখানো আর সর্বদা ভয়ে ও আনন্দে মশগুল হইয়া থাকা এসবই কিছুই নাই। এবারও আতুড়ে এগারোটি দিবারাত্রি অনির্বাণ দীপ জ্বলিয়াছিল কিন্তু শ্যামার এবার একেবারেই ভয় ছিল না শুধু ছিল গম্ভীর বিষণ্ণতা। এবার পূর্বপুরুষেরা গভীর রাত্রে শ্যামার ছেলেকে ভিড় করিয়া দেখিতে আসেন নাই। ছেলের ক্ষীণ বক্ষস্পন্দন হাৎঠ একসময় থামিয়া যাইতে পারে শ্যামার এ আশঙ্কা ছিল কিন্তু আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া সে জাগিয়া রাত কাটায় নাই। ও বিষয়ে তাহার কেমন একটা উদাসীনতা আসিয়াছে। ভাবিয়া লাভ নাই উতলা হইয়া লাভ নাই ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়া কোন ফল হইবে না। যিনি দেন তিনিই নেন। তাঁর দেওয়াকে যখন ঠেকানো যায় না নেওয়াকে ঠেকাইবে কে?

সে শীতলকে স্পষ্ট বলিয়াছে: এবার আর যত্নটত্ন করব না বাবু।

অযত্ন করা কি ভাল হবে?

অযত্ন করব না তো। নাওয়াবো খাওয়াবো যেমন যেমন দরকার সব করব। তার বেশি কিছু নয়। কি হবে করে?

শীতল কিছু বলে নাই। কি বলিবে?

শ্যামা আবার বলিয়াছে, সেবার আমার দোষেই তো গেল।

শীতল একটু ভাবিয়া বলিয়াছে, এটার কিন্তু পয় আছে শ্যামা। হতে না হতে কমল প্রেসের চাকরিটা পেলাম।

বোলো না বাবু ওসব। পয় না ছাই। আগে বাঁচুক।

কিন্তু কথাটা তুচ্ছ করিবার মত নয়। পয়মন্ত ছেলে? হয় তো তাই। সব অকল্যাণ ও নিরানন্দের অন্ত করিতে আসিয়াছে হয় তো। শ্যামা হয় তো আর দুঃখ পাইবে না।

এরা সময় মত মাইনে দেবে?

দেবে না? কমল প্রেস কত বড় প্রেস জানো!

এবার ছেলে তাহার বাঁচিবে শ্যামা যে এ আশা করে না এমন নয়। মানুষের আশা এমন ভঙ্গুর নয় যে একবার ঘা খাইলে চিরদিনের জন্য ভাঙিয়া পড়িবে। তবু আশাতেই আশঙ্কা বাড়ে। সব শিশুই যদি মরিয়া যাইত পৃথিবীতে এতদিনে তবে আর মানুষ থাকিত না, শ্যামার এই পুরানো যুক্তিটাও এবার হইয়া গিয়াছে বাতিল। সংসারে এমন কত নারী আছে যাদের সন্তান বাঁচে না। সেও যে তাদের মত নয় কে তাহা বলিতে পারে? একে একে পৃথিবীতে আসিয়া তাহার ছেলেমেয়েরা কেউ বারোদিন কেউ ছ'মাস বাঁচিয়া যদি মরিয়া যাইতে থাকে? বলা তো যায় না। এমনি যাদের অদৃষ্ট তাদের এক একটি সন্তান দশ-বারো বছর টিঁকিয়া থাকিয়া হঠাৎ একদিন মরিয়া যায়, এরকমও অনেক দেখা গিয়াছে। হালদার বাড়ির বড়বৌ দুবার মৃতসন্তান প্রসব করিয়াছিল, তার পরের সন্তান দুটি বাঁচিয়া ছিল বছরখানেক। শেষে যে মেয়েটা আসিয়াছিল তাহার বিবাহের বয়স হইয়াছিল। কি আদরেই মেয়েটা বড় হইয়াছিল! তবু তো বাঁচিল না।

নৈসর্গিক প্রতিবিধানের ব্যবস্থা এবার কম করা হয় নাই। শ্যামা গোটা পাঁচেক মাদুলি ধারণ করিয়াছে, কালীঘাট ও তারকেশ্বরে মানত করিয়াছে পূজা। মাদুলিগুলির মধ্যে তিনটি বড় দুর্লভ মাদুলি। সংগ্রহ করিতে শ্যামাকে কম বেগ পাইতে হয় নাই। মাদুলি তিনটির একটি প্রসাদী ফুল, একটিতে সন্ন্যাসীপ্রদত্ত ভস্ম ও অপরটিতে স্বপ্নাদ্য শিকড় আছে।

শ্যামার নির্ভর এই তিনটি মাদুলিতেই বেশি। নিজে সে প্রত্যেক দিন মাদুলি-ধোয়া জল খায়, একটি একটি করিয়া মাদুলিগুলি ছেলের কপালে ছোঁয়ায়। তারপর খানিকক্ষণ সে সত্যসত্যই নিশ্চিন্ত হইয়া থাকে।

এবারও মন্দাকিনী আসিয়াছে। সঙ্গে আনিয়াছে তিনটি ছেলেকেই। শ্যামার সেবা করিতে আসিয়া নিজের ছেলের সেবা করিয়াই তাহার দিন-কাটে। এমন আব্দারে ছেলে শ্যামা আর দ্যাখে নাই। ঠাকুরমার জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে যমজ ছেলে দুটি বাড়ি ঢুকিয়াছিল, তারপর কতদিন কাটিয়া গিয়াছে, এখনো তাহারা এখানে নিজেদের খাপ খাওযাইয়া লইতে পারে নাই। বাযনা ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে না মিটিলে ঠাকুরমার জন্যই তাহাদের শোক উথলিয়া ওঠে। দিবারাত্রি বায়নারও তাহাদের শেষ নাই। অপরিচিত আবেষ্টনীতে কিছুই বোধ হয় তাহাদের ভাল লাগে না, সর্বদা খুঁতখুঁত করে। কারণে-অকারণে রাগিয়া কাঁদিয়া সকলকে মারিয়া অনর্থ বাধাইয়া দেয়। মন্দা প্রাণপণে তাহাদের তোয়াজ করিয়া চলে। সে যেন দাসী, রাজার ছেলে দুটি দুদিনের জন্য তাহার অতিথি হইয়া সৌভাগ্য ও সম্মানে তাহাকে পাগল করিয়া দিয়াছে, ওদের তুষ্টির জন্য প্রাণ না দিয়া সে ক্ষান্ত হইবে না। শ্যামা প্রথমে বুঝিতে পারে নাই, পরে টের পাইয়াছে এমনি ভাবে মাতিয়া থাকিবার জন্যই মন্দা এবার ছেলে দুটিকে সঙ্গে আনিয়াছে। সেখানে শাশুড়ীকে অতিক্রম করিয়া ওদের সে নাগাল পায় না। সাধ মিটাইযা ওদের ভালবাসিবার জন্য, আদর যত্ন করিবার জন্য, সেই যে ওদের আসল মা এটুকু ওদের বুঝাইয়া দিবার জন্য, মন্দা এবার ওদের সঙ্গে আনিয়াছে।

আনিয়াছে চুরি করিয়া।

মন্দাই সবিস্তারে শ্যামাকে ব্যাপারটা বলিয়াছে। কথা ছিল শুধু কোলের ছেলেটিকে সঙ্গে লইয়া মন্দা আসিবে, শাশুড়ীর দুচোখের দুটি মণি যমজ ছেলে দুটি, কানু আর কালু, শাশুড়ীর কাছেই থাকিবে। কিন্তু এদিকে কাঁদাকাটা করিয়া স্বামীর সঙ্গে যে গভীর ও গোপন পরামর্শ মন্দা করিয়া রাখিয়াছে শাশুড়ী তার কি জানেন? মন্দাকে আনিতে গিয়াছিল শীতল, কানু ও কালু স্টেশনে আসিয়াছিল বেড়াইতে, রাখাল সঙ্গে আসিয়া-ছিল তাহাদের ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য। গাড়ি ছাড়িবার সময় রাখাল

একাই নামিয়া গিয়াছিল। কান্ন ও কালন্ন তখন নিশ্চিন্ত মনে রসগোল্লা খাইতেছে।

শীতল বলিয়াছিল, গাড়ি ছাড়ার সময় হ'ল, ওদের নামিয়ে নাও হে রাখাল।

রাখাল বলিয়াছিল, যাক্ না যাক্, মামাবাড়ি থেকে ক'দিন বেড়িয়ে আসন্ক।

মন্দা বলিয়াছিল, ওরাও যাবে যে দাদা। উনি টিকিট কেটেছেন, এই নাও।

শ্যামাকে ব্যাপারটা বলিবার সময় মন্দা এই সংক্ষিপ্ত কথোপকথনটুকু উদ্ধৃত করিতেও ছাড়ে নাই, বলিয়াছে, দাদা কিছন্ন টের পায় নি বৌ, ভেবেছিল শাশন্ড়ী বন্ঝি সত্যি সত্যি শেষে মত দিয়েছে। ফিরে গেলে যা কাণ্ডটা হবে! পেটের ছেলে চুরি করার জন্যে আমায় না শেষে জেলে দেয়।

এদিক দিয়া শ্যামার বরাবর সন্বিধা ছিল, স্বামীর জননীর খেয়াল মত কখনো তাহাকে পন্তুল নাচ নাচিতে হয় নাই। তবন্, মাঝে মাঝে শাশন্ড়ীর অভাবে তাহার কি কম ক্ষোভ হইয়াছে! আর কিছন্ন না হোক, বিপদে আপদে মন্খ চাহিয়া ভরসা করিবার সন্যোগ তো সে পাইত। মন্দা কোন দায়িত্ব গ্রহণ করে না, কেবল কাজ চালাইয়া দেয়। সেবার যে শ্যামার ছেলে মরিয়া গেল সে যদি কাহারো দোষে গিয়া থাকে অপরাধিনী শ্যামা, মন্দার কোন ত্রন্টি ছিল না। কিন্তু শাশন্ড়ী থাকিলে তিনিই সকল দায়িত্ব গ্রহণ করিতেন, শন্ধন্ আঁতুড়ে তাহাকে এবং বাহিরে তাহার সংসারকে সাহায্য করিয়া ক্ষান্ত না থাকিয়া ছেলেকে বাঁচাইয়া রাখার ভারও থাকিত তাঁহারই। যে সব ব্যবস্থার দোষে ছেলে তাহার মরিয়া গিয়াছিল সে তাহা বন্ঝিতে না পারন্ক শাশন্ড়ীর অভিজ্ঞ দন্ষ্টিতে অবশ্যই ধরা পড়িত। তা ছাড়া, স্বামীর মা তো পর নয় যে ছেলেকে সব দিক দিয়া ঘেরিয়া থাকিলে তাহাকে কোন মায়ের হিংসা করা চলে! মন্দাকে শ্যামা সমর্থন করিতে পারে না।

বলে, ওদের না আনলেই ভাল করতে ঠাকুরঝি!

মন্দা বলে, ভাল দিয়ে আমার কাজ নেই বাবন্—সে ডাইনি মাগীর ভাল। আদর দিয়ে দিয়ে মাথা খাচ্ছেন আর দিনরাত জপাচ্ছেন আমাকে ঘেন্না

করতে,—বড় হলে ওরা কেউ আমাকে মানবে? এখনি কেমন ধারা করে দ্যাখো না?

কিন্তু এ'কটা দিনে ওদের তুমি কি করতে পারবে ঠাকুরঝি? ফিরে গেলেই তো যে কে সেই। মাঝ থেকে শাশুড়ীর কতগুলো গালমন্দ খেয়ে মরবে।

মন্দার এসব হিসাব করাই আছে।

একটু চেনা হয়ে রইল। একেবারে কাছে ঘেঁষত না, এবার ডাকলে টাকলে একবার দুবার আসবে।

একদিন বিষ্ণুপ্রিয়া আসিয়াছিল।

বিষ্ণুপ্রিয়ার একটি মেয়ে হইয়াছে। মেয়ের জন্মের সময় সেও শ্যামার মত কষ্ট পাইয়াছিল, শ্যামার ভাগ্যের সঙ্গে তাহার ভাগ্যের পার্থক্য কিন্তু সব দিক দিয়াই আকাশ-পাতাল, মেয়েটি তাহার মরে নাই, সোনার চামচে দুধ খাইয়া বড় হইতেছে। বিষ্ণুপ্রিয়ার শরীর খুব খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল, কোথায় হাওয়া বদলাইতে গিয়া সারিয়া আসিয়াছে, কিন্তু এখনো তাহার চোখ দেখিলে মনে হয় রোগযন্ত্রণার মতই কি একটা অস্থিরতা যেন সে ভিতরে চাপিয়া রাখিয়াছে। তা ছাড়া, তাহার সাজসজ্জার অভাবটা অবাক করিয়া দেয়। এমন একদিন ছিল সে যখন বসনভূষণে, কেশরচনা ও দেহমার্জনার অতুল উপাদানে নিজেকে সব সময় ঝকঝকে করিয়া রাখিত। ত্বকে থাকিত জ্যোতি, কেশে থাকিত পালিশ, বসনে থাকিত বর্ণ ও ভূষণে থাকিত হীরার চমক। এখন সে সব কিছুই তাহার নাই। অলঙ্কার প্রায় সবই সে খুলিয়া ফেলিয়াছে, বিনাস্ত কেশরাজিতে ধরিয়াছে কতগুলি ফাটল, সে কাছে থাকিলে সাবান ছাড়া আর কোন সুগন্ধির ইঙ্গিত মেলে না। তাও মাঝে মাঝে নিশ্বাসের দুর্গন্ধে চাপা পড়িয়া যায়।

ঘনিষ্ঠতার বালাই না থাকিলেও মন্দা চিরকাল ঘনিষ্ঠ প্রশ্ন করিয়া থাকে।

সাজগোজ একেবারে ছেড়ে দিয়েছেন দেখছি।

বিষ্ণুপ্রিয়া হাসিয়া বলে, এবার মেয়ে ওসব করবে।

একটি মেয়ে বিইয়েই সন্ন্যাসিনী হয়ে গেলেন?

একটি দুটির কথা নয় ঠাকুরঝি। নিজে ছেলেমেয়ে মানুষ করতে গেলে ও একটিই থাক আর দুটিই থাক ফিটফাট থাকা আর পোষায় না। মেয়ে এই এটা করছে এই ওটা করছে—নোংরামির চূড়ান্ত, তার সঙ্গে কি এসেন্স মানায়? মেয়ে একটু বড় হলে হয়ত আবার সুরু করব। তা করব ঠাকুরঝি, এ বয়সে কি আর বুড়ি হয়ে থাকব সত্যি সত্যি!

শ্যামা বলে, মেয়ে বড় হতে হতে আর একটি আসবে যে!

বিষ্ণুপ্রিয়া জোর দিয়া বলে, না, আর আসবে না।

মন্দা খিলখিল করিয়া হাসে ঃ বললেন বটে একটা হাসির কথা! এখুনি রেহাই পাবেন? আরও কত আসবে, ভগবান দিলে কারো সাধ্যি আছে ঠেকিয়ে রাখে!

শ্যামা বলে, ঠাকুরঝি আপনাকে জব্দ করে দিলে।

বিষ্ণুপ্রিয়া বলে, আমাকে জব্দ করা আর শক্ত কি?

যে বিষ্ণুপ্রিয়ার এমনি পরিবর্তন হইয়াছে একদিন সকালে সে শ্যামাকে দেখিতে আসিল। মেয়েকে সে সঙ্গে আনিল না। মেয়েকে সঙ্গে করিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া কোথাও যায় না, কারো বাড়ি মেয়েকে যাইতেও দেয় না, ঘরের কোণে লুকাইয়া রাখে। বাড়ির পুরানো ঝি ছাড়া আর কারো কোলে সে মেয়েকে যাইতে দেয় না। মেয়ের সম্বন্ধে তাহার একটা সন্দেহজনক গোপনতা আছে, পাড়ার মেয়েরা এমনি একটা আভাস পাইয়া কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছিল। তারপর সকলেই জানিয়াছে। জানিয়াছে যে বিষ্ণুপ্রিয়ার মেয়ে পৃথিবীতে আসিয়াছে পাপের ছাপ লইয়া, মহিম তালুকদার ভীষণ পাপী।

এবার বিষ্ণুপ্রিয়াকে কার্পেটের আসনটাতেই বসিতে দেওয়া হইল। মন্দা ভদ্রতা করিয়া জিজ্ঞাসাও করিল, আপনাকে এক কাপ চা করে দি?

চা? বিষ্ণুপ্রিয়া চা খায় না।

খান না? মন্দা সুন্দর অবাক হইতে জানে, কি আশ্চর্য!—তা, চা আমার মেজননদও খায় না। তার বিয়ে হয়েছে চিলপাহাড়ীর জমিদার বাড়ি, মস্ত বড়লোক তারা, চালচলন সব সাহেবি। বিয়ের আগে আমার ননদ খুব চা খেত, বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি গিয়ে ছেড়ে দিলে। বললে, চা খেলে গায়ের চামড়া কর্কশ হয়। আমার মেজননদ খুব সুন্দরী কিনা, রঙ প্রায় গিয়ে

মেমদের মত কটা, রঙ খারাপ হবার ভয়ে মরে থাকে। আমার কর্তাটিকে দেখেন নি? ওদের হল ফর্সার গুষ্টি, তাদের মধ্যে ওনার রঙ সবচেয়ে মাজা, তারপরেই আমার মেজননদ।

ছেলেদের জন্য বসিয়া কারো সঙ্গে কথা বলিবার অবসর মন্দা পায় না। উঠানে দুই ছেলে চৌবাচ্চার জল নষ্ট করিতেছে দেখিয়া সে উঠিয়া গেল। বিষ্ণুপ্রিয়া বলিল, আপনাব ননদটি বেশ। খুব সরল।

মুখ্যু।

বিষ্ণুপ্রিয়া প্রতিবাদ করিল না। আঁচলে মুখ মুছিয়া শ্যামাব সঙ্গে চোখোচোখি হওয়ায় একটু হাসিল। বাহিরে ঝক্‌ঝকে রোদ উঠিয়াছিল। শহরতলীর বাড়ি, জানালা দিয়া পুকুরও চোখে পড়ে, গাছপালাও দেখা যায়। আর পাখি। শবৎকালে পথ ভুলিযা কতগুলি পাখি শহবেব ধারে আসিযা পড়িযাছে।

বিষ্ণুপ্রিয়া বলিল, তোমার ছেলের জন্যে দুটো একটা জামাটামা পাঠালে কিছু মনে করবে ভাই? মনে যদি কর তো স্পষ্ট বলো, মনে এক মুখে আব এক কোরো না।

বিষ্ণুপ্রিয়ার বলার ভঙ্গিতে শ্যামা একটু অবাক হইয়া গেল। বলিল, জামার দরকার তো নেই।

দরকার নাই বা রইল, বেশিই না হয হবে।—পাঠাব?

শ্যামা একটু ভাবিয়া বলিল, আচ্ছা।

আনকোরা নতুন জামা, দর্জিবাড়ি থেকে সোজা তোমায দিয়ে যাবে,— আমার মেয়ের জামাটামার সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি হবে না ভাই।

হলই বা ছোঁয়াছুঁয়ি?

বিকালে বিষ্ণুপ্রিয়ার উপহার আসিল। কচি ছেলের দরকারী কয়েকটা জিনিস। গালিচার মত পুরু ও নরম ফ্লানেলের কয়েকটি কাঁথা, ছেলেকে জড়াইয়া পুঁটলি করিয়া কোলে নেওয়ার জন্য ধবধবে সাদা কোমল তিনটি তোয়ালে আর আধ ডজন সেমিজের মত পাতলা লম্বা জামা। শেষোক্ত পদার্থগুলি মন্দাকে বিস্মিত করে।

এগুলো কি বৌ? আলখাল্লা নাকি?

শ্যামা হাসে : ঠাকুরঝি যেন কি! সাহেবদের ছেলেরা পরে দ্যাখোনি? তুমি যেন কত দেখেছ!

দেখিনি! গড়ের মাঠে চিড়িয়াখানায় কত দেখেছি!

ও, কত তুমি বেড়িয়ে বেড়াচ্ছ গড়ের মাঠে চিড়িয়াখানায়!

না ঠাকুরঝি, ঠাট্টা নয়, আগে সত্যি নিয়ে যেত, চার পাঁচবার গিয়েছি যে। সাহেবদের কচি কচি ছেলেদের এমনি জামা পরিয়ে ঠেলা গাড়িতে করে আয়ারা বেড়াতে আনত। এমন সুন্দর ছেলেগুলি চুরি করে আনতে সাধ হত আমার।

পুরানো কাঁথার উপর শ্যামা নূতন কাঁথা বিছায়, ছেলের গায়ের তৈলাক্ত পেনিটি খুলিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার দেওয়া আলখাল্লা পরায় তারপর একখানা তোয়ালে জড়াইয়া শোয়াইয়া দেয়। আনন্দে অভিভূতা হইয়া বলে কি রকম দেখাচ্ছে দ্যাখো ঠাকুরঝি!

মন্দা হাসিমুখে সায় দিয়া বলে খাসা দেখাচ্ছে বৌ। ওমা মুখ বাঁকায় যে!

ছেলেকে শ্যামা সত্যসত্যই পুঁটুলি করিয়াছে। হাত পা নাড়িতে না পারিয়া সে হাঁপাইয়া কাঁদিয়া ওঠে। তোয়ালেটা শ্যামা তাড়াতাড়ি খুলিয়া লয়। মন্দা শিশুকে কোলে লইয়া বলিতে থাকে অ সোনা, অ মাণিক — তোমায় বেঁধেছিল, শক্ত করে বেঁধেছিল, মরে যাই! শ্যামার গায়ে কাঁটা দেয়, মাথা দুলাইয়া ঝোঁক দিয়া দিয়া মন্দা বলিতে থাকে, মেরেছে? আমার ধনকে মেরেছে? কে মেরেছে রে! আ লো আ লো—ন ন ন

শ্যামা উত্তেজিত হইয়া বলে, ও ঠাকুরঝি ও যে হাসলো!

মন্দা দেখিতে পায় নাই। তবু সে সায় দিয়া বলে, পিসীর আদরে হাসবে না?

কি আশ্চর্য কাণ্ড ঠাকুরঝি! ওইটুকু ছেলে হাসে!

এরকম আশ্চর্য কাণ্ড দিবারাত্রিই ঘটিতে থাকে। খোকার সম্বন্ধে এবার সে কিনা অনেক বিষয়েই উদাসীন থাকিবে ঠিক করিয়াছে, খোকার আশ্চর্য কাণ্ডগুলিতে অনেক সময় শ্যামা শুধু তাই মনে মনে আশ্চর্য হয়, বাহিরে কিছু প্রকাশ করে না। খোকার হাত পা নাড়িয়া খেলা করা দেখিয়া

মনে যখন তাহার দোলা লাগে খেলার অর্থহীন হাত নাড়া আর ক্ষুধার সময় স্তন খুঁজিয়া হাত-নাড়ার পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া তাহার যখন সকলকে ডাকিয়া এ ব্যাপার দেখাইতে ইচ্ছা হয় শ্যামা তখন নিজেকে সতর্ক করিয়া দেয়। স্মরণ করে যে সন্তানকে উপলক্ষ করিয়া জননীর অসংযত উল্লাস অমঙ্গল-জনক। আনন্দের একটা সীমা ভগবান মানুষের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন মানুষ তাহা লঙ্ঘন করিলে তিনি রাগ করেন। তবু সব সময় শ্যামা কি আর নিজেকে সামলাইয়া চলিতে পারে? অন্যমনস্ক অবস্থায় হঠাৎ একসময় ঝাঁ করিয়া খোকাকে সে কোলে তুলিয়া লয়। তাহার পাঁজরের একদিকে থাকে হৃৎপিণ্ড আরেক দিকে থাকে খোকা খোকার লালিম পা দুটি হইতে কেশ বিরল মাথাটি পর্যন্ত শ্যামা অসংখ্য চুম্বন করে দীর্ঘনিশ্বাসে খোকার দেহের আঘ্রাণ লয়। তারপর সে অনুতাপ করে। বাড়াবাড়ি করিয়া একবার তাহার সর্বনাশ হইয়াছে তবু কি শিক্ষা হইল না? ✔

শীতলের মিশ্র খাপছাড়া প্রকৃতিতেও বাৎসল্যের আবির্ভাব হইয়াছে। বাৎসল্যের বসে তাহার তীব্র উগ্রতাও যেন একটু নরম হইয়া আসিয়াছে। পিতৃত্বের অধিকার খাটাইয়া ছেলের সঙ্গে সে একটু মাখামাখি করিতে চায় শ্যামা সভয়ে বাধা দিলে রাগ করার বদলে ক্ষুণ্ণই যেন হয় প্রকৃতপক্ষে রাগ করার বদলে ক্ষুণ্ণ হয় বলিয়াই তাহার বিপজ্জনক আদরের হাত হইতে ছেলেকে বাঁচাইয়া চলিবার সাহস শ্যামার হয়। সে উপস্থিত না থাকিলে ছেলেকে কোলে তুলিতে শীতলকে সে বারণ করিয়া দিয়াছে। মাঝে মাঝে দুচার মিনিটের জন্য ছেলেকে স্বামীর কোলে সে দেয় কিন্তু নিজে কাছে দাঁড়াইয়া থাকে পুলিসের মত সতর্ক পাহারা দেয়।

মাঝে মাঝে শীতল তাহাকে ফাঁকি দিবার চেষ্টা করে। রাত্রে হয়ত সে জাগিয়া আছে খোকা কাঁদিল। চুপি চুপি চৌকি হইতে নামিয়া মেঝেতে পাতা বিছানায় ঘুমন্ত শ্যামার পাশ হইতে খোকাকে সে সন্তর্পণে তুলিয়া লয় চোরের মত। অনভ্যস্ত অপটু হাতে খোকাকে বুকের কাছে ধরিয়া রাখিয়া নিজে সামনে পিছনে দুলিয়া তাহাকে সে দোলা দেয় মৃদু গুনগুনানো সুরে ঘুমপাড়ানো ছড়া কাটে। বলে আয় রে পাড়ার ছেলেরা মাছ ধরতে যাই মাছের কাঁটা পায় ফুটেছে, দোলায় চড়ে যাই। রাতদুপুরে নিজের মুখে ঘুম-

পাড়ানো ছড়া শুনিয়া মুখখানা তাহার হাসিতে ভরিয়া যায়। এ ছেলে কার? তার! শ্যামা মানুষ করিতেছে করুক ছেলে শ্যামার নয় তার।

এদিকে শ্যামার ঘুম ভাঙ্গে। কচি ছেলের বুড়ি মা কি আর ঘুমায়? লোক দেখানো চোখ বুজিয়া থাকে মাত্র। উঠিয়া বসিয়া শীতলের কাণ্ড চাহিয়া দেখিতে শ্যামার মন্দ লাগে না। কিন্তু মনকে সে অবিলম্বে শক্ত করিয়া ফেলে।

বলে কি হচ্ছে?

শীতল চমকাইয়া খোকাকে প্রায় ফেলিয়া দেয়।

শ্যামা বলে ঘাড়টা বেঁকে আছে। ওর কত লাগছে বুঝতে পারছ

লাগলে কাঁদত।—শীতল বলে।

কাঁদবে কি? যে ঝাঁকানি ঝাঁকিছ আঁৎকে ওর কান্না বন্ধ হয়েছে।—শ্যামা বলে।

শীতল প্রথমে ছেলে ফিরাইয়া দেয়। তারপর বলে বেশ করছি! অত তুমি লম্বা লম্বা কথা বলবে না বলে দিচ্ছি খপর্দার! শীতল শুইয়া পড়ে। সে সত্যসত্যই রাগ করিয়াছে অথবা এটা তার ফাঁকা গর্জন শ্যামা ঠিক তাহা বুঝিতে পারে না। খানিক পরে সে বলে আমি কি বারণ করেছি ছেলে দেব না! একটু বড় হোক নিও না তখন যত খুসি নিও। ওকে ধরতে বলে আমারি এখন ভয় করে! কত সাবধানে নাড়াচাড়া করি তবু কালকে হাতটা মচড়ে গেল

শীতল বলে আরে বাপরে বাপ! রাত দুপুরে একর বকর করে এ যে দেখছি ঘুমোতেও দেবে না!

শীতলের মেজাজ ঠাণ্ডা হইয়া আসিয়াছে সন্দেহ নাই। রাগ সে করে না বিরক্ত হয়। মন যে তাহার নরম হইয়া আসিয়াছে অনেক সময় এটুকু গোপন করিবার জন্যই সে যেন রাগের ভান করে কিন্তু আগের মত জমাইতে পারে না।

মন্দাকে নেওয়ার জন্য তাহার শাশুড়ী বারবার পত্র লিখিতেছিলেন মন্দা বারবার জবাব লিখিতেছিল যে পড়িয়া গিয়া তাহার কোমরে ব্যথা হইয়াছে, উঠিতে পারে না এখন যাওয়া অসম্ভব। শেষ পর্যন্ত শাশুড়ী বোধ

হয় সন্দেহ করিলেন। এক শনিবার রাখালকে তিনি পাঠাইয়া দিলেন কলিকাতায়। রাখালের স্নেহ শ্যামা ভুলিতে পারে নাই, সে আসিয়াছে শুনিয়াই আনন্দে সে উত্তেজিত হইয়া উঠিল, কিন্তু আনন্দ তাহার টিঁকিল না। রাখালের ভাব দেখিয়া সে বড় দমিয়া গেল। এতকাল পরে তার দেখা পাইয়া রাখাল খুসি হইল মামুলি ধরণে, কথা বলিল অন্যমনে, সংক্ষেপে। শ্যামার ছেলের সম্বন্ধে তাহার কিছুমাত্র কৌতূহল দেখা গেল না।

সারাদিন পরে বিকালে ব্যাপার বুঝিযা মন্দা স্বামীকে বলিল, তুমি কি গো? বৌ কতবার ছেলে কোলে কাছে এল, একবার তাকিয়ে দেখলে না?

রাখাল বলিল, দেখলাম না? ওই যে বললাম তুমি রোগা হযে গেছ বৌঠান?

মন্দা বলিল, দাদার ছেলে হয়েছে জানো? জানো আমার মাথা! ছেলেকে একবার কোলে নিযে একটু আদর করতে পারলে না? দাদা কি ভাববে!

রাখাল বলিল, তোমায় আদব করে সময় পেলাম কই?

মন্দা রাগ করিয়া বলিল, না বাবু, তোমার কি যেন হয়েছে। তামাসা-গুলি পর্যন্ত আজকাল রসালো হয় না।

তোমার কাছে হয না। বৌঠানকে ডেকে আনো হবে।

মন্দার অনুযোগের যে ফল ফলিল শ্যামার তাহাতে মনে হইল একটু গাল টিপিযা আদর করিয়া রাখাল বুঝি ছেলেকে তাহার অপমান করিয়াছে। শ্যামার মনে অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়া রহিল। জীবন-যুদ্ধে সন্তানেব প্রত্যেকটি পরাজয়ে মার মনে যে ক্ষুব্ধ বেদনার সঞ্চার হয়, এ অসন্তোষ তাহাবই অনুরূপ। শ্যামার ছেলে এই প্রথমবার হার মানিয়াছে।

পরদিন বিকালে রাখাল একাই ফিরিয়া গেল। মন্দা যাইতে রাজি হইল না, রাখালও বেশি পীড়াপীড়ি করিল না। যাওযার কথা মন্দাকে সে একবারের বেশি দুবার বলিল কি না সন্দেহ। পথ ভুলিয়া আসার মত যেমন অন্যমনে সে আসিয়াছিল, তেমনি অন্যমনে চলিয়া গেল।

কি জন্য আসিয়াছিল তাও যেন ভালরকম বোঝা গেল না।

শীতল গোপনে শ্যামাকে বলিল, রাখাল আবার বিয়ে করেছে শ্যামা।

বলিল রাত্রে, শ্যামার যখন ঘুম আসিতেছে। শ্যামা সজাগ হইয়া বলিল, কেন ঠাট্টা করছ?

কিসের ঠাট্টা? ও মাসের সাতাশে বিয়ে হয়েছে। মন্দাকে এখন কিছু বোলো না। রাখাল বলে গেছে সেই গিয়ে সব কথা খুলে ওকে চিঠি লিখবে। মুখে বলতে এসেছিল, পারল না। আমিও ভেবে দেখলাম, চিঠি লিখে জানানই ভাল।

উত্তেজনার সময় শ্যামার মুখে কথা যোগায় না। রাখালের ভাবভঙ্গি মনে করিয়া সে আরও মূক হইয়া রহিল। একদিন যে তাহার পরমাত্মীয়ের চেয়ে আপন হইয়া উঠিয়াছিল, গভীর রাত্রে বারান্দায় টিমটিমে আলোয় যার কাছে বসিয়া দুঃখের কথা বলিতে বলিতে সে নিঃসঙ্কোচে চোখ মুছিতে পারিত,—শুধু তাই নয়, যে চঞ্চল হইয়া উসখুস করিতে আরম্ভ করিলেও যার কাছে তাহার ভয় ছিল না, এবার সে তাহার কাছে ঘেঁষিতে পারে নাই। একটা কিছু করিয়া না আসিলে কি মানুষ এমন হয়?

কোথায় বিয়ে হল কি বৃত্তান্ত বল তো আমায়, গুছিয়ে বলো। - শ্যামা যখন এ অনুরোধ জানাইল, শীতলের চোখ ঘুমে বুজিয়া আসিয়াছে।

অ'? বলিয়া সজাগ হইয়া সে যা জানিত গড়গড় করিয়া বলিয়া গেল। তারপর বলিল, বড় ঘুম পাচ্ছে গো। বাকি সব জিজ্ঞেস কোরো কাল।

জিজ্ঞাসা করিবার কিছু বাকি ছিল না, এবার শুধু আলোচনা। শ্যামার সে উৎসাহ ছিল না, সে জাগিয়া শুইয়া রহিল নীরবে। একি আশ্চর্য ব্যাপার যে রাখাল আবার বিবাহ করিয়াছে? স্ত্রী যে তাহার তিনটি সন্তানের জননী একি সে ভুলিয়া গিয়াছিল? অবস্থা বিশেষে পুরুষমানুষের দুবার বিবাহ করাটা শ্যামার কাছে অপরাধ নয়। ধর, এখন পর্যন্ত তার যদি ছেলে না হইত, শীতল আবার বিবাহ করিলে তাহা একেবারেই অসঙ্গত হইত না। কিন্তু এখন কি শীতল আর একটা বিবাহ করিতে পারে? কোন্ যুক্তিতে করিবে!—রাখাল একি কাণ্ড করিয়া বসিয়াছে? মন্দার কাছে সে মুখ দেখাইবে কি করিয়া? রাখালকে শ্যামা চিরকাল শ্রদ্ধা করিয়াছে, কোনদিন বুঝিতে পারে নাই। এবারও রাখালের এই কীর্তির কোন অর্থ সে খুঁজিয়া

পাইল না। এমন যদি হইত যে মন্দার স্বভাব ভাল নয়, সে দেখিতে কুৎসিত, তাহাকে লইয়া রাখাল সুখী হইতে পারে নাই, আবার বিবাহ করিবার কারণটা তাহার শ্যামা বুঝিতে পারিত। মনের মিল তো দুজনের কম হয় নাই? এ বাড়িতে পা দিয়া অসুস্থা মন্দার যে সেবাটাই রাখালকে সে করিতে দেখিয়াছিল তাও শ্যামার মনে আছে।

এমন কাজ তবে সে কেন করিল? শ্যামা ভাবে ঘুমাইতে পারে না। চৌকির উপর শীতল নাক ডাকায় ঘুমন্ত সন্তানের মুখ হইতে স্তন আলগা হইয়া খসিয়া আসে জননী শ্যামা আহত উত্তেজিত বিষণ্ণ মনে আর একটি জননীর দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিয়া যায়। রাখালের অপকার্যের একটা কারণ খুঁজিয়া পাইলে সে যেন স্বস্তি পাইত। কে বলিতে পারে এরকম বিপদ তারও জীবনে ঘটিবে কি না? শীতল তো রাখালের চেয়ে ভাল লোক নয়। কিসের যোগাযোগে স্ত্রী ও জননীর কপাল ভাঙ্গে মন্দার দৃষ্টান্ত হইতে সেটুকু বোঝা গেলে মন্দ হইত না। তারপর একটা কথা ভাবিয়া হঠাৎ শ্যামার হাত পা অবশ হইয়া আসে। মন্দা জননী বলিয়াই হয় তো রাখালের স্ত্রীর প্রয়োজন হইয়াছে? ছেলের জন্য মন্দা স্বামীকে অবহেলা করিয়াছিল স্ত্রী বর্তমানে রাখাল স্ত্রীর অভাব অনুভব করিয়াছিল হয়ত তাই সে আবার বিবাহ করিয়াছে?

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া শীতল দেখিল বুকের উপর ঝুঁকিয়া মুখের কাছে হাসিভরা মুখখানা আনিয়া শ্যামা তাহাকে ডাকিতেছে। শ্যামা যে রাত্রেই বার বার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল ছেলের জন্য কখনো সে স্বামীকে তাহার প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিবে না শীতল তো তাহা জানিত না, এও সে জানিত না যে প্রতিজ্ঞা-পালনে স্বামীর ঘুম ভাঙ্গিবার নিয়মিত সময় পর্যন্ত সবুর শ্যামার সহে নাই। শীতল তাহাকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিল। বলিল, হয়েছে কি?

বেলা হল উঠবে না?

শীতল পাশ ফিরিয়া শুইল। বিড়বিড় করিয়া সে যা বলিল তা গালাগালি।

তখন শ্যামা বুঝিতে পারিল সে ভুল করিয়াছে। ছেলের জন্য স্বামীকে

অবহেলা না করিবার প্রক্রিয়া এটা নয়। স্বামী যতটুকু চাহিবে দিতে হইবে ততটুকু, গায়ে পড়িয়া সোহাগ করিতে গেলে জুটিবে গালাগালি।

মন্দার কোন পরিবর্তন নাই। সে তো এখনো জানে না। ছেলেদের লইয়া সে ব্যস্ত ও বিব্রত হইয়া রহিল। আড়চোখে তাহার সানন্দ চলাফেরা দেখিতে দেখিতে শ্যামার বড় মমতা হইতে লাগিল। সে মনে মনে বলিল, অ পোড়াকপালী! বেশ হেসে খেলে সময় কাটাচ্ছ, ওদিকে তোমার যে সর্বনাশ হয়ে গেছে। যখন জানবে তুমি করবে কি? -একটা বিড়ালছানাব জন্য মারামারি করিযা কানু ও কালু কাঁদিতেছিল। দেখাদেখি কোলের ছেলেটিও কান্না জুড়িয়াছিল। শ্যামা সাহায্য করিতে গেলে মন্দা তাহাকে হটাইযা দিল। তিনজনকে সে সামলাইল একা।

শ্যামাব চোখ ছলছল করিতে লাগিল। সে মনে মনে বলিল, কার ছেলেদেব এত ভালবাসছ ঠাকুরঝি? সে তো তোমার মান রাখে নি!

মন্দার সমস্যা শ্যামাকে বড় বিচলিত করিয়াছে। রাখালের প্রতি সে যেন ক্রমে ক্রমে বিদ্বেষ বোধ কবিতে আরম্ভ করে। সংসাবে স্ত্রীলোকেব অসহায় অবস্থা বুঝিতে পাবিযা নিজেব কাছে সে অপদস্থ হইযা যায়। যে আশ্রয় তাহাদের সবচেযে স্থায়ী কত সহজে তাহা নষ্ট হইযা যায়। যে লোকটির উপব সব দিক দিয়া নির্ভর করিতে হয়, কত সহজে সে বিশ্বাসঘাতকতা কবিয়া বসে?

মন্দা অবশ্যই এবাব অনেক দিন এখানে থাকিবে। এ আরেক সমস্যার কথা। আর্থিক অবস্থা তাহাদের স্বচ্ছল নয নূতন চাকবীতে শীতল নিযমিত মাহিনা পায় বটে, টাকার অঙ্কটা কিন্তু ছোট। শীতলের কিছু ধার আছে, মাঝে মাঝে কিছু কিছু শুধিতে হয়, সুদও দিতে হয। খরচ চলিতে চায না। তিনটি ছেলে লইয়া মন্দা বেশি দিন এখানে থাকিলে বড়ই তাহারা অসুবিধায় পড়িবে। শ্যামা অবশ্য এসব অসুবিধার কথা ভাবিতে বসিত না, অত ছোট মন তাহার নয়,—যদি তাহার খোকাটি না আসিত। মন্দার জন্য তাহারা স্বামী-স্ত্রী না-হয় কিছুদিন কষ্টই ভোগ করিল, কারো খাতিরে খোকাকে তো তাহারা কষ্ট দিতে পারিবে না! ওর যে ভাল জামাটি জুটিবে না, দুধ কম পড়িবে, অসুখে বিসুখে উপযুক্ত চিকিৎসা হইবে না, শ্যামা

তাহা সহিবে কি করিয়া? নিজের ছেলের কাছে নাকি ননদ ও তাহার ছেলে-মেয়ে! যতদিন সম্ভব ঠিক ততদিনই মন্দাকে সে এখানে থাকিতে দিবে। তারপর মুখ ফুটিয়া বলিবে, আমাদের খরচ চলছে না ঠাকুরঝি। বলিবে, অভিমান চলবে কেন ভাই? মেয়েমানুষের এমনি কপাল। এবার তুমি ফিরে যাও ঠাকুরজামায়ের কাছে।

হিসাবে শ্যামার একটু ভুল হইয়াছিল। কয়েকদিন পরে রাখালের পত্র আসিবামাত্র বনগাঁ যাওযার জন্য মন্দা উতলা হইয়া উঠিল। সে কোনমতেই বিশ্বাস করিতে চাহিল না, রাখাল আবার বিবাহ করিয়াছে। বারবার সে বলিতে লাগিল, সব মিছে কথা। সে বনগাঁ যায় নাই বলিয়া রাগিয়া রাখাল এরকম চিঠি লিখিয়াছে। একথা কখনো সত্যি হয়? তবু, এরকম অবস্থায তাহার অবিলম্বে বনগাঁ যাওয়া দরকার। আমায় আজকেই রেখে এসো দাদা, পায়ে পড়ি তোমার।

এদিকে, সেদিন আরেক মুস্কিল হইয়াছে। রাত্রে শ্যামার ছেলেব হইয়াছিল জ্বর, সকালে থার্মোমিটার দিয়া দেখা গিয়াছে জ্বর একশ দুইএর একটু নিচে। ছেলে কোলে করিয়া শেষরাত্রি হইতে শ্যামা ঠায় বসিয়া কাটাইয়াছে। ভাবিয়া ভাবিয়া সে বাহির করিয়াছে যে বারোকে চার দিয়া গুণ করিলে যত হয় ছেলের বয়স এখন তাহার ঠিক ততদিন। আগের খোকাটি তাহার ঠিক বারোদিন বাঁচিয়াছিল। বনগাঁ অনেক দূর, শীতলকে শ্যামা ছাপাখানায় পর্যন্ত যাইতে দিতে রাজি নয়।

শীতল বলিল, দুদিন পরেই যাস মন্দা। চিঠিপত্র লেখা হোক, একটা খবর দিয়ে যাওয়াও তো দরকার। খোকার জ্বরটাও ইতিমধ্যে হয়ত কমবে।

মন্দা শুনিল না। বাড়িটা হঠাৎ তাহার কাছে জেলখানা হইয়া উঠিয়াছে। সে মিনতি করিয়া বলিতে লাগিল, আজ না পার, কাল আমাকে তুমি রেখে এসো দাদা। সকালে রওনা হলে বিকেলের গাড়িতে ফিরে আসতে পারবে তুমি।

শীতল বলিল, ব্যস্ত হোস কেন মন্দা, দেখাই যাক না কাল সকাল পর্যন্ত, খোকার জ্বর আজকের দিনের মধ্যে কমে যেতেও পারে তো।

বিকালে খোকার জ্বর কমিল, শেষরাত্রে আবার বাড়িয়া গেল। সকালে

মন্দা বলিল, আমার তবে কি উপায় হবে বৌ? আমি তো থাকতে পারি না আর। দাদা যদি নাই যেতে পারে, আমায় গাড়িতে তুলে দিক, ওদের নিয়ে আমি একাই যেতে পারব।

শ্যামা রাত্রে ভাবিয়া দেখিয়াছিল, মন্দাকে আটকাইয়া রাখা সঙ্গত নয়। উদ্বেগে ও আশঙ্কায় সে এখন বনগাঁ যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, পরে হয়ত মত পরিবর্তন করিয়া বসিবে, আর যাইতেই চাহিবে না। বলিবে, অমন স্বামীর মুখ দেখার চেয়ে ভাইএর বাড়ি পড়িয়া থাকাও ভাল। বোনকে পুষিবার ক্ষমতা যে শীতলের নাই, এতো আর সে হিসাব করিবে না। তার চেয়ে ও যখন যাইতে চায়, ওকে যাইতে দেওয়াই ভাল। একদিনে তাহার খোকার কি হইবে? শীতল তো ফিরিয়া আসিবে রাত্রেই।

এই সব ভাবিয়া শ্যামা শীতলকে বনগাঁ যাইতে বাধা দিল না। জিনিস পত্র মন্দা আগের দিনই বাঁধিয়া ছাঁদিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। একচড়া আলুভাতে ফুটাইয়া কালু ও কানুকে খাওয়াইয়া, কোলের ছেলেটির জন্য বোতলে দুধ ভরিয়া লইয়া শীতলের সঙ্গে সে রওনা হইয়া গেল। গাড়িতে ওঠার সময় মন্দা একটু কাঁদিল, শ্যামাও কয়েকবার চোখ মুছিল।

গাড়ি যেন চোখের আড়াল হইল না, শ্যামার ছেলের জ্বর বাড়িতে আরম্ভ কবিল। ঝিকে দিয়া কই মাছ আনাইয়া শ্যামা এবেলা শুধু ঝোল-ভাত রাঁধিবাব আয়োজন করিয়াছিল, সব ফেলিয়া রাখিয়া দুরুদুরু বুকে অবিচলিত মুখে সে ছেলেকে কোলে করিয়া বসিল। নিয়তির খেলা শ্যামা বোঝে বৈ কি। মন্দার ভাব এড়াইবার লোভে শীতলকে যাইতে দেওয়ার দুর্মতি নতুবা তাহার হইবে কেন? স্বামী আবার বিবাহ করিয়াছে বলিয়া মন্দা চিরকাল ভাইয়ের সংসারে পড়িয়া থাকিত, এ আশঙ্কা শ্যামার কাছে এখন অর্থহীন মনে হইল। কাঁধে শনি ভর না করিলে মানুষ ভবিষ্যতের একটা কাল্পনিক অসুবিধার কথা ভাবিয়া ছেলের রোগকে অগ্রাহ্য করে? ছেলে যত ছটফট করিয়া কাঁদিতে লাগিল, অনুতাপে শ্যামার মন ততই পুড়িয়া যাইতে লাগিল। যেমন ছোট তাহার মন, তেমনি উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে! তার মত স্বার্থপর হীনচেতা স্ত্রীলোকের ছেলে যদি না মরে তো মরিবে কার? একা সে এখন কি করে!

ঠিকা ঝি বাসন মাজিতেছিল। তাহাকে ডাকিয়া শ্যামা বলিল, খোকার বড় জ্বর হয়েছে সত্যভামা, বাবু বনগাঁ গেলেন, কি হবে এখন?

ঝি শতমুখে আশ্বাস দিয়া বলিল, কমে যাবে মা, কমে যাবে।—ছেলেপিলের অমন জ্বর জ্বালা কত হয়, ভেবো নি।

তুমি আজ কোথাও যেয়ো না সত্যভামা।

কিন্তু না গিয়া সত্যভামার উপায় নাই। সে ধরিতে গেলে স্বামীহীনা, কিন্তু তাহার চারটি ছেলেমেয়ে আছে। তিন বাড়ি কাজ করিয়া সে ইহাদের আহার যোগায়, শ্যামার কাছে বসিয়া থাকিলে তাহার চলিবে কেন? সত্যভামার বড় মেয়ে রাণীর বয়স দশ বছর, তাহাকে আনিয়া শ্যামার কাছে থাকিতে বলিয়া সে সরকারদের কাজ করিতে চলিয়া গেল। রাণীর একটা চোখে আঞ্জিনা হইয়াছিল, চোখ দিয়া তাহার এত জল পড়িতেছিল যেন কার জন্য শোক করিতেছে। শ্যামা এবার একেবারে নিঃসন্দেহ হইয়া গেল। এমন যোগাযোগ, এত সব অমঙ্গলের চিহ্ন, একি ব্যর্থ যায়? আজ দিনটা মেঘলা করিয়া আছে। শীত পড়িয়াছে কনকনে। খোকার জ্বরের তাপে শ্যামার কোল যত গরম হইয়া ওঠে, হাত পা হইয়া আসে তেমনি ঠাণ্ডা। মাঝে মাঝে শ্যামার সর্বাঙ্গে কাঁপুনি ধরিয়া যায়। বেলা বারোটার সময় খোকার ভাঙ্গা ভাঙ্গা কান্না থামিল। ভয়ে ভাবনায় শ্যামা আধমরা হইয়া গিয়াছিল, তবু তাহার প্রথম ছেলেকে হারানোর শিক্ষা সে ভোলে নাই,—তাড়াতাড়ি নয়, বাড়াবাড়ি নয়। এরকম উত্তেজনার সময় ধীরতা বজায় রাখা অনভ্যস্ত অভিনয়ের সামিল, শ্যামার চিন্তা ও কার্য দুই অত্যন্ত শ্লথ হইয়া গিয়াছিল। তিনবার থার্মোমিটার দিয়া সে ছেলের সঠিক টেম্পারেচার ধরিতে পারিল। একশ তিন উঠিয়াছে। জ্বর এখনো বাড়িতেছে বুঝিতে পারিয়া রাণীকে সে ওপাড়ার হারান ডাক্তারকে ডাকিতে পাঠাইয়া দিল। এতক্ষণে সে টের পাইয়াছে জ্বরের বৃদ্ধি স্থগিত হওয়ার প্রতীক্ষায় এতক্ষণ ডাক্তার ডাকিতে না পাঠানো তাহার উচিত হয় নাই। হারান ডাক্তার যেমন গম্ভীর তেমনি মন্থর। আজ যদি রোগী দেখিয়া ফিরিতে তাহার বেলা হইয়া থাকে, স্নান করিয়া খাইয়া ব্যাপার দেখিতে আসিবে সে তিন ঘণ্টা পরে। রাণী কি রোগীর অবস্থাটা তাহাকে বুঝাইয়া বলিতে পারিবে? সামান্য জ্বর মনে করিয়া হারান ডাক্তার যদি

বিকালে দেখিতে আসা স্থির করে? ছেলেকে ফেলিয়া রাখিয়া শ্যামা সদর দরজায় গিয়া পথের দিকে তাকায়। রাণীকে দেখিতে পাইলে ডাকিয়া ফিরাইয়া একটি কাগজে হারান ডাক্তারকে কয়েকটি কথা লিখিয়া দিবে। রাণীকে সে দেখিতে পায় না। শুধু পাড়ার ছেলে বিনু ছাড়া পথে কেহ নাই।

শ্যামা ডাকে অ বিনু অ ভাই বিনু শুনছ

কি?

খোকার বড্ড জ্বর হয়েছে ভাই কেমন অজ্ঞানের মত হয়ে গেছে, লক্ষ্মী দাদাটি একবার ছুটে হারান ডাক্তারকে গিয়ে বল গে—

আমি পারব না। বিনু বলে।

শ্যামা বলে ও ভাই বিনু শোন ভাই একবার

বাড়াবাড়ি? সে উতলা হইয়াছে? ঘরে গিয়া শ্যামা কাঁদে। দেখো ছেলে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতেছে। চোখ বুজিয়া নিশ্বাস ফেলিতেছে। ওকি আর চোখ মেলিবে

হারান ডাক্তার দেরি না করিয়াই আসিল। হারান যত মন্থর হোক তার পুরানো নড়বড়ে ফোর্ড গাড়িটা এখনো ঘণ্টায় বিশ মাইল যাইতে পারে। ভাত খাইয়া সে ধীরে ধীরে পান চিবাইতেছিল ঘরে ঢুকিয়া সে প্রথমে চিকিৎসা করিল শ্যামার। বলিল কেঁদো না বাছা। রোগ নির্ণয় হবে না।

কেমন তাহার রোগ নির্ণয় কে জানে খোকার গায়ে একবার হাত দিয়াই হুকুম দিল এক গামলা ঠাণ্ডা জল কলসী থেকে এনো।

শ্যামা গামলায় জল আনিলে হারান ডাক্তার ধীরে ধীরে খোকাকে তুলিয়া গলা পর্যন্ত জলে ডুবাইয়া দিল এক হাতে সেই অবস্থায় তাহাকে ধরিয়া রাখিয়া অন্য হাতে ভিজাইয়া দিতে লাগিল তাহার মাথা। খোকার মার অনুমতি চাহিল না এরকম বিপজ্জনক চিকিৎসার কোন কৈফিয়ৎও দিল না।

শ্যামা বলিল একি করলেন?

হারান ডাক্তার বলিল শুকনো তোয়ালে থাকলে দাও না থাকলে শুকনো কাপড়েও চলবে।

শ্যামা বিষ্ণুপ্রিয়ার দেওয়া একটি তোয়ালে আনিয়া দিলে জল হইতে তুলিয়া তোয়ালে জড়াইয়া খোককে হারান শোয়াইয়া দিল। নাড়ী দেখিয়া

চৌকির পাশের দিকে সরিয়া গিয়া ঠেস দিল দেয়ালে। পান সে আজ আগাগোড়া জাবর কাটিতেছিল, এবার বুজিল চোখ।

শ্যামা বলিল, আমার কি হবে ডাক্তারবাবু?

হারান রাগ করিয়া বলিল, এই তো, এই তো তোমাদের দোষ! কাঁদবার কারণটা কি হল? ওর আরেকটা বাথ দিতে হবে বলে বসে আছি বাছা, তোমাদের দিয়ে তো কিছু হবার যো নেই, খালি কাঁদতে জানো।

হারান বুড়া হইয়াছে, তাহাকে ডাক্তারবাবু বলিতে শ্যামার কেমন বাধিতেছিল। রোগীর বাড়িতে ডাক্তারের চেয়ে পর কেহ নাই, সে মানুষ নয়, সে শুধু একটা প্রয়োজন, তিতো ওষুধের মত সে একটা হিতৈষী বন্ধু। হারানকে পর মনে করা কঠিন। তাঁহাকে দেখিয়া এতখানি আশ্বাস মেলে, অথচ এমনি সে অভদ্র যে আত্মীয় ভিন্ন তাহাকে আব কিছু মনে করিতে কষ্ট হয়।

শ্যামা তাই হঠাৎ বলিল, আপনি একটু শোবেন বাবা? দেয়ালে ঠেস দিয়ে কষ্ট হচ্ছে আপনার।

কষ্ট? হাসিতে গিয়া হারান ডাক্তারের মুখের চামড়া অনভ্যস্ত ব্যায়ামে কুঁচকাইয়া গেল, এতক্ষণে শ্যামার দিকে সে যেন একটু বিশেষ ভাবে চাহিয়া দেখিল, না মা, কষ্ট নেই, শোব—একেবারে বাড়ি গিয়ে শোব। দুটো পান দিতে পার, বেশ করে দোক্তা দিয়ে?

শ্যামা পান সাজিয়া আনিয়া দিল। এটুকু সে বুঝিতে পারিযাছিল যে খোকার অবস্থা বিপজ্জনক, নহিলে ডাক্তার মানুষ যাচিয়া বসিয়া থাকিবে কেন? এত জ্বরের উপর জলে ডুবাইয়া চিকিৎসাও কি মানুষ সহজে করে? তবু শ্যামা অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছে। সে তো ডাক্তারি বিদ্যার পরিচয রাখে না, সে জানে ডাক্তারকে। জীবনমরণের ভার যে ডাক্তার পান চিবাইতে চিবাইতে লইতে পারে, সেই তো ডাক্তার,--মরণাপন্ন ছেলেকে ফেলিয়া এমন ডাক্তারকে পান সাজিয়া দিতে শ্যামা খুসিই হয়। পান আর এক খাবলা দোক্তা মুখে দিয়া হারান শীতলের কথা জিজ্ঞাসা করিল। আধ ঘণ্টা পরে খোকাব তাপ লইয়া বলিল, জ্বর বাড়েনি। তবু গাটা একবার মুছে দিই, কি বল মা?

না, হারান ডাক্তার গম্ভীর নয়। রোগীর আত্মীয়স্বজনকে সে শুধু

গ্রাহ্য করে না, ওর মধ্যে যে তার সঙ্গে ভাব জমাইতে পারে বুড়া তার সঙ্গে কথা বড় কম বলে না। বাবা বলিয়া ডাকিয়া শ্যামা তাহার মুখ খুলিয়া দিয়াছে, রাজ্যের কথার মধ্যে খোকার যে কত বড় ফাঁড়া কাটিয়াছে তাও সে শ্যামাকে শোনাইয়া দিল। বলিল বিকাল পর্যন্ত তাহাকে না ডাকিলে আর দেখিতে হইত না। জ্বর বাড়িতে বাড়িতে এক সময়—

গিয়ে একটা ওষুদ পাঠিয়ে দিচ্ছি রাণীর হাতে পাঁচ ফোঁটা করে খাইয়ে দিও দুধের সঙ্গে মিশিয়ে চামচের—গরুর দুধ নয় মা সে ভুল যেন করে বোসো না। আধ ঘণ্টা পর পর তাপ নিয়ে যদি দ্যাখো জ্বর কমছে না, গা মুছে দিও।

সন্ধ্যাবেলা আপনি আর একবার আসবেন বাবা।

হারান দরজার কাছে গিয়া একবার দাঁড়াইল। বলিল ভয় পেয়ো না মা এবার জ্বর কমতে আরম্ভ করবে।

শ্যামা ভাবিল সাহস দিবার জন্য নয় হারান হয়ত ভিজিটের টাকার জন্য দাঁড়াইয়াছে। কত টাকা দিবে যাহাকে বাবা বলিয়া ডাকিয়াছে দুটো একটা টাকা কেমন করিয়া তাহার হাতে দিবে, শ্যামা ভাবিয়া পাইতেছিল না। অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে সে বলিল উনি বাড়ি নেই

এলে পাঠিয়ে দিও। বলিয়া হারান চলিয়া গেল। স্বয়ং শীতলকে অথবা ভিজিটের টাকা কি যে সে পাঠাইতে বলিয়া গেল কিছুই বুঝিতে পারা গেল না।

শীতলের ফিরিবার কথা ছিল রাত্রি আটটায়। সে আসিল পরদিন বেলা বারটার সময়। বিষ্ণুপ্রিয়া কার কাছে খবর পাইয়া এবেলা শ্যামাকে ভাত পাঠাইয়া দিয়াছিল, শীতল যখন আসিয়া পৌঁছিল সে তখন অনেক ব্যঞ্জনের মধ্যে শুধু মাছ দিয়া ভাত খাইয়া উঠিয়াছে এবং নিজেকে তাহার মনে হইতেছে রোগমুক্তার মত।

শীতল জিজ্ঞাসা করিল, খোকা কেমন?

ভাল আছে।

কাল গাড়ি ফেল করে বসলাম, এমন ভাবনা হচ্ছিল তোমাদের জন্যে।

শ্যামার মুখে অনুযোগ নাই, সে গম্ভীর ও রহস্যময়ী। কাল বিপদে

পড়িয়া কারো উপর নির্ভর করিবার জন্য সে মরিয়া যাইতেছিল, আজ বিপদ কাটিয়া যাওয়াব পর কিছু আত্মমর্যাদার প্রয়োজন হইয়াছে।

তিন

কযেক বৎসব কাটিযাছে।

শ্যামা এখন তিনটি সন্তানেব জননী। বড়খোকাব দু'বছব বযসেব সময তাহার একটি মেযে হইয়াছে, তাব তিন বছব পবে আব একটি ছেলে। নামকরণ হইযাছে তিজনেবই বিধানচন্দ্র, বকুলমালা ও বিমানবিহাবী। এগুলি পোষাকি নাম। এ ছাড়া তিনজনের তিনটি ডাকনামও আছে, খোকা, বকু ও মণি।

ওদের মধ্যে বকুলেব স্বাস্থ্যই আশ্চর্য রকমে ভাল। জন্মিযা অবধি একদিনের জন্য সে অসুখে ভোগে নাই মোটা মোটা হাত পা, ফোলা ফোলা গাল,- দুবন্তেব একশেষ। শ্যামা তাহাব মাথার চুলগুলি বাব্‌রি কবিযা দিয়াছে। খাটো জাঙিগযা-পবা মেযেটি যখন একমুহূর্ত স্থিব হইযা দাঁড়াইযা ঝাঁক্‌ড়া চুলেব ফাঁক দিযা মিটমিট কবিযা তাকায, দেখিলে চোখ জুড়াইযা যায়। বকুর রঙও হইযাছে বেশ মাজা। বৌদ্রোজ্জ্বল প্রভাতে তাহাব মুখখানা জ্বল্‌জ্বল কবে, ধূসব সন্ধ্যায় স্তিমিত হইয়া আসে- সারাদিনের বিনিদ্র দুবন্তপনাব পর নিদ্রাতুর চোখ দুটির সঙ্গে বেশ মানায়। কিন্তু দেখিবাব কেহ থাকে না। শ্যামা রান্না কবে, শ্যামাব কোল জুড়িয়া থাকে ছোট খোকামণি। বকু পিছন হইতে মার পিঠে বুকেব ভব দিয়া দাঁড়াইযা থাকে। মাব কাঁধেব উপর দিয়া ডিবরির শিখাটিব দিকে চাহিযা থাকিতে থাকিতে তাহার চোখ বুজিযা যায়।

শ্যামা পিছনে হাত চালাইযা তাহাকে ধরিয়া রাখিযা ডাকে, খোকা, অ খোকা!

বিধান আসিলে বলে, ভাইকে কোলে নিয়ে বোসো তো বাবা, বুকুকে শুইয়ে দিয়ে আসি।

বিধানের হাতে খড়ি হইয়া গিয়াছে, এখন সে প্রথমভাগের পাঠক। ছেলেবেলা হইতে লিভার খারাপ হইয়া শরীরটা তাহার শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, মাঝে মাঝে অসুখে ভোগে। মুখখানি অপরিপুষ্ট ফুলের মত কোমল। শরীর ভাল না হোক ছেলেটার মাথা হইয়াছে খুব সাফ। বুলি ফুটিবার পর হইতেই প্রশ্নে প্রশ্নে সকলকে সে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে, জগতের দিকে চোখ মেলিয়া চাহিয়া তাহার শিশু-চিত্তে যে সহস্র প্রশ্নের সৃষ্টি হয় প্রত্যেকটির জবাব পাওয়া চাই। মনোজগতে সে দুর্জ্ঞেয় রহস্য থাকিতে দিবে না তাহার জিজ্ঞাসার ওই সীমা নাই। সবজান্তা হইবার জন্য তাহার এই ব্যাকুল প্রয়াসে সবজান্তারা কখনো হাসে কখনো বিরক্ত হয়। বিরক্ত বেশি হয় শীতল বিধানের গোটা দশেক কেনর জবাব দিয়া পরবর্তী পুনরাবৃত্তিতে সে ধমক লাগায়। শ্যামার ধৈর্য অনেকক্ষণ বজায় থাকে। অনেক সময় হাতের কাজ করিতে করিতে যা মনে আসে জবাব দিয়া যায় সব সময় খেয়ালও থাকে না কি বলিতেছে। বিধানের চিন্তাজগত মিথ্যায় ভরিয়া ওঠে মনে তাহার বহু অসত্যের ছাপ লাগে।

দিনের মধ্যে এমন কতগুলি প্রহর আছে শ্যামাকে যখন যাচিয়া ছেলের মুখে কথবত্তা আনিতে হয়। বিধান মাঝে মাঝে গম্ভীর হইয়া থাকে। গভীর অন্যমনস্কতায় ডুবিয়া গিয়া সে স্থির হইয়া বসিয়া থাকে চোখ দুটি উদাসীন হইয়া যায়। স্প্রিংএর মোটরটি পাশে পড়িয়া থাকে ছবির বইটির পাতা বাতাসে উল্টাইয়া যায় সে চাহিয়া দেখে না। ছেলের মুখ দেখিয়া শ্যামার বুকের মধ্যে কেমন করিয়া ওঠে। যেন ঘুমন্ত ছেলেকে ডাকিয়া তুলিতেছে এমনিভাবে সে ডাকে খোকা এই খোকা।

উঁ?

আয় তো আমার কাছে। দ্যাখ তোর জন্যে কেমন জামা করছি।

বিধান কাছেও আসে জামাও দ্যাখে কিন্তু তাহার কোন রকম উৎসাহ দেখা যায় না।

শ্যামা উদ্বিগ্ন হইয়া বলে, কি ভাবছিস রে তুই? কার কথা ভাবছিস?

কিছু ভাবছি না তো!

মোটরটা চালা না খোকা, মণি কেমন হাসবে দেখিস্।

বিধান মোটরে চাবি দিয়া ছাড়িয়া দেয়। মোটরটা চক্রাকারে ঘুরিয়া ওদিকের দেয়ালে ঠোক্কর খায়। শ্যামা নিজেই উচ্ছ্বসিত হইয়া বলে, যাঃ, তোর মোটরের কলিশন হয়ে গেল! বিধান বসিয়া থাকে, খেলনাটিকে উঠাইয়া আনিবার স্পৃহা তাহার দেখা যায় না। সেলাই বন্ধ করিয়া শ্যামা ছুঁচটি কাপড়ে বিঁধাইয়া রাখে। বিধানের হঠাৎ এমন মনমরা হইয়া যাওয়ার কোন কারণই সে খুঁজিয়া পায় না। বুড়ো মানুষের মত একি উদাস গাম্ভীর্য অতটুকু ছেলের?

খিদে পেয়েছে তোর?

বিধান মাথা নাড়ে।

তবে তোর ঘুম পেয়েছে খোকা। আয় আমরা শুই।

ঘুম পায় নি তো!

ওরে দুর্জ্জেয়, তবে তোর হইয়াছে কি!

তবে চল, ছাদ থেকে কাপড় তুলে আনি।

সিঁড়িতে ছাদে শ্যামা অনর্গল কথা বলে। বিধানের জীবনে যত কিছু কাম্য আছে, জ্ঞানপিপাসার যত কিছু বিষয়বস্তু আছে, সব সে তাহার মনে পড়াইয়া দিতে চায়। ছেলের এই সাময়িক ও মানসিক সন্ন্যাসে শচীমাতার মতই তাহার ব্যাকুলতা জাগে। কাপড় তুলিয়া কুঁচাইয়া সে বিধানের হাতে দেয়। বিধান কাপড়গুলি নিজের দুই কাঁধে জমা করে। কাপড় তোলা শেষ হইলে শ্যামা আলিসায় ভর দিয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া বলে, কুল্পিবরফ খাবি খোকা?

এমনি ভাবে কথা দিয়া পূজা করিয়া, কুল্পিবরফ ঘুষ দিয়া শ্যামা ছেলের নীরবতা ভঙ্গ করে।

বিধান জিজ্ঞাসা করে, কুল্পিবরফ কি করে তৈরি করে মা?

শ্যামা বলে, হাতল ঘোরায় দেখিস নি? বরফ বেটে চিনি মিশিয়ে ওর ওই যন্ত্রটার মধ্যে রেখে হাতল ঘোরায়, তাইতে কুল্পিবরফ হয়।

চিনি তো সাদা, রঙ কি করে হয়?

একটু বঙ মিশিযে দেয।

কি বঙ দেয মা? আলতাব বঙ?

দূব! আলতাব বঙ বুঝি খেতে আছে? অন্য বঙ দেয।

কি বঙ?

গোলাপ ফুলেব বঙ বাব কবে নেয।

গোলাপ ফুলেব বঙ কি কবে বাব কবে মা?

শিউলী বোঁটাব বঙ কি কবে বাব কবে দেখিস নি?

সেদ্ধ কবে না?

হ্যাঁ।

তুমি আলতা পব কেন মা?

পবতে হয বে নইলে লোকে নিন্দে কবে যে।

কেন?

এ কেনব অন্ত থাকে না।

বিধানেব প্রকৃতিব আব একটা অদ্ভুত দিক আছে, পশুপাখিব প্রতি তাব মমতা ও নির্মমতাব সমন্বয। কুকুব বিডাল আব পাখিব ছানা পুষিতে সে যেমন ভালবাসে এক এক সময পোষা জীবগুলিকে সে তেমনি অকথ্য যন্ত্রণা দেয। একবাব সন্ধ্যাব সময ঝড উঠিলে একটি বাচ্চা শালিখ পাখি বাডিব বাবান্দায আসিযা পড়িযাছিল। বিধান ছানাটিকে কুডাইযা আনিযাছিল আঁচল দিযা পালক মুছিযা লণ্ঠনেব তাপে সেঁক দিযা তাহাকে বাঁচাইযাছিল শ্যামা। পবদিন খাঁচা আসিল বিধান নাওযা খাওযা ভুলিযা গেল। ক্ষুদ্র বন্দী জীবটি যেন তাহাবই সম্মানীয অতিথি। হবদম ছাতু ও জল সবববাহ কবা হইতেছে বিধানেব দিন কাটিতেছে খাঁচাব সামনে। কি তাহাব গভীব মনোযোগ কি ভালবাসা। অথচ কযেকদিন পবে, এক দুপুববেলা পাখিটিকে সে ঘাড় মটকাইযা মাবিযা বাখিল। শ্যামা আসিযা দেখে মবা পাখিব ছানাটিকে আগলাইযা বিধান যেন পুত্রশোকেই আকুল হইযা কাঁদিতেছে।

ও খোকা, কি কবে মবল বাবা, কে মাবলে?

বিধান কথা বলে না, শুধু কাঁদে।

সত্যভামা আজও এ বাড়িতে কাজ কবে, সে উঠানে বাসন মাজিতেছিল. বলিল, নিজে গলা টিপে মেবে ফেললে মা, এমন দুবন্ত ছেলে জন্মে দেখিনি, —সন্দোব ছ্যানাটি গো!

তুই মেবেছিস? কেন মেরেছিস খোকা? শ্যামা বাববাব জিজ্ঞাসা কবিল, বিধান কথা বলিল না আবও বেশি কবিযা কাঁদিতে লাগিল। শেষে শ্যামা বাগিযা বলিল, কাঁদিস নে মুখপোড়া ছেলে, নিজে মেবে আবাব কান্না কিসেব?

মবা পাখিটাকে সে প্রাচীব ডিঙ্গাইযা বাহিবে ফেলিযা দিল।

বাত্রে শ্যামা শীতলকে ব্যাপাবটা বলিল। বলিল এসব দেখিযা শুনিযা তাহাব বড ভাবনা হয। কেমন যেন মন ছেলেটাব এত মাযা ছিল পাখিব বাচ্চাটাব উপব! ছেলেব এই দুর্বোধ্য কীর্তি লইযা খানিকক্ষণ আলোচনা কবিযা তাহাবা দুজনেই ছেলেব মুখেব দিকে চাহিয়া বহিল বিধান তখন ঘুমাইযা পডিযাছিল। এবকম বহস্যময প্রকৃতি ছেলেটা পাইল কোথা হইতে? ওব দেহ মন তাদেব দুজনেব দেওযা, তাদেব চোখেব সামনে হাসিযা কাঁদিযা খেলা কবিযা ও বড হইযাছে, ওব মধ্যে এই দুর্বোধ্যতা কোথা হইতে আসিল?

শ্যামা বলে, তোমায এ্যাদ্দিন বলিনি মাঝে মাঝে গম্ভীব হযে ও কি যেন ভাবে, ডেকে সাড়া পাইনে।

শীতল গম্ভীবভাবে মাথা নাড়িযা বলে সাধাবণ ছেলেব মত হযনি।

শ্যামা সায দেয কত বাড়িব কত ছেলে তো দেখি আপন মনে খেলাধুলো কবে খায দায ঘুমোয, এ যে কি ছেলে হযেছে কাবো সঙ্গে মিল নেই। কী বুদ্ধি দেখেছ?

শীতল বলে, কাল কি হযেছে জান জিগ্যেস কবেছিলাম দশ টাকা মণ হলে আড়াই সেবেব দাম কত, সঙ্গে সঙ্গে বললে দশ আনা। কতদিন আগে বলে দিযেছিলাম যত টাকা মণ আড়াই সেব তত আনা, ঠিক মনে বেখেছে।

বাড়িতে একটা পোষা বিড়াল ছিল, রাণী। একদিন দুপুরবেলা গলায দড়ি বাঁধিযা জানালার শিকেব সঙ্গে ঝুলাইয়া দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বিধান

তাহাব মৃত্যুযন্ত্রণা দেখিতেছিল। দেখিযা শ্যামা সেদিন ভযানক বাগিযা গেল। বাণীকে ছাডিযা দিযা ছেলেকে সে বেদম মাব মাবিল। বিধানেব স্বভাব কিন্তু বদলাইল না। পিঁপড়ে দেখিলে সে টিপিযা মাবে ফডিঙ ধবিযা পাখা ছিঁডিযা দেয বিডালছানা কুকুবছানা পুষিযা হঠাৎ একদিন যন্ত্রণা দিযা মাবিযা ফেলে। বাবো তেবো বছব বযস হওযাব আগে তাহাব এ স্বভাব শোধবায নাই।

এখন শীতলেব আয কিছু বাডিযাছে। পিতাব আমল হইতে তাহাদেব নিজেদেব প্রেস ছিল প্রেসেব কাজ সে ভাল বোঝে তাব তত্ত্বাবধানে কমল প্রেসেব অনেক উন্নতি হইযাছে। প্রেসেব সমস্ত ভাব এখন তাহাব মাহিনাব উপব সে লাভেব কমিশন পায উপবি আযও কিছু কিছু হয। সেটা এই বকম। ব্যবসাযে অনেক কিছুই চলে অনেক কোম্পানীব যে কর্ম চাবীব উপব ছাপাব কাজেব ভাব থাকে ফর্মা পিছু আট টাকা দিযা সে প্রেসেব দশ টাকাব বিল দাবী কবে এবকম বিল দিতে হয প্রেসেব মালিক কমল ঘোষ তাহা জানে। তাই খাতাপত্রে দশ টাকা পাওনা লেখা থাকিলেও আট অথবা দশ কত টাকা ঘবে আসিযাছে সব সময জানিবাব উপায থাকে না। জানে শুধু সে প্রেসেব ভাব থাকে যাহাব উপব। শীতল অনাযাসে অনেক দশ টাকা পাওনাকে আট টাকায দাড কবাইযা দেয। প্রেসেব মালিক কমল ঘোষ হযত মাঝে মাঝে সন্দেহ কবে কিন্তু প্রেসেব ক্রমোন্নতি দেখিযা কিছু বলে না।

শীতলেব খুব পবিবর্তন হইযাছে। কমল প্রেসে চাকবী পাওযাব আগে সে দেড বছব বেকাব বসিযাছিল যেমন হয এই দুঃখেব সময সুসমযেব বন্ধুদেব চিনিতে তাহাব বাকি থাকে নাই এবাব তাদেব সে আব আমল দেয না সোজাসুজি ওদেব ত্যাগ কবিবাব সাহস তো তাব নাই এখন সে ওদেব কাছে দাবিদ্র্যেব ভান কবে দেড বছব গবীব হইযা থাকিবাব পব এটা সে সহজেই কবিতে পাবে। তাব মধ্যে ভাবি একটা অস্থিবতা আসিযাছে কিছু দিন খুব স্ফূর্তি কবিযা কাটানোব পব শ্রান্ত মানুষেব যে বকম আসে কিছু ভাল লাগে না কি কবিবে ঠিক পায না। শ্যামাব সঙ্গে গোডা হইতে মনেব মিল কবিযা বাখিলে এখন সে বাড়িতেই একটি সুখ দুঃখেব সঙ্গী পাইত,

আর তাহা হইবার উপায় নাই– সাংসারিক ব্যাপারে ও ছেলে-মেয়েদের ব্যাপারে শ্যামার সঙ্গে তাহার কতগুলি মত ও অনুভূতি খাপ খায় মাত্র শ্যামার কাছে বেশি আর কিছু আশা করা যায় না। অথচ এদিকে বাহিরে মদ খাইয়া একা একা স্ফূর্তিও জমে না, সব কি রকম নিরানন্দ অসার মনে হয়। অনেক প্রত্যাশা করিয়া হয়ত সে তাহার পরিচিত কোন মেয়ের বাড়ি যায় কিন্তু নিজের মনে আনন্দ না থাকিলে পরে কেন আনন্দ দিতে পারিবে তাও টাকার বিনিময়ে? আজকাল হাজার মদ গিলিয়াও নেশা পর্যন্ত যেন জমিতে চায় না কেবল কান্না আসে। কত কি দুঃখ উথলিয়া ওঠে।

এক একদিন সে করে কি সকাল সকাল প্রেস হইতে বাড়ি ফেরে। শ্যামার রান্নার সময় সে ছেলেমেয়েদের সামলায় বারান্দায় পায়চারি করিয়া ছোট খোকামণিকে ঘুম পাড়ায় মুখের কাছে বাটি ধরিয়া বুকুকে খাওয়ায় দুধ। বুকুকে কোলে করিয়া ঘুম পাড়াইতে হয় না সে বিছানায় শুইয়াই ঘুমায়, ঘুমাইয়া পড়িবার আগে একজনকে শুধু তাহার পিঠে আস্তে আস্তে চুলকাইয়া দিতে হয়। তারপর বাকি থাকে বিধান সে খানিকক্ষণ পড়ে তারপর তাহাকে গল্প বলিয়া রান্না শেষ হওয়া পর্যন্ত জাগাইয়া রাখিতে হয়। এসব শীতল অনেকটা নিখুঁতভাবেই করে। সকলের খাওয়া শেষ হইলে গর্বিত গাম্ভীর্যের সঙ্গে তামাক টানিতে টানিতে শ্যামার কি বলিবার আছে শুনিবার প্রতীক্ষা করে। শ্যামার কাছে সে কিছু প্রশংসার আশা করে বৈকি! শ্যামা কিন্তু কিছু বলে না। তাহার ভাব দেখিয়া মনে হয় সে রান্না করিয়াছে শীতল ছেলে রাখিয়াছে কোন পক্ষেরই এতে কিছু বাহাদুরি নাই।

শেষে শীতল বলে কি দুষ্টুই যে ওরা হয়েছে শ্যামা সামলাতে হয়রাণ হয়ে গেছি—ওদের নিয়ে তুমি রান্না কর কি করে?

শ্যামা বলে, মণিকে ঘুম পাড়িয়ে নি, বুকুকে খোকা রাখে।

এত সহজ? শীতল বড় দমিয়া যায়, সন্ধ্যা হইতে ওদের সামলাইতে সে হিমসিম খাইয়া গেল শ্যামা এমন অবলীলাক্রমে তাহাদের ব্যবস্থা করে?

শ্যামা হাই তুলিয়া বলে, এক একদিন কিন্তু ভারি মুস্কিলে পড়ি বাবু, মণি ঘুমোয় না, বুকুটা ঘ্যান ঘ্যান করে, সবাই মিলে আমাকে ওরা খেয়ে ফেলতে চায়,—মরেও তেমনি মার খেয়ে। তুমি বাড়ি থাকলে বাঁচি,

ফিরো দিকি একটু সকাল সকাল রোজ? শ্যামা আঁচল বিছাইয়া শ্রান্ত দেহ মেঝেতে এলাইয়া দেয়, বলে, তুমি থাকলে ওদেরও ভাল লাগে, সন্ধ্যাবেলা তোমায় দেখতে না পেলে বকু তো আগে কেঁদেই অস্থির হ'ত।

শীতল আগ্রহ গোপন করিয়া জিজ্ঞাসা করে, আজকাল কাঁদে না?

আজকাল ভুলে গেছে। হ্যাঁগো, মুদী দোকানে টাকা দাও নি?

দিয়েছি।

মুদী আজ সত্যভামাকে তাগিদ দিয়েছে। তামাক পুড়ে গেছে, এবার রাখো,—দেব আরেক ছিলিম সেজে?

শীতল বলে না থাক।

আবোল তাবোল খরচ করে কেন যে টাকাগুলো নষ্ট কর, দোতলায় একখানা ঘর তুলতে পারলে একটা কাজের মত কাজ হত টাকা উড়িয়ে লাভ কি?

তারপর তাহারা ঘরে যায় মণি আর বকুর মাঝখানে শ্যামা শুইয়া পড়ে। বিধান একটা স্বতন্ত্র ছোট চৌকীতে শোয় শোয়ার আগে একটি বিড়ি খাইবার জন্য শীতল সে চৌকীতে বসিবামাত্র বিধান চীৎকার করিয়া জাগিয়া যায়। শীতল তাড়াতাড়ি বলে আমি রে খোকা আমি ভয় কি?—বিধান কিন্তু শীতলকে চায় না সে কাঁদিতে থাকে।

শ্যামা বলে আয় খোকা আমার কাছে আয়।

সে রাত্রে ব্যবস্থা উল্টাইয়া যায়। শীতলের বিছানায় শোয় বিধান বিধানের ছোট্ট চৌকীটিতে শীতল পা মেলিতে পারে না। একটা অদ্ভুত ঈর্ষার জ্বালা বোধ করিতে করিতে সে মা ও ছেলের আলাপ শোনে।

স্বপন দেখেছিলি না রে খোকা?

কিসের স্বপন রে?

ভুলে গেছি মা।

খুকীর গায়ে তুমি যেন পা তুলে দিও না বাবা।

কি করে দেব? পাশ বালিশ আছে যে?

তুই যে পাশ বালিশ ডিঙ্গিয়ে আসিস। বালিশের তলে কি হাতড়াচ্ছিস?

টর্চ্চটা একটু দাও না মা।

কি কর্বাব টর্চ্চ দিযে বাত দ্বপ্রবে? এমনি জেবলে খবচ কবে ফ্যালো, শেষে দবকাবেব সময মরব এখন অন্ধকারে।

একটু পবেই ঘবে টর্চ্চেব আলো বাবকযেক জবলিযা নিভিযা যায দেযালেব গাযে টিকটিকিব ডাক শ্বনিযা বিধান তকে খ্বঁজিযা বাহিব কবে।

নে হযেছে দে এবাব।

জল খাব মা।

জল খাইযা বিধান মত বদলায।

আমি এখানে শোব না মা যা গন্ধ!

শ্যামা হাসে তোব বিছানায ব্বঝি গন্ধ নেই খোকা ভাবি সাধ হযেছিস না

বডদিনেব সময বাখালেব সঙ্গে মন্দা কলিকাতায বেডাইতে আসিল পব পব তাহাব দ্বটি মেযে হইযাছে মেযে দ্বটিকে সে সঙ্গে আনিল ছেলেবা বহিল বনগাঁযে। মন্দাব বড মেযেটি একটি খোডা পা লইযা জন্মিযাছিল এখন প্রায চাব বছব বযস হইযাছে কথা বলিতে শেখে নাই ম্বখ দিযা সব না লালা পডে। মেযেটকে দেখিযা শ্যামা বড মমতা বোধ কবিল। কত কষ্টই পাইবে জীবনে! এখন অবশ্য মমতা কবিযা সকলেই আহা বলিবে বড হইযা ও যখন সকলেব গলগ্রহ হইযা উঠিবে ফেলাও চলিবে না বাখিতেও গা জবালা কবিবে লাঞ্ছনা স্ববব্ব হইবে তখন। মন্দা মেযেব নাম বাখিযাছে শোভা। শ্বনিলে মনটা কেমন কবিযা ওঠে। এমন মেযেব ও বকম নাম বাখা কেন

মন্দা বলিল ওকে ডাকি বাদ্ব বলে।

শ্যামা ভাবিযাছিল সতীন আসিবাব পব মন্দাব জীবনেব স্বখ শান্তি নষ্ট হইযা গিযাছে কিন্তু মন্দাকে এতটুকু অস্বখী মনে হইল না। সে খ্বব মোটা হইযাছে স্থানে অস্থানে মাংস থলথল কবে চলাফেবা কথাবর্তায কেমন থিযেটাবি ধবণেব গিন্নি গিন্নি ভাব। স্বভাবে আর তাহাব তেমন ঝাঁঝ নাই সে বেশ অমাযিক ও মিশ্বক হইযা উঠিযাছে। আব বছব মন্দাব শাশ্বড়ী মরিযাছে গ্বহিণীর পদটা বোধ হয পাইযাছে সেই শাশ্বডীব অভাবে

ননদদের সে হয়ত আর গ্রাহ্য করে না। রাখালের উপর তাহার অসীম প্রতিপত্তি দেখা গেল। কথা তো বলে না যেন হুকুম দেয়, আর যা সে বলে তাই রাখাল শোনে।

সতীন? হ্যাঁ, সে এখানেই থাকে বৌ, বড্ড গরীবের মেয়ে, বাপের নেই চালচুলো, এখানে না থেকে আর কোথায় যাবে বল, যাবার যায়গা থাকলে তো যাবে—বাপ ব্যাটা ডেকেও জিগ্যেস করে না। চামারের হদ্দ সে মানুষটা ওই করে তো মেয়ে গছালে ছল করে বাড়ি ডেকে নিয়ে যেত, আজ নেমন্তন্ন কাল মেয়ের অসুখ মন্দা হাসিল পাড়ার মেয়ে ভাই ছুঁড়িকে এইটুকু দেখেছি হ্যাংলার মত ঠিক খাবার সময়টিতে লোকের বাড়ি গয়ে হাজির হত কে জানত বাবা ও শেষে বড় হয়ে আমারি ঘাড় ভাঙ্গবে!

মন্দার মেয়ে দুটিকে শ্যামা খুব আদর করিল আর শ্যামার ছেলেকে আদর করিল মন্দা রেষারেষি করিয়া পরস্পরের সন্তানদের তাহারা আদর করিল। মন্দার মেয়েদের জন্য শ্যামা আনাইল খেলনা শ্যামার ছেলেদের মন্দা জামা কিনিয়া দিল। একদিন তাহারা দেখিতে গেল থিয়েটার টিকিটের দাম দিল মন্দা গাড়ি ভাড়া ও পান লেমনেডের খরচ দিল শ্যামা। দুজনের এবার মনের মিলের অন্ত রহিল না হাসিগল্প আমোদ আহ্লাদে দশ বারোটা দিন কোথা দিয়া কাটিয়া গেল। মন্দা আসলে লোক মন্দ নয় শাশুড়ীর অতিরিক্ত শাসনে মেজাজটা আগে কেবল তাহার বিগড়াইয়া থাকিত। শ্যামা জীবনে কারো সঙ্গে এরকম আত্মীয়তা করার সুযোগ পায় নাই মন্দার যাওয়ার দিন সে কাঁদিয়া ফেলিল সারাদিন বাদুকে কোল হইতে নামাইল না বাদুর লালায় তাহার গা ভিজিয়া গেল। মন্দাও গাড়িতে উঠিল চোখ মুছিতে মুছিতে।

শুধু রাখালকে এবার শ্যামার ভাল লাগিল না। জেলে না গিয়াও পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার সময় মানুষের কয়েদীর মত স্বভাব হয় সব সময় একটা গোপন করা ছোটলোকামির আভাস পাওয়া যাইতে থাকে। রাখালেরও যেন তেমনি বিকার আসিয়াছে। যে কয়দিন এখানে ছিল সে যেন কেমন ভয়ে ভয়ে থাকিত কেমন একটা অপরাধীর ভাব, লোকে যেন তাহার সম্বন্ধে কি জানিয়া ফেলিয়া মনে মনে তাহাকে অশ্রদ্ধা করিতেছে। সে যেন তাই জ্বালা বোধ করিত, প্রতিবাদ করিতে চাহিত অথচ সব তাহার নিজেরই কল্পনা

বলিয়া চোরের মত, যে চোরকে কেহ চোর বলিয়া জানে না, সব সময় অত্যন্ত হীন একটা লজ্জাবোধ করিয়া সংকুচিত হইয়া থাকিত।

পরের মাসে শীতল মাহিনা ও কমিশনের টাকা আনিয়া দিল অর্ধেক, প্রথমে সে কিছু স্বীকার করিতে চাহিল না, তারপর কারণটা খুলিয়া বলিল। কমল ঘোষের কাছে শীতল সাতশো টাকা ধার করিয়াছে, সুদ দিতে হইবে না, কিন্তু ছ'মাসের মধ্যে টাকাটা শোধ করিতে হইবে। সাতশো টাকা! এত টাকা শীতল ধার করিতে গেল কেন?

রাখালকে দিয়েছি।

ঠাকুরজামাইকে ধার করে সাতশো টাকা দিয়েছ? তোমার মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেছে কিনা বুঝিনে বাবু, কেন দিলে?

শীতল ভয়ে ভয়ে বলিল, ছ'সাত মাস রাখালের চাকরী ছিল না শ্যামা, আশ্বিন মাসে বোনের বিয়েতে বড্ড দেনায় জড়িয়ে পড়েছে, হাত ধরে এমন করে টাকাটা চাইলে—

শ্যামার মাথা ঘুরিতেছিল। সাতশো টাকা! রাখাল যে এবার চোরের মত বাস করিয়া গিয়াছে তাহার কারণ তবে এই? সে সত্যই তাহাদের টাকা চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে? টাকা সম্বন্ধে শীতলের দুর্বলতা রাখালের অজানা নয়, এবার সে তাহা কাজে লাগাইয়াছে। মন্দাকেও শ্যামা এবার চিনিতে পারে, অত যে মেলামেশা আমোদ-আহ্লাদ সব তাহার ছল। ওদিকে রাখাল যখন শীতলকে টাকার জন্য ভজাইতেছিল, মন্দা এদিকে তাহাকে নানা কৌশলে ভুলাইয়া রাখিয়াছিল সে যাহাতে টের পাইয়া বারণ করিতে না পারে। এতো জানা কথা যে শীতল আর সে শীতল নাই, সে বারণ করিলে টাকা শীতল কখনো রাখালকে দিত না।

রাগে দুঃখে সারাদিন শ্যামা ছটফট করিল, যতবার রাখাল ও মন্দার হীন ষড়যন্ত্রের কথা আর টাকার অংকটা সে মনে করিল গা যেন তাহার জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। কত কষ্টের টাকা তাহার, শীতল তো পাগল, কবে তাহার কমল প্রেসের চাকরী ঘুচিয়া যায় ঠিক নাই, দুটো টাকা জমানো না থাকিলে ছেলেদের লইয়া তখন সে করিবে কি? শীতলকে সে অনেক জেরা করিল,—কবে টাকা দিয়েছ? রাখাল কবে টাকা ফেরত দেবে বলেছে? টাকার

পরিমাণটা সত্যই সাতশো না আরও বেশি? এমনি সব অসংখ্য প্রশ্ন। শীতলও এখন অনুতাপ করিতেছিল, প্রত্যেকবার জেরা শেষ করিয়া শ্যামা যখন তাহাকে রাগের মাথায় যা মুখে আসিল বলিয়া গেল, সে কথাটি বলিল না।

শুধু যে কথা বলিল না তা নয়, তাহার বর্তমান বিষণ্ণ মানসিক অবস্থায় এ ব্যাপারটা এমন গুরুতর আকার ধারণ করিল যে সে আরও মনমরা হইয়া গেল এবং কয়েকদিন পরেই শ্যামাকে শোনাইয়া আবোল-তাবোল কি যে সব কৈফিয়ৎ দিতে লাগিল শ্যামা কিছুই বুঝিল না। শীতল ফাজলামি আরম্ভ করিয়াছে ভাবিয়া সে রাগিয়া গেল। শীতল অনুতপ্ত বিষণ্ণ ও নম্র হইয়া না থাকিলে এতটা বাড়াবাড়ি করিবার সাহস হয়ত শ্যামার হইত না, এবার শীতলও রাগিয়া উঠিয়া অনেকদিন পরে শ্যামাকে একটা চড় বসাইয়া দিল, তারপর সেই যেন মার খাইয়াছে এমনি মুখ করিয়া শ্যামার আশেপাশে ঘণ্টাখানেক ঘোরাঘুরি করিয়া বাহির হইয়া গেল। বাড়ি ফিরিল একদিন পরে।

এতকাল পরে আবার মার খাইয়া শ্যামাও নম্র হইয়া গিয়াছিল, শীতল বাড়ি ফিরিলে সে যেভাবে সবিনয় আনুগত্য জানাইল, প্রহৃতা স্ত্রীরাই শুধু তাহা জানে এবং পারে। তবু অশান্তির অন্ত হইল না। পরস্পরকে ভয় করিয়া চলার জন্য দারুণ অস্বস্তির মধ্যে তাহাদের দিন কাটিতে লাগিল।

শ্যামা বলে, বেশ ভদ্রতা করিয়াই বলে, তুমি এমন মন খারাপ করে আছ কেন?

শীতলও ভদ্রতা করিয়া বলে, টাকাটা যদ্দিন না শোধ হচ্ছে শ্যামা -

হঠাৎ মাসিক উপার্জন একেবারে অর্ধেক হইয়া গেলে চারিদিকে তাহার যে ফলাফল ফুটিয়া ওঠে, চোখ বুজিয়া থাকিলেও খেয়াল না করিয়া চলে না। স্বামীস্ত্রীর মধ্যে যেন একটা শত্রুতার সৃষ্টি হইতে থাকে।

শেষে শ্যামা একদিন বুক বাঁধিয়া টাকা তুলিবার ফর্মে নাম সই করিয়া তাহার সেভিংস ব্যাঙ্কের খাতাখানা শীতলের হাতে দিল। খাতায় শুধু জমার অংকপাত করা আছে, সত্যভামাকে দিয়া পাঁচটি সাতটি করিয়া টাকা জমা দিয়া শ্যামা শ' পাঁচেক টাকা করিয়াছে, একটি টাকা কোনদিন তোলে নাই।

টাকাকা তুলে কমলবাবুকে দাও গে ধারটা শোধ হয়ে যাক, টাকা থাকতে মনের শান্তি নষ্ট করে কি হবে? আস্তে আস্তে আবার জমবে'খন।

খাতাখানা লইয়া শীতল সেই যে গেল সাতদিনের মধ্যে আর সে বাড়ি ফিরিল না। শ্যামা যে বুঝিতে পারিল না তা নয় তবু একি বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় যে তার অত কষ্টের জমানো টাকাগুলি লইয়া শীতল উধাও হইয়া গিয়াছে? একদিন বিষ্ণুপ্রিয়ার বাড়ি গিয়া শ্যামা কমল প্রেসে লোক পাঠানোর ব্যবস্থা করিয়া আসিল। সে আসিয়া খবর দিল প্রেসে শীতল যায় নাই। শীতল গাড়ি চাপা পড়িয়াছে অথবা তাহার কোন বিপদ হইয়াছে শ্যামা একবারও তাহা ভাবে নাই কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া শীতলকে ভালরকম চিনিত না বলিয়া হাসপাতালে থানায় আর খবরের কাগজের আপিসে খোঁজ করাইল। গাড়িটাড়ি চাপা পড়িয়া থাকিলে শীতলের একটা সংবাদ অবশ্যই পাওয়া যাইত শ্যামাকে এই সান্ত্বনা দিতে আসিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া অবাক হইয়া বাড়ি গেল। শ্যামা যেভাবে তার কাছে স্বামীনিন্দা করিল ছোটজাতের স্ত্রীলোকের মুখেও বিষ্ণুপ্রিয়া কোনদিন সে সব কথা শোনে নাই।

বিধান জিজ্ঞাসা করে বাবা কোথায় গেছে মা

শ্যামা বলে চুলোয়।

শ্যামা রাধে বাড়ে ছেলেমেয়েদের খাওয়ায় নিজেও খায় কিন্তু বাঘিনীর মত সব সময় সে যেন কাহাকে খুন করিবার জন্য উদ্যত হইয়া থাকে। জ্বালা তাহার কে বুঝিবে? তিনটি সন্তানের সে জননী স্বামীর উপর তাহার নির্ভর অনিশ্চিত' একজন পরম বন্ধু তাহার ছিল ব্যাংক। সে তাহাকে ঠকাইয়া গিয়াছে স্বামী আজ তাহার সঞ্চয় লইয়া পলাতক। বোকার মত কেন যে সে সেভিংস ব্যাঙ্কের খাতাখানা শীতলকে দিতে গিয়াছিল' রাত্রে শ্যামার ঘুম হয় না। শীতের রাত্রি ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দিতে হয় শ্যামা একটা লণ্ঠন কমাইয়া রাখে ঘরের বাতাস দূষিত হইয়া ওঠে। শ্যামা বারবার মশারি ঝাড়ে বিধানের গায়ে লেপ তুলিয়া দেয় বকুর কাঁথা বদলায় মণিকে তুলিয়া ঘরের জল বাহির হওয়ার নালিটার কাছে বসায় আরও কত কি করে। চোখে তাহার জলও আসে।

এমনি সাতটা রাত্রি কাটাইবার পর অষ্টম রাত্রে পাগলের মত চেহারা

লইয়া শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে শীতল ফিরিয়া আসিল। শ্যামা জিজ্ঞাসা করিল, খেয়ে এসেছ?

শীতল বলিল, না।

সেই রাত্রে শ্যামা কাঠের উনানে ভাত চাপাইয়া দিল। রান্না শেষ হইতে রাত্রি তিনটা বাজিয়া গেল। শীতল ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, ডাকিয়া তুলিয়া তাহাকে খাইতে বসাইয়া শ্যামা ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। কাছে বসিয়া শীতলকে খাওয়ানোর প্রবৃত্তি হইল না বলিয়া শুধু নয়, ঘুমে তাহার শরীর অবশ হইয়া আসিতেছিল।

পরদিন শীতল শ্যামাকে একশত টাকা ফেরত দিল।

আর কই? বাকি টাকা কি করেছ?

আর তুলি নি তো?

তোলো নি? খাতা কই আমার?

খাতাটা হারিয়ে গেছে শ্যামা, কোনখানে যে ফেললাম—

শ্যামা কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিল, সব টাকা নষ্ট করে এসে আবার তুমি মিছে কথা বলছ, আমি পাঁচশো টাকা সই করে দিলাম একশো টাকা তুমি কি করে তুললে, মিছে কথাগুলো একটু আটকালো না তোমার মুখে - দোতালায় ঘর তুলব বলে আমি যে টাকা জমাচ্ছিলাম গো!

শীতল আস্তে আস্তে সরিয়া গেল।

এবছর প্রথম স্কুল খুলিলেই বিধানকে শ্যামা স্কুলে ভর্তি করিয়া দিবে ভাবিয়াছিল কিন্তু এইসব টাকার গোলমালে ফাল্গুন মাস আসিয়া পড়িল বিধানকে স্কুলে দেওয়া হইল না। শহরতলীর এখানে কাছাকাছি স্কুল নাই, ব্রজনন্দমোহিনী মেমোরিয়াল হাই স্কুল কাশীপুরে প্রায় এক মাইল তফাতে। এতখানি পথ হাঁটিয়া বিধান প্রত্যহ স্কুল করিবে, শ্যামার তাহা পছন্দ হইতেছিল না। কলিকাতার স্কুলে ভর্তি করিলে বিধানকে ট্রামে বাসে যাইতে হইবে, শ্যামার সে সাহস নাই। প্রেসে যাওয়ার সময় শীতল যে বিধানকে স্কুলে পেঁছাইয়া দিবে তাহাও সম্ভব নয়, শীতল কোনদিন প্রেসে যায় দশটায়, কোনদিন একটায়। শ্যামা মহা সমস্যায় পড়িয়া গিয়াছিল। অথচ ছেলেকে

এবার স্কুলে না দিলেই নয় বাড়িতে ওর পড়াশোনা হইতেছে না। শীতলকে বলিয়া লাভ হয় না, কথাগুলি সে গ্রাহ্য করে না। শ্যামা শেষে একদিন পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে গেল বিষ্ণুপ্রিয়ার বাড়ি।

বিষ্ণুপ্রিয়া বলিল, এক কাজ কর না? আমাদের শঙ্কর যেখানে পড়ে তোমার ছেলেকে সেইখানে ভর্তি করে দাও শঙ্কর তো গাড়িতে যায় তোমার ছেলেও ওর সঙ্গে যাবে। তবে ওখানে মাইনে বেশি বড়লোকের ছেলেরাই বেশির ভাগ পড়ে ওখানে আর –ওখানে ভর্তি করলে ছেলেকে ভাল ভাল কাপড় জামা কিনে দিতে হবে –একদিন যে একটু ময়লা জামা পরিয়ে ছেলেকে স্কুলে পাঠাবে তো পারবে না। হেডমাস্টার সায়েব কিনা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভালবাসে।

বিষ্ণুপ্রিয়া আজও শ্যামার উপকার করিতে ভালবাসে কিন্তু আসিলে বসিতে বলে না কথা বলে অনুগ্রহ করার সুরে। বিষ্ণুপ্রিয়ার সেই মেয়েটির বয়স এখন প্রায় এগারো বেণী দুলাইয়া সেও স্কুলে যায় দেখিয়া এখন আর বুঝিবার উপায় নাই কদর্য পাপের ছাপ লইয়া সে জন্মিয়াছিল শুধু মনে হয় মেয়েটা বড় বোকা। বিষ্ণুপ্রিয়ার আর একটি মেয়ে হইয়াছে বছর তিনেক বয়স। বিষ্ণুপ্রিয়া এখন আবার সাজগোজ করে তবে আগের মত দেহের চাকচিক্য তাহার নাই এখন চকচক করে শুধু গহনা অনেকগুলি।

ভাবিয়া চিন্তিয়া শ্যামা বিধানকে শঙ্করের স্কুলেই ভর্তি করিয়া দিল। শঙ্কর বিষ্ণুপ্রিয়ার খুড়তুতো বোনের ছেলে এবার সেকেণ্ড ক্লাশে উঠিয়াছে। বয়সের আন্দাজে ছেলেটা বাড়ে নাই বিধানের চেয়ে মাথায় সে সামান্য একটু উঁচু ভারি মুখচোরা লাজুক ছেলে গায়ের রঙটি টুকটুকে। যত ছোট দেখাক সে সেকেণ্ড ক্লাশে পড়ে স্কুলের অভিজ্ঞতাও তাহার আছে বিধানকে শ্যামা তাহার জিম্মা করিয়া দিল চিবুক ধরিয়া চুমা খাইয়া ছেলেকে দেখাশোনা করার জন্য শ্যামা তাহাকে এমন করিয়াই বলিল যে লজ্জায় শঙ্করের মুখ রাঙা হইয়া গেল।

সারাদিন শ্যামা অন্যমনস্ক হইয়া রহিল। ভাবিবার চেষ্টা করিল বিধান স্কুলে কি করিতেছে। শ্যামার একটা ভয় ছিল স্কুলে বড়লোকের ছেলের সঙ্গে বিধান বানাইয়া চলিতে পারিবে কিনা গরীবের ছেলে বলিয়া

ওকে সকলে তুচ্ছ করিবে না তো? একটা ভরসার কথা শঙ্করের সঙ্গে ওর ভাব হইয়াছে, শঙ্করের বন্ধু বলিয়া সকলে ওকে সমানভাবেই হয়ত গ্রহণ করিবে, হাসি-তামাসা করিবে না। ফাল্গুনের দিনটি আজ শ্যামার বড় দীর্ঘ মনে হয়। একদিনের জন্য ছেলে তাহার বাড়ি ছাড়িয়া কোথাও গিয়া থাকে নাই, অপরিচিত স্থানে অচেনা ছেলেদের মধ্যে দশটা হইতে চারটে পর্যন্ত সে কি করিয়া কাটাইবে কে জানে!

বিকেলে বিধান ফিরিয়া আসিলে শ্যামা তাহার মুখখানা ভারি শুকনো দেখিল। টিফিনের সময় খাবার কিনিয়া খাওয়ার জন্য শ্যামা তাহাকে চার আনা পয়সা দিয়াছিল, বিধান লজ্জায় কিছু খাইতে পারে নাই ভাবিয়া বলিল, ও খোকা, মুখ শুকিয়ে গেছে কেন রে? খাসনি কিছু কিনে টিফিনের সময়?

বিধান বলিল, খেয়েছি তো, পেট ব্যথা করছে মা।

শ্যামা বলিল, কেন খোকা, পেট ব্যথা করছে কেন বাবা? কি খেয়েছিলি কিনে?

পেটের ব্যথায় বিধান নানারকম মুখভঙ্গি করে। চোখে জল দেখা দেয়।

শ্যামা ধমক দিয়া বলে, কি খেয়েছিলি বল।

ফুলুরি।

আর কি?

আর ঝালবড়া।

তাহলে হবে না তোমার পেট ব্যথা, মুখপোড়া ছেলে! রাজ্যে এত ভাল ভাল খাবার থাকতে তুমি খেতে গেলে কিনা ফুলুরি আর ঝালবড়া! কেন খেতে গেলি ওসব—?

শঙ্কর খাওয়ালে মা। শঙ্কর বলে, বাড়িতে ওসব তো খেতে দেয় না, শুধু দুধ আর সন্দেশ খেয়ে মর, তাই—

শঙ্কর ছেলেটা তো তবে কম দুষ্টু নয়? বাড়িতে যা নিষেধ করিয়া দেয় চুরি করিয়া তাই করে? ওর সঙ্গে মেলামেশা করিয়া বিধানের স্বভাব খারাপ হইয়া যাইবে না তো! শ্যামার প্রথমে ভারি ভাবনা হয়, তারপর সে ভাবিয়া দেখে যে লুকাইয়া ফুলুরি আর ঝালবড়া খাওয়াটা খুব বেশি খারাপ

অপরাধ নয়, এরকম দুষ্টামি ছেলেরা করেই। তবু মনটা শ্যামার খুঁত খুঁত করে। ছেলেকে সে নানারকম উপদেশ দেয়, অসংখ্য নিষেধ জানায়। কাজ করিতে করিতে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে ছেলেকে কাছে ডাকিয়া বলে, এ যেন তুমি কখনো কোরো না বাবা, কখখনো নয়।

কেন মা?—বিধান বলে। প্রত্যেকবার।

একদিন মন্দার একখানা পত্র আসিল, খুব দরদ দিয়া অনেক মিষ্টি মিষ্টি কথা দিয়া লিখিয়াছে। চিঠি পড়িয়া শ্যামা মুখ বাঁকাইয়া হাসিল, বলিল, বসে থাক তুমি জবাবের জন্যে হা-পিত্যেশ করে, তোমার চিঠির জবাব আমি দিচ্ছিনে।—কদিন পরে শীতলের কাছে রাখালের একখানা পোস্টকার্ড আসিল, শ্যামা চিঠিখানা পুড়াইয়া ফেলিল, শীতলকে কিছু বলিল না। জবাব না পাইয়া একটু অপমান বোধ করুক লোকটা। ফাঁকি দিয়া টাকা বাগাইয়া লওয়ার জন্য শীতল তাহাকে এমন ঘৃণাই করিতেছে যে চিঠির উত্তরও দেয় না।

ফাল্গুন মাস কাবার হইয়া আসিল। শীত একেবারে কমিয়া গিয়াছে। একদিন রোদ খাওয়াইয়া লেপগুলি শ্যামা তুলিয়া রাখিল। শ্যামার শরীরটা আজকাল ভাল আছে, তিন ছেলের মার আবার শরীর তবু সানন্দে মনে আরেকটি সন্তানের সুখ যেন উঁকি মারিয়া যায়, একা থাকিবার সময় অবাক হইয়া শ্যামা হাসে, কি কাণ্ড মেয়েমানুষের, মাগো! বিধান দশটার সময় ভাত খাইয়া জুতো মোজা হাফপ্যান্ট আর সার্ট পরিয়া স্কুলে যায়, শ্যামা তাহার চুল আঁচড়াইয়া দেয়, আঁচল দিয়া মুখ মুছিয়া দেয়,—প্রথম প্রথম ছেলের মুখে সে একটু পাউডার মাখিয়াও দিত, বড়লোকের ছেলেদের মাঝখানে গিয়া বসিবে একটু পাউডার না মাখিলে কি চলে? স্কুলে ছেলেরা ঠাট্টা করায় বিধান এখন আর পাউডার মাখাইতে দেয় না। বলে, তুমি কিচ্ছু জানো না মা, পাউডার দেখলে ওরা সবাই হাসে, সার শুদ্ধু। কি বলে জান?—বলে চুণ তো মেখেই এসেছিস এবার একটু কালি মাখ, বেশ মানাবে তোকে, মাইরি ভাই, মাইরি।

মাইরি বলে? বিধানের স্কুলে বড়লোকের সোনার চাঁদ অভিজাত ছেলেদের মুখে এই কথাটির উচ্চারণ শ্যামার বড় খাপছাড়া মনে হয়। এমনি

কত কথা বিধান শিখিয়া আসে, মাইরির চেয়েও ঢের বেশি খারাপ কথা। অনেক বড় বড় শব্দও সে শিখিয়া আসে, আর সংকেত, শ্যামা যার মানেও বুঝিতে পারে না। তাহার অজানা এক জগতের সঙ্গে বিধান পরিচিত হইতেছে, অল্প অল্প একটু যা আভাস পায় তাতেই শ্যামা অবাক হইয়া থাকে। সে একটা বিচিত্র গর্ব ও দুঃখ বোধ করে। বাড়িতে এখন বিধানের জিজ্ঞাসা কমিয়া গিয়াছে, প্রশ্নে প্রশ্নে আর সে শ্যামাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে না। ছাদে উঠিয়া, খানিকদূরে বাঁধের উপর দিয়া যে রেলগাড়ি চলিয়া যায়, ছেলেকে তাহা দেখানোর সাধ শ্যামার কিন্তু কমে নাই, জ্ঞান ও বুদ্ধিতে ছেলে তাহাকে ছাড়াইয়া যাইতেছে বলিয়া গর্ব ও আনন্দের সঙ্গে শ্যামার দুঃখ এইটুক।

বকুল আছে।

সে কিন্তু মেয়ে। ছেলের মত শ্যামার কাছে মেয়ের অত খাতির নাই। ছ বছরের মেয়ে, সে তো বুড়ী। শ্যামা তাহাকে দিয়া দুটি একটি সংসারের কাজ করায়, মণিকে খেলা দিতে বলে, সময় পাইলে প্রথম ভাগ খুলিয়া একটু একটু পড়ায়। মেয়েটা যেমন দুরন্ত হইয়াছে সেরকম মাথা নাই, কিছু শিখিতে পারে না। তাহাকে অক্ষর চিনাইতেই শ্যামার একমাস সময় লাগিয়াছে, কতদিনে কর খল শিখিবে কে জানে। মাঝে মাঝে রাগ করিয়া শ্যামা মেয়ের পিঠে একটা চড় বসাইয়া দেয়। বিধানও মারে। প্রথম-ভাগের পড়া যে শিখিতে পারে না তার প্রতি বিধানের অবজ্ঞা অসীম। এক একদিন সকালবেলা হঠাৎ সে তাহার ক্লাশ-মাস্টার অমূল্যবাবুর মত গম্ভীর মুখ করিয়া হুকুম দেয় এই বকু নিয়ে আয় তো বই তোর,—বকু ভয়ে ভয়ে বই লইয়া আসে তাহার ছেঁড়া ময়লা প্রথমভাগখানি। ভয় পাইলে বোঝা যায় কি বড় বড় আশ্চর্য দুটি চোখ বকুলের। পড়া ধরিয়া বোনের অজ্ঞতায় বিধান খানিকক্ষণ শ্যামার সঙ্গে হাসাহাসি করে, তারপর কখন যে সে অমূল্যবাবুর মত ধাঁ করিয়া চাঁটি মারিয়া বসে আগে কারো টের পাইবার যো থাকে না। শ্যামা শুধু বলে, আহা খোকা, মারিস নে বাবা।

বকুল বড় অভিমানী মেয়ে, কারো সামনে সে কখনো কাঁদে না; ছাদে চিলে কুঠির দেয়াল আর আলিসার মাঝখানে তাহার একটি হাতখানেক ফাঁক

গোসাঘর আছে, সেইখানে নিজেকে গুঁজিয়া দিয়া সে কাঁদে। তারপর গোসা-ঘরখানাকে পুতুলের ঘর বানাইয়া সে খেলা করে। যে পুতুলটি তাহার ছেলের বৌ তার সঙ্গে বকুলের বড় ভাব, দুজনে যেন সই। তাকে শোনাইয়া সে সব মনের কথা বলে। বলে, বাবাকে সব বলে দেব, বাবা দাদাকে মারবে, মাকেও মারবে, মারবে না ভাই বৌমা? এ্যাঁ করে জিব বের করে দাদা মরে যাবে—মা কেঁদে মরবে, হুঁ।

শীতলের কি হইয়াছে শ্যামা বুঝিতে পারে না, লোকটা কেমন যেন ভোঁতা হইয়া গিয়াছে, স্ফূর্তিও নাই দুঃখও নাই। সময়মত আপিসে যায়, সময়মত ফিরিয়া আসে, কোনদিন পাড়ার অখিল দত্তের বাড়ি দাবা খেলিতে যায়, কোনদিন বাড়িতেই থাকে। বাড়িতে যতক্ষণ থাকে রাগারাগিও করে না, দীনদুঃখীর মত মুখের ভাবও করিয়া রাখে না স্ত্রী ও পুত্রকন্যার সঙ্গে তাহার কথা ও ব্যবহার সহজ ও স্বাভাবিক হয়, অথচ তার কাছে কারো যেন মূল্য নাই, কিছুই সে যেন গ্রাহ্য করে না। শ্যামার টাকা লইয়া পালানোর পর হইতে তাহার এই পাগলামি-না-করার পাগলামি আরম্ভ হইয়াছে। ধার করিয়া রাখালকে টাকা দেওয়ার অপরাধ, শ্যামার জমানো টাকাগুলি নষ্ট করার অপরাধ, তাহার কাছে অবশ্যই পুরানো হইয়া গিয়াছে, মনে আছে কিনা তাও সন্দেহ। মাস গেলে আগের টাকার অর্ধেক পরিমাণ টাকা আনিয়া সে শ্যামাকে দেয়, আগে হইলে এই লইয়া কত কাণ্ড করিত, হয় অনুতাপে সারা হইত, না হয় নিজে নিজে কলহ বাধাইয়া শ্যামাকে গাল দিয়া বলিত, যা সে আনিয়া দেয় তাই যেন শ্যামা সোনামুখ করিয়া গ্রহণ করে, ঘরে বসিয়া গেলা যাহার একমাত্র কর্ম অত তাহার টাকার খাঁকতি কেন?—এখন টেরও পাওয়া যায় না কম টাকা আনিয়াছে এটা সে খেয়াল করিয়াছে। শ্যামা যদি নিশ্বাস ফেলিয়া বলে, কি করে যে মাস চালাব,—সে অমনি অমায়িক ভাবে বলিয়া বসে, ওতেই হবে গো, খুব চলে যাবে, বাড়ি ভাড়া দিতে হয় না, ইযে করতে হয় না, কি করব অত টাকা?

কমল ঘোষের টাকাটা মাসে মাসে কিছু কম করিয়া দিলে হয়ত চলে, শীতলকে এ কথা বলিতে শ্যামার বাধে। ঋণ যত শীঘ্র শোধ হইয়া যায় ততই ভাল। এদিকে খরচ চলিতে চাহে না। বিধানকে স্কুলে দেওয়ার পর খরচ

বাড়িয়াছে. বই খাতা, স্কুলের মাহিনা, পোষাক, জলখাবারেব পয়সা এ সব মিলিয়া অনেকগুলি টাকা বাহির হইযা যায়। যেমন তেমন করিয়া ছেলেকে শ্যামা স্কুলে পাঠাইতে পারে না, ছেলের পরিচ্ছদ ও পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে বিষ্ণুপ্রিযা যে তাহাকে সতর্ক কবিযা দিযাছিল নিতান্ত অভাবের সময়েও শ্যামা তাহা অগ্রাহ্য করিতে পাবে না। খবচ সে কমাইযাছে অন্য দিকে। সত্যভামার এতকালেব চাকুরিটি গিযাছে। নিজেব জন্য সেমিজ ও কাপড কেনা শ্যামা বন্ধ করিযাছে, এ সব বেশি পরিমাণে তাহার কোন দিনই ছিল না, চিবকাল জোড়াতালি দিয়া কাজ চালাইযা আসিযাছে, এখন বড অসুবিধা হয। স্বামী-পুত্র ছাডা বাডিতে কেহ থাকে না তাই বক্ষা, নতুবা লজ্জা বাঁচিত না। শীতল আব বিধান বাহিবে যায়, ওদেব জামা কাপড ছাডা শ্যামা আব কিছু ধোপা-বাড়ি পাঠায না, বাডিতে কাচিযা লয। ছেলেমেয়েদেব দুধ সে কমাইতে পাবে নাই কমাইযাছে মাছেব পবিমাণ। মাঝে মাঝে ফল ও মিষ্টি আনাইযা সকলকে খাওযানোব সাধ সে ত্যাগ কবিযাছে। এই ত্যাগটাই সব চেয়ে কষ্টকব। শ্যামাব ছেলেমেয়েবা ভাল জিনিস খাইতে বড ভালবাসে।

তব এই সব অভাব অনটনেব মধ্যেও শ্যামাব দিনগুলি সুখে কাটিযা যায়। ছেলেমেয়েদেব অসুখ বিসুখ নাই। শীতলেব যাহাই হইযা থাক তাহাকে সামলাইযা চলা সহজ। নিজেব শবীবটাও শ্যামাব এত ভাল আছে যে একা সংসাবেব সমস্ত খাটুনি খাটিতে তাহাব কিছুমাত্র কষ্ট হয না কাজ কবিতে যেন ভালই লাগে।

চৈত্র শেষ হইযা আসিল। ছাদে দাঁডাইলে বসাকদেব বাডিব পাশ দিযা বেলেব উঁচু বাঁধটাব ধাবে প্রকাণ্ড শিমুল গাছটা হইতে তুলা উডিযা যাইতে দেখা যায। পবে খানিকটা ফাঁকা মাঠেব পবে টিনেব বেডাব ওপাশে ধান-কলেব প্রকাণ্ড পাকা অঙ্গন কলি মেয়েবা প্রত্যহ ধান মেলিযা শুকাইতে দেয, ধান খাইতে ঝাঁক বাঁধিযা পাযরা নামিযা আসে। পাযবাব ঝাঁকেব ওড়া দেখিতে শ্যামা বড় ভালবাসে, অতগুলি পাখি আকাশে বাববাব দিক পবিবর্তন কবে এক সঙ্গে, সকাল ও বিকাল হইলে উডিবাব সময একসঙ্গে সবগুলি পায়রার পাখার নিচে রোদ লাগিয়া ঝক্‌ঝক্‌ করিয়া ওঠে, শ্যামা অবাক হইয়া ভাবে, কখন কোন দিকে বাঁকিতে হইবে সবগুলি পাখি একসঙ্গে টের পায় কি

কবিযা? ধানকলেব এক কোণায ছোট একটি পুকুব ইঞ্জিন ঘবেব ওদিকে আবও একটা বড পুকুব আছে বযলাবেব ছাই ফেলিযা ছোট পুকুবটিব একটি তীবকে ওবা ধীবে ধীবে পুকুবেব মধ্যে ঠেলিযা আনিযাছে পুকুবটা বুজাইযা ফেলিবে বোধ হয। ছাই ফেলিবাব সময বাতাসে বাশি বাশি ছাই সাদা মেঘেব মত টিনেব প্রাচীব ডিঙ্গাইযা বেলেব বাঁধ পাব হইযা কোথায চলিযা যায। আজকাল এসব শ্যামা যেমন ভাবে চাহিযা দেখে কতকাল তেমনি ভাবে সে তা দেখে নাই। বিকালে ছাদে গিযা সে মণিকে ছাডিযা দেয মণি বকুলেব সঙ্গে ছাদময ছুটাছুটি কবে। আলিসায ভব দিযা শ্যাম কাছে ও দূবে যেখানে যা কিছু দেখিবাব আছে দেখিতে থাকে বোধ কবে কেমন একটা উদাস উদাস ভাব, একটা অজানা ঔৎসুক্য। পব পব অনেকগুলি গাডি বেললাইন দিযা দুদিকে ছুটিযা যায তিনটা সিগনেলেব পাখা বাববাব ওঠে নামে। ধানকলেব অঙ্গনে কলি মেযেবা ছডানো ধান জডো কবিযা নৈবিদ্যেব মত অনেকগুলি স্তূপ কবে তাবপব হোগলাব টোপা দিযা ঢাকিযা দেয। ছোট পুকুবটিতে ধানকলেব বাবু জাল ফেলান মাছ বেশি পান না এতটুকু পুকুবে মাছ কোথায? জাল ফেলাই সাব। শ্যামাব হাসি পায। ওই বকম গাডিব পুকুবে ও জাল ফেলিলে আব দেখিতে হইত না মাছেব লেজেব ঝাপটায জল খান খান হইযা যাইত। পাবিপার্শ্বিক জগতেব দৃশ্য ও ঘটনা শ্যামা এমনিভাবে খুঁটিযা খুঁটিযা উপভোগ কবে গাডিঘব ধানকল বেললাইন বাস্তাব মানুষ এসব আব কবে তাহাব এত ভালো লাগিযাছিল? অথচ মনে মনে অকাবণ উদ্বেগ দেহে যেন একটা শিথিল ভাববোধ হাইতোলা আলস্য। বিধান আজকাল বিকালেব দিকে শঙ্কবদেব বাডি খেলিতে যায ছেলেকে না দেখিযা তাব কি ভাবনা হইযাছে?

শীতল বলে বুডো বযসে তোমাব যে চেহাবাব খোলতাই হচ্ছে গো বযেস কমছে নাকি দিনকে দিন?

শ্যামা বলে দূব দূব! কি সব বলে ছেলেব সামনে!

শীতলেব নজব পডিযাছে শ্যামাব ছেঁড়া কাপড দেখিযা তাহাব চোখ টাটায শ্যামাব জন্য সে বঙীন কাপড কিনিযা আনে। শ্যামা প্রথমে জিজ্ঞাসা করে ক'টাকা নিলে? টাকা পেলে কোথা?

হ্ব কটা টকা আব পাইনে আমি,—উপরি পেয়েছি কাল। একটি পযসা তো দেও না আমাব খবচ চলে কিসে উপবি না পেলে?

খবচ চলে? শীতল তাহা হইলে আবও উপবি টাকা পায, খুসিমত খবচ কবে তাহাকে যে টাকা আনিযা দেয তাই সব নয? শ্যামা বাগিযা বলে, কি বকম উপবি পাও শুনি?

দশ বিশ টাকা আব কত?

নিশ্চয আবও বেশি মিথ্যে বলছ বাবু তুমি নিজে নিজে খবচ কর তো সব ˆ আমাব এদিকে খবচ চলে না ছেঁড়া কাপড় পবে আমি দিন কাটাই।

তাবে ম ক্কিল তাই তো কাপড় কিনে আনলাম। আচ্ছা তো নেমক-হাবাম তুমি।

শ্যামা বঙীন কাপডখানা নাডাচাডা কবে মিষ্টি কবিবা বলে, কি ট ন টানি চলছে বোঝ না তো কিছু বি বাদে যে মাস চাল ই ভাবনায বাতে ঘ ম হয না দু চাবটে টাকা যদি পাও কেন নষ্ট কব? —এনে দিলে সংসাব হয। তোমাব খবচ কি? বাজে খবচ কবে নষ্ট কব দৈত নয যা স্বভাব ে মাব জানি তো। হাতে টাকা এলে আঙ্গুলেব যাঁক দিযে গলে যায। এবাব থেকে আমায এনে দিও তোমাব যা দবকাব হবে চেয়ে নিও—আব কটা মাস মোটে ধাবটা শোধ হযে গেলে তখন কি আব টানাটানি থাকবে না তুমি দশ বিশ টাকা বাজে খবচ কবলে এসে যাবে?

শ্যামা বলে শীতল শোনে। শ্যামাকে বোধ হয সে তাব এতজনেব সঙ্গে মিলইযা দেখে যে এমনি মিষ্টি মিষ্টি কথা বলিযা বুঝাইযা টাকা আ া কবিত বলিত আমাব দু খানা গযনা গডিযে দে টাকাটা তা'হলে অ টকা থাকবে নইলে তুই তো সব খবচ কবে ফেলবি। দবকাবেব সময তুই তোব গযনা বেচে নিস আমি যদি একটি কথা কই

সে এসব বলিত মন্দব মাখে। শ্যামা কি ?

তাবপব শ্যামা বলে এ কাপড তো পবতে পাবব না আমি ছেলেব সামনে ও অবাক হযে তাকিযে থাকবে আমাব লজ্জা কববে বাবু।

না পবতে পাব ওই নর্দমা বযেছে ওখানে ফেলে দাও।—শীতল বলে।

রাত্রে ছেলেমেয়েরা সব ঘুমাইযা পড়িলে শ্যামা আস্তে আস্তে শীতলকে

ডাকে বলে হ্যাঁগা ঘুমুলে নাকি? ফুটফুটে জ্যোছনা উঠেছে দিব্যি, ছাতে যাবে একবারটি?

শীতল বলে আবার ছাতে কি জন্যে?—কিন্তু সে বিছানা ছাড়িয়া ওঠে।

শ্যামা বলে গিয়ে একটা বিড়ি ধরাও আমি আসছি।

রঙীন কাপড়খানা পরিয়া শ্যামা ছাদে যায়। বড় লজ্জা করে শ্যামার শীতলকে নয় বিধানকে। ঘুম ভাঙ্গিয়া রাত দুপুরে তার পরণে রঙীন কাপড় দেখিলে ও যা ছেলে ওর কি আর বুঝিতে বাকি থাকিবে শীতলের মন ভুলানোর জন্যে সে সাজগোজ করিয়াছে? অথচ শীতল সখ করিয়া কাপড় খানা আনিয়া দিয়াছে একবার না পরিলেই বা চলিবে কেন?

শ্যামা মাদুর লইয়া যায় মাদুর পাতিয়া দুজনে বসে ঃ চাঁদের আলোয় বসিয়া দুজনে দুটো একটা সংসারিক কথা বলে বেশি সময় থাকে চুপ করিয়া। বলার কি আর কথা আছে ছাই এ বয়সে! হ্যাঁ শীতল শ্যামাকে একটু আদর করে শীতলের স্পর্শ আর তেমন আলখেম নয় এখনো যেন স্ত্রীলোকের সঙ্গ পায় নাই এমনি আনাড়ির মত আদর করে। শ্যামা দোষ দিবে কাকে সেও তো কম মোটা হয় নাই!

তারপর একদিন শ্যামা সলজ্জ ভাবে বলে কি কাণ্ড হয়েছে জান?

শীতল শুনিয়া বলে বটে নাকি!

শ্যামা বলে হ্যাঁ গো চোখ নেই তোমার? কি হবে বলত এবার ছেলে না মেয়ে?

মেয়ে।

উঁহুঁ ছেলে। খুকু বেঁচে থাক আমার আর মেয়েতে কাজ নেই বাবা।

বলিয়া শ্যামা হাসে। মধুর পরিপূর্ণ হাসি দেখিয়া কে বলিবে শীতলের মত অপদার্থ মানুষ তাহার মুখে এ হাসি যোগাইয়াছে।

চার

মাঝখানে একটা শীত চলিয়া গেল. পরের শীতের গোড়ার দিকে, শ্যামার নূতন ছেলেটির বয়স যখন প্রায় আট মাস, হঠাৎ একদিন সকালবেলা মামা আসিয়া হাজির।

শ্যামার সেই পলাতক মামা তারাশঙ্কর।

ছোট খাট বেঁটে লোকটা, হাত পা মোটা, প্রকাণ্ড চওড়া বুক। এক দিন ভয়ঙ্কর বলবান ছিল, এখন মাংসপেশীগুলি শিথিল হইয়া আসিয়াছে। শেষবার শ্যামা যখন তাহাকে দেখিয়াছিল মাথার চুলে তাহার পাক ধরে নাই, এবার দেখা গেল প্রায় সব চুল পাকিয়া গিয়াছে। সে তো আজকের কথা নয়। শ্যামার বিবাহের কিছুদিন পরে জমিজমা বেচিয়া গ্রামের সব চেয়ে বানেদী ঘরের বিধবা মেয়েটিকে সাথী করিয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছিল,- শ্যামার বিবাহ হইয়াছে আজ একুশ বাইশ বছর। বিবাহের সাত বছর পরে তার সেই প্রথম ছেলেটি হইয়া মারা যায়, তার দু'বছর পরে বিধানের জন্ম। গত আশ্বিনে বিধানের এগার বছর বয়স পূর্ণ হইয়াছে।

মামার বয়স ষাট হইয়াছে বৈকি। কিন্তু যে লোহার মত শরীর তাহার ছিল, এতটা বয়সের ছাপ পড়ে নাই, শুধু চুলগুলি পাকিয়া গিয়াছে, দুটো-একটা দাঁত বোধ হয় পড়িয়া গিয়াছিল মামা সোনা দিয়া বাঁধাইয়া লইয়াছে, কথা বলিবার সময় ঝিকমিক করে। এখনো সে আগের মতই সোজা হইয়া দাঁড়ায়, মেরুদণ্ডটা আজো এতটুকু বাঁকে নাই। চোখ দুটা মনে হয় একটু স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে, তা সে চোখের দোষ অথবা মানসিক শ্রান্তি বুঝা যায় না। শ্যামার বিবাহের সময় মামা ছিল সন্ন্যাসী, গেরুয়া পরিত লম্বা আলখাল্লা ঝুলাইয়া সযত্নে বাবরি আঁচড়াইয়া ক্যাম্বিশের জুতা পায়ে দিয়া যখন গ্রামের পথে বেড়াইতে যাইত, মনে হইত মস্ত সাধু, বড় ভক্তি করিত গ্রামের লোক। এবার মামার পরনে সরু কালপাড় ধুতি, গায়ে পাঞ্জাবী, পায়ে চকচকে জুতো,—একেবারে বাবুর বাবু!

শীতল চিনিতে পারে নাই। শ্যামা প্রণাম করিয়া বলিল, ও মাগো, কোথায় যাবো, এ যে মামা! কোথা থেকে এলে মামা তুমি?

মামা হাসিয়া বলিল, একযাগা থেকে কি আর এসেছি মা যে নাম করব, চরকি বাজির মত ঘুরতে ঘুরতে একবার তোকে দেখতে এলাম, আপনার জন কেউ তো আর নেই, বুড়ো হয়েছি কোন দিন চোখ বুজি তার আগে ভাগ্নিটাকে একবার দেখে যাই এইসব ভাবলাম আর কি,—এরা তোর ছেলেমেয়ে না? ক'টি রে?

শ্যামাকে মামা বড় ভালবাসিত সে তো জানিত মামা কবে কোন্ বিদেশে দেহ রাখিয়াছে, এতকাল পরে মামাকে পাইয়া শ্যামার আনন্দের সীমা রহিল না। কি দিয়া সে যে মামার অভ্যর্থনা করিবে! বাইশ বছর পরে যে আত্মীয় ফিরিয়া আসে তাকে কি বলিতে হয় কি করিতে হয় তার জন্য? মামাকে সে নানারকম খাবার করিয়া দিল বাজার হইতে ভাল মাছ তরকারি আনিয়া রান্না করিল, বেশি দুধ আনাইয়া তৈরি করিল পায়স। মামা বড় ভালবাসিত পায়স। এখনো তেমনি ভালবাসে কিনা কে জানে?

মামার সঙ্গে একটু ভদ্রতা করিয়া শীতল কোথায় পলাইয়াছিল মামা ইতিমধ্যে শ্যামার ছেলেদের সঙ্গে ভাব জমাইয়া ফেলিয়াছে- ভারি মজার লোক এমন আর শ্যামার ছেলেরা দেখে নাই। রাঁধিতে রাঁধিতে শ্যামা হাসিমুখে কাছে আসিয়া দাঁড়ায় বলে আর তোমাকে পালিয়ে যেতে দেব না মামা, এবার থেকে আমার কাছে থাকবে। তোমার জিনিস পত্তর কই?

মামা বলে সে এক হোটেলে রেখে এসেছি কে জানত বাবু, তোরা আছিস এখানে?

শ্যামা বলে ওবেলা গিয়ে তবে জিনিস পত্তর সব নিয়ে এসো - কলকাতা এসেছ কবে?

মামা বলে এই তো এলাম কাল না পরশু, পরশু বিকেলে।

বিধান আজ স্কুলে গেল না। মামা আসিয়াছে বলিয়া শুধু নয়, বাড়িতে আজ নানারকম রান্না হইতেছে মামা কি একাই সব খাইবে? এগারোটা পর্যন্ত কোথায় আড্ডা দিয়া আসিয়া তাড়াহুড়া করিয়া স্নানাহার সারিয়া শীতল প্রেসে চলিয়া গেল, মামার সঙ্গে একদণ্ড বসিয়া কথা বলারও

সময় পাইল না। আজ তাহার এত তাড়াতাড়ি কিসেব সেই জানে, বাড়িতে একটা মানুষ আসিলে শীতল যেন কি রকম কবে, সে যেন চোর পুলিস তাহার খোঁজ করিতে আসিয়াছে।

রাঁধিতে রাঁধিতে শ্যামা কত কি যে ভাবিতে লাগিল। মামার সঙ্গিনীটির কি হইয়াছে? হয়ত মরিয়া গিয়াছে, নয়ত মামার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হইয়াছে অনেকদিন আগেই। ওসব সম্পর্ক আর কতকাল টেঁকে? মরুক, ওসব দিয়া তার কি দরকার? কেলেংকারি ব্যাপার চুকাইযা দিয়া মামা ফিরিয়া আসিয়াছে এই তাব ঢেব। আচ্ছা, এতকাল মামা কি করিতেছিল? টাকা-পয়সা কিছু সঞ্চয় করিয়াছে নাকি? তা যদি করিয়া আসিয়া থাকে তবে মন্দ হয় না। মামার সম্পত্তি হাতছাড়া হইয়া যাওয়ায় শীতলের মনে বড় লাগিয়াছিল, মামা হয়ত এবাব সুদে-আসলে সে পাওনা মিটাইযা দিবে? পুরুষমানুষেব ভাগ্য,—বিদেশে ধুলিমুঠা ধবিযা মামার হয়ত সোনামুঠা হইয়াছে, মামার কাপড়জামা দেখিলেও তাই মনে হয়। মামাব তো আব কেউ নাই, যদি কিছু সঞ্চয় করিযা থাকে শ্যামাই তাহা পাইবে। এই বযসে আব একজন সঙ্গিনী জুটাইযা মামা আর তাহার দেশান্তরী হইতে যাইবে না।

মামাকে সে ঘববাড়ি দেখায। পিছনে খিড়কিব দিকে খানিকটা খালি জাযগা আছে, কযেক হাজার ইঁট কিনিযা শ্যামা সেখানে জমা করিয়া রাখিযাছে, রান্নাঘবেব পাশে সিঁড়িব নিচে, চুন আর সুরকি রাখিয়াছে, আর বছর শ্যামা যে টাকা জমাইযাছিল এসব কিনিতেই তা খরচ হইযা গিযাছিল, এ-বছর কিছু টাকা জমিযাছে, ভগবানেব ইচ্ছা থাকিলে আগামী মাঘে দোতালায শ্যামা একখানা ঘর তুলিবে।

এইটুকু বাড়ি, দুখানা মোটে শোবার ঘর, কেউ এলে কোথায থাকতে দেব ভেবে পাইনে মামা, দোতলার ঘরটা তুলতে পারলে বাঁচি, ও আমার অনেকদিনের সাধ। খোকার বিয়ে দিয়ে ছেলে-বৌকে ও-ঘরে শুতে দেব। পাশ দিতে খোকার আর চার বছর বাকি, পোষ মাসে কেলাসে উঠলে তিন বছর, নারে খোকা?

মামা গম্ভীর হইয়া বলে, বড় বুদ্ধি তোর ছেলের শ্যামা, মস্ত বিদ্বান্

হবে বড় হয়ে। তামাকের ব্যবস্থা বুঝি রাখিস না, এ্যাঁ? খায় না, শীতল খায় না তামাক?

আগে খেত, কিন্তু কে অত দেবে মিনিটে মিনিটে তামাক সেজে? যা ঝি আমাব, বাসন মাজতেই বেলা কাবার—আর আমার তো দেখছই মামা, নিশ্বাস ফেলবার সময় পাইনে সারাদিন—খেটে খেটে হাড় কালি হয়ে গেল। এদিকে বাবু তো কম নন, নিজে তামাক সেজে খাবার মুরোদ নেই, এখন বিড়ি-টিড়ি খায়। মরেও তেমনি খুকুর খুকুর কেসে!

দে তবে আম কে দুটো বিড়ি টিঁডিই আনিযে দে বাবু।

শ্যামা উৎসাহিতা হইয়া বলে, দেব মামা, হুঁকো তামাক টামাক সব আনিযে দেব? এই তো কাছে বাজাব, যাবে আব নিযে আসবে। বাণী একবাব শোন্ দিকি মা।

শ্যামাব ঝি সত্যভামা শ্যামার ছোট ছেলেটার জন্মেব কযেক ঘণ্টা আগে মরিয়া গিয়াছিল, ছেলে যদি শ্যামার না হইত, হইত মেযে, কারো তবে আব বুঝিতে বাকি থাকিত না যে বাড়ির ঝি পেটেব ঝি হইযা আসিযাছে। সত্যভামার মেয়ে বাণী এখন শ্যামাব বাড়িতে কাজ কবে। বাণীব বিবাহ হইযাছে, জামাই ভূষণ থাকে শ্বশুরবাড়িতেই, শীতল তাহাকে কমল প্রেসে একটা চাকরী জুটাইযা দিয়াছে। রাণী বাজাব হইতে তামাক খাওয়ার সরঞ্জাম আনিয়া তামাক সাজিয়া হুঁকায় জল ভবিযা দিল, মামা আরামেব সঙ্গে তামাক টানিতে টানিতে বলিল, তোব ঝিটা তো বড ছেলেমানুষ শ্যামা, কাজকর্ম পারে?

ছাই পারে, আলসের একশেষ, আবার বাবুয়ানির সীমে নেই, ছুঁড়িব চলন দেখছ না মামা? ওর মা আমার কাছে অনেকদিন কাজ করেছিল তাই রাখা, নইলে মাইনে দিয়ে অমন ঝি কে রাখে?

খাওয়া দাওয়া শেষ হইতে দুটা বাজিল। শ্যামা সবে পান সাজিয়া মুখে দিয়াছে, শীতল ফিরিয়া আসিল। শ্যামা অবাক হইয়া বলিল, এত শীগ্‌গির ফিরলে যে?

মামার সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলব, প্রেসে কাজকর্মও নেই—

বেশ করেছ। যেমন করে আফিসে চলে গেলে মামা না জানি কি ভেবেছিল!

শীতল ইতস্তত করে, কি যেন সে বলিবে মনে করিয়াছে। সে একটা পান খায়। শ্যামার মুখের দিকে চাহিয়া মনে মনে কি সব হিসাব করে। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, মামা ক'দিন থাকবেন এখন, না?

শ্যামা বলিল, ক'দিন কেন? বরাবর থাকবেন,—আমরা থাকতে বুড়ো বয়সে হোটেলের ভাত খেয়ে মরবেন কি জন্যে?

আমিও তাই বলছিলাম।—পয়সা কড়ি কিছু করেছেন মনে হয় এ্যাঁ?

মনে তো হয়, এখন আমাদের অদেষ্ট!

মামা একটা ঘুম দিয়া উঠিলে বিকালে তাহারা চারিদিকে ঘেরিয়া বসিয়া গল্প শুনিতে লাগিল, শহর গ্রাম অরণ্য পর্বতের গল্প রাজা-মহারাজা সাধু সন্ন্যাসী চোর ডাকাতের গল্প, রোমাঞ্চকর বিপদ আপদের গল্প। মামা কি কম দেশ ঘুরিয়াছে কম মানুষের সঙ্গে মিশিয়াছে! সুদূর একটা তীর্থের নাম কর, যার নামটি মাত্র শ্যামা ও শীতল শুনিয়াছে, যেমন রামেশ্বর সেতুবন্ধ, নাসিক কাশীনাথ—মামা সঙ্গে সঙ্গে পথের বর্ণনা দেয় তীর্থের বর্ণনা দেয়, সব যেন রূপ ধরিয়া চোখের সামনে ফুটিয়া ওঠে। সেই বিধবা সঙ্গিনীটি কতকাল মামার সঙ্গে ছিল কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারে না, মামার যাযাবর জীবনের ইতিবৃত্ত শুনিয়া কিন্তু মনে হয় চিরকাল সে দেশে দেশে ঘুরিয়াছে একা, সাথী যদি কখনো পাওয়া গিয়া থাকে সে পথের সাথী পুরুষ। শ্যামা একবার সুকৌশলে জিজ্ঞাসা করে গ্রাম হইতে বাহির হইয়া প্রথমে মামা কোথায় গিয়াছিল মামা সোজাসুজি জবাব দেয়, কাশী,—কাশীতে ছিলাম পাঁচ ছ'টা মাস, ভুলে টুলে গিয়েছি সে সব বাপু, সে কি আজকের কথা!

শ্যামা বলে, একা একা ঘুরে বেড়াতে ভাল লাগত মামা?

মামা বলে, একা ঘুরেই তো সুখ রে, ভাবনা নেই চিন্তা নেই, যখন যেখানে খুসি পড়ে থাক যেখানে খুসি চলে যাও, কারো তোয়াক্কা নেই, জুটলো খেলে না জুটলো উপোস করলে—চিরকাল ঘরের কোণে কাটালি সে আনন্দ তোরা কি বুঝবি? একবার কি হল,—নীলগিরি পাহাড়ের গোড়ায় একটা গ্রামে গিয়েছি এক সাধুর সঙ্গে, গ্রামটার নাম বুঝি তুড়িগোড়িয়া,

পাহাড়ের সার চলে গিয়েছে গ্রামের ধার দিয়ে। পাহাড়ে উঠে দেখতে ইচ্ছা হল। গাঁ থেকে উড়িয়া মেয়েরা পাহাড়ের বনে কাঠ কাটতে যায়, তাদের সঙ্গে গেলাম। সে কি জঙ্গল রে শ্যামা, এইটুকু সরু পথ দুপাশে এক পা সরবার যো নেই, যেন গাছপালার দেয়াল গাঁথা। ফিরবার সময় পথে হাতীর পাল পড়ল, আর নামবার যো নেই। চারদিন হাতীর পাল পথ আটকে রইল, চারদিন আমরা নামতে পারলাম না। কি সাহস মেয়েগুলোর বলিহারি যাই, চারদিন টুঁ শব্দটি করলে না, রাত্রে আমাকে বলত ঘুমোতে আর নিজেরা কাঠকাটা দা বাগিয়ে ধরে পাহারা দিয়ে জেগে থাকত। আর একদিন-

সেদিন আর মামার জিনিসপত্র আনা হইল না, পরদিন গিয়া লইয়া আসিল।

শ্যামা ভাবিয়াছিল মামা কত জিনিস না জানি আনিবে, হয়ত আঁটিবেই না ঘরে! মামা কিন্তু আনিল ক্যাম্বিশের একটা ব্যাগ আর কম্বলে জড়ানো একটা বিছানা,—লেপ তোষক নয়, দুটো র‍্যাগ খানতিনেক সুতির চাদর আর এই এতটুকু একটা বালিশ।

শ্যামা অবাক হইয়া বলিল, এই নাকি তোমার সব জিনিস মামা?

মামা একগাল হাসিল, ভবঘুরের কি আর রাশ রাশ জিনিস থাকে মা? ব্যাগটা হাতে করি, বিছানা বগলে নিই, চলো এবার কোথায় যাবে দিল্লী না বোম্বাই।—ব্যাগটা হাতে তুলিয়া বিছানা বগলে করিয়া মামা যাওয়ার অভিনয় করিয়া দেখাইল।

তাই হইবে বোধ হয়। আজ এখানে কাল সেখানে করিয়া যে বেড়ায়, বাক্স প্যাঁটরার হাঙ্গামা থাকিলে তাহার চলিবে কেন? কিন্তু এমন ভবঘুরেই যদি মামা হইয়া থাকে, তবে তো টাকাকড়ি কিছুই সে করিতে পারে নাই? শ্যামা ভাবিতে ভাবিতে কাজ করে। প্রথমে সে যে ভাবিয়াছিল বিদেশে মামা অর্থোপার্জন করিয়াছে, বেড়াইয়া বেড়াইয়াছে শুধু ছুটি-ছাটা সুযোগ-সুবিধা মত, হয়ত তা সত্য নয়। মামার হয়ত কিছুই নাই। দেশে দেশে সম্পদ কুড়াইয়া বেড়ানোর বদলে হয়ত শুধু বাউল সন্ন্যাসীর মত উদ্দেশ্যহীন-ভাবেই সে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। কিন্তু এমন যে দুঃসাহসী, কত রাজা-রাজড়ার সঙ্গে যে খাতির জমাইয়াছে, পার্থিব সম্পদ লাভের সুযোগ কি সে কখনো

পায নাই? পথে ঘাটে লোকে তো হীরাও কুড়াইয়া পায়! বিষ্ণুপ্রিয়ার বাবা পশ্চিমে গিয়াছিলেন কপর্দকহীন অবস্থায়, কোথাকার রাজার সুনজরে পড়িয়া বিশ বছর দেওয়ানী করিলেন, দেশে ফিরিয়া দশ বছর ধরিয়া পেন্সনই পাইলেন বছরে দশ হাজার টাকার। মামার জীবনে ওরকম কিছুই কি ঘটে নাই? কোনো দেশের রাজার ছেলের প্রাণ-টান বাঁচাইয়া লাখ টাকা দামের পান্না মরকত একটা কিছু উপহার?

মামা নিঃস্ব অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে শ্যামার ইহা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। একবার তাহাদের গ্রামে এক সন্ন্যাসী গাছতলায় মরিয়া পড়িয়া ছিল, সন্ন্যাসীর সঙ্গে ছিল পুরু কাঠের ছোট্ট একটি জল চৌকী, তার ভিতরটা ছিল ফাঁপা, পুলিশ নাকি স্ক্রুর মত ঘুরাইয়া ছোট ছোট পায়া চারটি খুলিয়া তক্তার ভিতরে একগাদা নোট পাইয়াছিল। মামার ব্যাগেব মধ্যে, কোমরের থলিতে হয়ত তেমনি কিছু আছে? নোট না হোক, দামী কোন পাথর টাথর?

মামা স্থায়ী ভাবে রহিয়া গেল। ভারি আমুদে মিশুক লোক, কদিনের মধ্যে পাড়ার ছেলে বুড়োর সঙ্গে পর্যন্ত তাহার খাতির জমিয়া গেল, এ-বাড়িতে দাবার আড্ডায় ও-বাড়িতে তাসের আড্ডায় মামার পশারের অন্ত রহিল না। মামার প্রতি এখন শীতলের ভক্তি অসীম, মামার মুখে দেশ বিদেশের কথা শুনিতে তাহার আগ্রহ যেন দিন দিন বাড়িয়া চলে, মামাকে সে চুপ করিতে দেয় না। মামা আসিবার পর হইতে সে কেমন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছে, চোখে কেমন উদাস উদাস চাউনি। শ্যামা একটু ভয় পায়। ভাবে, এবার আবার মাথায় কি গোলমাল হয় দ্যাখো!

ঠিক শীতলের জন্য যে শ্যামার ভাবনা হয় তা নয়, শীতলের সম্বন্ধে ভাবিবার তাহার সময় নাই। তার গুছানো সংসারে শীতল কবে কি বিপর্যয় আনে এই তার আশঙ্কা। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা অদ্ভুত সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছে তাহাদের। সংসার শ্যামার, ছেলেমেয়ে শ্যামার—ওর মধ্যে শীতলের স্থান নাই,—নিজের গৃহে নিজের সংসারের সঙ্গে শীতলের সম্পর্ক শ্যামার মধ্যস্থতায়, গৃহে শীতল শ্যামার আড়ালে পড়িয়া থাকে, স্বাধীনতাবিহীন স্বাতন্ত্র্যবিহীন জড় পদার্থের মত। একদিন শীতল মদ খাইত, শ্যামাকে মারিত.

কিন্তু শীতল ছাড়া শ্যামার তখন কেহ ছিল না। আজ শীতলের মদ খাইতে ভাল লাগে না, শ্যামাকে মারা দূরে থাক ধমক দিতেও তাহার ভয় করে! শ্যামা আজ কত উঁচুতে উঠিয়া গিয়াছে! কোন দিকে কোন বিষয়ে খুঁত নাই শ্যামার, সেবায় যত্নে, বিধি-ব্যবস্থায়, বুদ্ধি-বিবেচনায়, ত্যাগে, কর্তব্য-পালনে সে কলের মত নিখুঁত—শ্যামার সঙ্গে তুলনা করিয়া সব সময় শীতলের যেন নিজেকে ছোটলোক বলিয়া মনে হয়, এবং সে যে অপদার্থ ছিটগ্রস্ত মানুষ এ তো জানে সকলেই, অন্তত শ্যামা যে জানে, শীতলের তাহাতে সন্দেহ নাই। সব সময় শীতলের মনে হয় শ্যামা মনে মনে তাহার সমালোচনা করিতেছে, তাহাকে ছোট ভাবিতেছে, ঘৃণা করিতেছে—কেবল মাস গেলে সে টাকা আনিয়া দেয় বলিয়া মনের ভাব রাখিয়াছে চাপিয়া, বাহিরে প্রকাশ করিতেছে না। বাহিরের জীবনে বিতৃষ্ণা আসিলে শীতলের মন নীড়ের দিকে ফিরিয়াছিল, চাহিয়াছিল শ্যামাকে—কিন্তু সাত বৎসরের বন্ধ্যাজীবন-যাপিনী লাঞ্ছিতা পত্নী যখন জননী হয়, তখন কে কবে তাহাকে ফিরিয়া পাইয়াছে? বৌয়ের বয়স যখন কাঁচা থাকে তখন তাহার সহিত না মিলিলে আর তো মিলন হয় না! মন পাকিবার পর কোন নারীর হয় না নূতন বন্ধু, নূতন প্রেমিক। দুঃখ মুছিয়া লইবার, আনন্দ দিবার, শান্তি আনিবার ভার শ্যামাকে শীতল কোনদিন দেয় নাই, শীতলের মনে দুঃখ নিরানন্দ ও অশান্তি আছে কিনা শ্যামা তাহা বুঝিতেও জানে না। শীতল ছিল রুক্ষ উদ্ধত কঠোর, শ্যামাকে সে কবে জানিতে দিয়াছিল যে তার মধ্যেও এমন কোমল একটা অংশ আছে যেখানে প্রত্যহ প্রেম ও সহানুভূতির প্রলেপ না পড়িলে যন্ত্রণা হয়? শ্যামা জানে, ওসব প্রয়োজন শীতলের নাই, ওসব শীতল বোঝেও না। তাই ছেলেমেয়েদের লইয়া নিজের জন্য যে জীবন শ্যামা রচনা করিয়াছে, তার মধ্যে শীতল আশ্রয়ের মত, জীবিকার উপায়ের মত তুচ্ছ একটা পার্থিব প্রয়োজন মাত্র। আপনার প্রতিভায় সৃজিত সংসারে শ্যামা ডুবিয়া গিয়াছে। শীতল সেখানে ঢুকিবার রাস্তা না খুঁজিলেই সে বাঁচে।

মামা বলে, শীতলের ভাব যেন কেমন কেমন দেখি শ্যামা?

শ্যামা বলে, ওমনি মানুষ মামা—ওমনি গা-ছাড়া গা-ছাড়া ভাব। কি এল কি গেল, কোথায় কি হচ্ছে কিচ্ছু তাকিয়ে দেখে না,—খেয়াল নিয়েই

আছে নিজের। ভগ্নীপতি চাইলে, দিয়ে দিলে তাকে হাজারখানেক টাকা ধার করে—না একবার জিজ্ঞেস করা, না একটা পরামর্শ চাওয়া! তাও মেনে নিলাম মামা, ভাবলাম দিয়ে যখন ফেলেছে আর তো উপায় নেই—যে মানুষ ওর ভগ্নীপতি ও টাকা ফিরে পাওয়ার আশা নিমাই!—কি আর হবে? এই সব ভেবে জমানো যে কটা টাকা ছিল,—কি কষ্টে যে টাকা কটা জমিয়ে-ছিলাম মামা ভাবলে গা এলিয়ে আসে—দিলাম একদিন সবগুলি টাকা হাতে তুলে, বললাম, যাও ধার শুধে এসো, ঋণী হয়ে থেকে কেন ভেবে ভেবে গায়ের রক্ত জল করা? টাকা নিয়ে সেই যে গেল, ফিরে এল সাদ্দিন পরে। ধারের মনে ধার রইল, টাকাগুলো দিয়ে বাবু সাদ্দিন ফূর্তি করে এলেন! সেই থেকে কেমন যেন দমে গেছি মামা কোন দিকে উৎসাহ পাইনে। ভাবি, এই মানুষকে নিয়ে তো সংসার, এত যে করি আমি কি দাম তার, কেন মিথ্যে মর্‌ছি খেটে খেটে,—সুখ কোথা অদেষ্টে?

মামা সান্ত্বনা দিয়া বলে, পুরুষমানুষ অমন একটু আধটু করে শ্যামা—নিজেই আবার সব ঠিক করে আনে। আনছে তো বাবু রোজগার করে, বসে তো নেই!

শ্যামা বলে, আমি আছি বলে, আর কেউ হলে এ সংসার কবে ভেসে যেত মামা।

মামা একদিন কোথা হইতে শ্যামাকে কুড়িটা টাকা আনিয়া দেয়। শ্যামা বলে, একি মামা?

মামা বলে, রাখ না, রাখ—খরচ করিস্। টাকাটা পেলাম, আমি আর কি করব ও দিয়ে?

সত্যই তো, টাকা দিয়া মামা কি করিবে? শ্যামা সুখী হইল। মামা যদি মাঝে মাঝে এরকম দশবিশটা টাকা আনিয়া দেয় তবে মন্দ হয় না। মামাকে শ্যামা ভক্তি করে, কাছে রাখিয়া শেষ বয়সে তাহার সেবাযত্ন করার ইচ্ছাটাও আন্তরিক। তবে, তাহার কিনা টানাটানির সংসার, ইঁটসুরকি কিনিয়া রাখিয়া টাকার অভাবে সে কি না দোতালায় ঘর তোলা আরম্ভ করিতে পারে নাই, মেয়ে কিনা তাহার বড় হইতেছে, টাকার কথাটা সে তাই আগে ভাবে। কি করিবে সে? তার তো জমিদারি নাই। মামা থাক, হাজার

দশ হাজার যদি নাই পাওয়া যায়, মামার জন্য যে বাড়তি খরচ হইবে অন্তত সেটা আসুক, শ্যামা আর কিছু চায় না।

দিন পনের পরে মামা একদিন বর্ধমানে গেল, সেখানে তাহার পরিচিত কোন সাধুর আশ্রম আছে, তার সঙ্গে দেখা করিবে। বলিয়া গেল দিন তিনেক পরে ফিরিয়া আসিবে। শ্যামা ভাবিল, মামা বোধ হয় আর ফিরিয়া আসিবে না, এমনি ভাবে ফাঁকি দিয়া বিদায় লইয়াছে। শীতল ক্ষুণ্ণ হইল সব চেয়ে বেশি। বন্ধনহীন নির্বান্ধব ভ্রাম্যমান লোকটির প্রতি সে প্রবল একটা আকর্ষণ অনুভব করিতেছিল। মামা যখন যায়, শীতল বাড়ি ছিল না। মামা চলিয়া গিয়াছে শুনিয়া সে বারবার বলিতে লাগিল, কেন যেতে দিলে? তোমার ঘটে একফোঁটা বুদ্ধি নেই, মামার স্বভাব জানো ভাল করে, আটকাতে পারলে না? বোকা হাঁদারাম তুমি—মুখ্যুর একশেষ!

কচি খোকা নাকি ধরে রাখব?

ধরে আবার রাখতে হয় নাকি মানুষকে? কি বলেছ কি করেছ তুমিই জান, যা ছোট মন তোমার, আত্মীয়স্বজন দুদিন এসে থাকলে খরচের ভয়ে মাথার তোমার টনক নড়ে যায়,—ছেলেমেয়ে ছাড়া জগতে যেন পোষ্য থাকে না মানুষের।—ছেলে তোমার কি করে দেখো, তোমার কাছেই তো সব শিখছে, তোমার কপালে ঢের দুঃখ আছে।

পাগল হলে নাকি তুমি? কি বকছ?

শীতল যেন কেমন করিয়া শ্যামার দিকে তাকায়। খুব রাগিলে আগে যেমন করিয়া তাকাইত সেরকম নয়।—পাগল আমি হইনি শ্যামা, হয়েছ তুমি। ছেলে ছেলে করে তুমি এমন হয়ে গেছ, তোমার সঙ্গে মানুষে বাস করতে পারে না,—ছেলে না কচু, সব তোমার টাকার খাঁকতি, কি করে বড়লোক হবে দিনরাত শুধু তাই ভাবছ, কারো দিকে তাকাবার তোমার সময় নেই। জন্তুর মত হয়েছ তুমি, তোমার সঙ্গে একদণ্ড কথা কইলে মানুষের ঘেন্না জন্মে যায় এমনি বিশ্রী স্বভাব হয়েছে তোমার, লোকে মরুক বাঁচুক তোমার কি? সময়ে মানুষ টাকা পয়সার কথা ভাবে আবার সময়ে দশজনের দিকে তাকায়, তোমার তা নেই,—আমি বুঝিনে কিছু! টাকার কথা ছাড়া এক মিনিট আমার সঙ্গে অন্য কথা কইতে তোমার গায়ে জ্বর আসে, মন খুলে স্বামীর

সঙ্গে মেশার স্বভাব পর্যন্ত তোমার ঘুচে গেছে, বসে বসে খালি মতলব আঁটছ কি করে টাকা জমাবে, বাড়ি তুলবে, ঘর তুলবে, টাকার গদিতে শুয়ে থাকবে ঃ বাজারের বেশ্যা মাগীগুলো তোমার চেয়ে ভাল, তারা হাসিখুসি জানে ফুর্তি করতে জানে ঃ রক্তমাংসের মানুষ তুমি নও, লোভ করার যন্তর।

বাস্ রে।—শীতল এমন করিয়া বলিতে পারে? সমালোচনা করার পাগলামি এবার তাহার আসিয়াছে নাকি? এসব সে বলিতেছে কি? শ্যামার সঙ্গে মানুষ বাস করিতে পারে না? মানুষের সঙ্গে অনুভূতির আদান-প্রদান সে ভুলিয়া গিয়াছে—একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে?

সে জন্তু যন্ত্র, বেশ্যার চেয়ে অধম? কেন, টাকা পয়সা বাড়িঘর সে নিজের জন্য চায় নাকি! শীতল দেখিতে পায় না নিজে সে কত কষ্ট করিয়া থাকে ভাল কাপড়টি পরে না ভাল জিনিসটি খায় না? শ্যামা শীতলকে এই সব বলে, বুঝাইয়া বলে।

শীতল বলে, ভাল খাবে পরবে কি, মানুষ ভাল খায় ভাল পরে—ভাল মানুষ। তুমি তো টাকা জমানো যন্তর।

ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হয়।—শ্যামা বলে।

শীতল বলে, তাই তো বলছি, টাকা আর ভবিষ্যত হয়েছে তোমার সব, ভবিষ্যত করে করে জন্ম কেটে গেল,—অত ভবিষ্যত কারো সয় না। ভবিষ্যতের ভাবনা মানুষের থাকে, অল্প-বিস্তর থাকে, তোমার ও ছাড়া কিছু নেই ওই তোমার সর্বস্ব—বড় বেখাপ্পা মানুষ তুমি, মহাপাপী।

শোন একবার শীতলের কথা! কিসে মহাপাপী শ্যামা? কোনো দিন চোখ তুলিয়া পরপুরুষের দিকে চাহিয়াছে? অসৎ চিন্তা করিয়াছে? দেব-দ্বিজে ভক্তি রাখে নাই? শ্যামা আহত, উত্তেজিত ও বিস্মিত হইয়া থাকে। শীতল তাহাকে বকে? যার সংসার সে মাথায় করিয়া রাখিয়াছে? যার ছেলে-মেয়ের সেবা করিয়া তাহার হাতে কড়া পড়িয়া গেল, মেরুদণ্ড বাঁকিয়া গেল ভারবহা বাঁকের মত? ধন্য সংসার! ধন্য মানুষের কৃতজ্ঞতা!

মামা কিন্তু ফিরিয়া আসিল,—সাতদিন পরে।

সাতদিন পরে মামা ফিরিয়া আসিল, আরও দিন দশেক পরে শ্যামা

দোতালায় ঘর তোলা আরম্ভ করিল, বলিল, জানো মামা, উনি বলেন আমি নাকি কেপ্পনের একশেষ, নিজে তো ডাইনে-বাঁয়ে টাকা ছড়ান,—আমি মরে বেঁচে কটা রেখেছি বলে না ঘরখানা উঠছে? সংসারে ওনার মন নেই, উড়ু উড়ু কচ্ছেন। আমিও যদি তেমনি হই সব ভেসে যাবে না, ছারখার হয়ে যাবে না সব? টাকা রাখব আমি, ইঁট-সুরকি কিনব আমি, মিস্ত্রি ডাকব আমি,—তারপর ঘর হলে শোবেন কে? উনি তো? আমি তাই জন্তু জানোয়ার,—যন্তর! কথা কইনে সাধে? কইতে ঘেন্না হয়!

মামা বলিল, সেকি মা, কথা বলিসনে কি?

শ্যামা বলিল, বলি, দরকার মত বলি।—পঁয়ত্রিশ বচ্ছর বয়স হল আজে বাজে কথা আর মুখে আসে না,—দোষ বল দোষ, গুণ বল গুণ, যা পারিনে তা পারিই নে।

ঘর তুলিবার হিড়িকে শ্যামা, আমাদের ছেলে-পাগলা শ্যামা, ছেলে-মেয়েদের যেন ভুলিয়া গিয়াছে। কত আর পারে মানুষ? সংসারে উদয়াস্ত খাটিয়া আগেই তাহার অবসর থাকিত না, এখন মিস্ত্রির কাজ দেখিতে হয়, এটা ওটা আনাইয়া দিতে হয়, ঘর তোলার হাঙ্গামা কি কম! শ্যামা পারেও বটে! এক হাতে ছোট ছেলেটাকে বুকের কাছে ধরিয়া রাখে, সে ঝুলিতে ঝুলিতে প্রাণপণে স্তন চোষে, শ্যামা সেই অবস্থাতে চরকির মত ঘুরিয়া বেড়ায়, ভাতের হাঁড়ি নামায়, তরকারি চড়ায়, ছাদে গিয়া মিস্ত্রির দেয়াল গাঁথা দেখিয়া আসে, ভাঙা কড়াইয়ে করিয়া চুন নেওয়ার সময় উঠানে এক খাবলা ফেলিয়া দেওয়ার জন্য কুলিকে বকে, শীতলকে আপিসের ও বিধানকে স্কুলের ভাত দেয়, মাসকাবারি কয়লা আসিলে আড়তদারের বিলে নাম সই করে, খরচের হিসাব লেখে, ছোট খোকার কাঁথা কাচে (রাণী এ কাজটা করে না, তার বয়স অল্প এবং সে একটু সৌখিন) আবার মামার সঙ্গে, প্রতিবেশী নকুড়বাবুর স্ত্রীর সঙ্গে গল্পও করে। চোখের দিকে তাকাও, বাৎসল্য নাই, স্নেহ মমতা নাই, শ্রান্তি নাই,—কিছুই নাই! শ্যামা সত্যই যন্ত্র নাকি?

মামা বলে, খেটে খেটে মরবি নাকি শ্যামা? যা যা তুই যা, মিস্ত্রির কাজ আমি দেখব'খন।

শ্যামা বলে, না মামা, তুমি বুড়ো মানুষ, তোমার কেন এসব ঝঞ্জাট

পোয়াবে? যা সব বজ্জাত মিস্ত্রি, বজ্জাতি করে মালমশলা নষ্ট করবে, তুমি ওদের সঙ্গে পারবে কেন? তাছাড়া, নিজের চোখে না দেখে আমার স্বস্তি নেই কাজ কতদূর এগুলো,—ঘর তোলার সাধ কি আমার আজকের! তুমি ঘরে গিয়ে বোসো মামা,—পিঠে কোথায় ব্যথা বলছিলে না? রাণী বরং একটু তেল মালিশ করে দিক।

শীতল কোন দিকে নজর দেয় না, কেবল সে যে পুরুষ মানুষ এবং বাড়ির কর্তা এটুকু দেখাইবার জন্য বলা নাই কওয়া নাই মাঝে মাঝে কর্তৃত্ব ফলাইতে যায়। গম্ভীর মুখে বলে, এখানে জানালা হবে বুঝি, দেয়ালের যেখানে ফাঁক রাখছ?

মিস্ত্রিরা মুখ টিপিয়া হাসে। শ্যামা বলে, জানালা হবে না ত কি দেয়ালে ফাঁক থাকবে?

তাই বলছি—শীতল বলে,—জানালা হবে কটা? তিনটে মোটে? না না, তিনটে জানালায় আলো বাতাস খেলবে না ভাল.—ওহে মিস্ত্রি এইখানে আরেকটা জানালা ফুটিয়ে দাও,—এদিকে একটাও জানালা করনি দেখছি।

শ্যামা বলে, ওদিকে জানালা হবে না, ওদিকে নকুড়বাবুর বাড়ি দেখছ না? আব বছব ওবাও দোতালায় ঘর তুলবে, আমাদের ঘেঁষে ওদের দেয়াল উঠবে,—জানালা দিয়ে তখন করবে কি? জান না বোঝ না ফোঁপরদালালি কোরো না বাবু তুমি।

শীতল অপমান বোধ করে, কিন্তু যেন অপমান বোধ করে নাই এমনি ভাবে বলে, তা কে জানে ওরা আবাব ঘর তুলবে!—হাঁ হাঁ, ওখানে আস্ত ইঁট দিও না মিস্ত্রি, দেখছ না বসছে না, কতখানি ফাঁক রযে গেল ভেতরে? দুখানা আদ্ধেক ইঁট দাও, দিয়ে মাঝখানে একটা সিকি ইঁট দাও।

মিস্ত্রিরা কথা বলে না, মাঝখানের ফাঁকটাতে কয়েকটা ইঁটের কুচি দিয়া মশলা ঢালিয়া দেয়, শীতল আড়চোখে চাহিয়া দেখে শ্যামা ক্রূর চোখে চাহিয়া আছে। শীতল এদিকে ওদিকে তাকায়, হঠাৎ শ্যামার দিকে চাহিযা একটু হাসে, পরক্ষণে গম্ভীর হইয়া নিচে নামিয়া আসে। দাঁড়াইয়া বিধানের একটু পড়া দেখে,—পড়িবার জন্য ছেলেকে শ্যামা গত বৈশাখ মাসে নূতন টেবিল চেয়ার কিনিয়া দিয়াছে,—পড়া দেখিতে দেখিতে শীতল টের পায়

শ্যামা ঘরে আসিয়াছে। তখন সে বিধানের বইএর পাতায় একস্থানে আঙ্গুল দিয়া বলে ঃ এখানটা ভাল করে বুঝে পড়িস খোকা, পরীক্ষায় মাঝে মাঝে দেয়। তারপর বিধান জিজ্ঞাসা করেঃ Circumlocutory মানে কি বাবা? শীতল বলে, দেখ্ না দেখ্, মানের বই দেখ্। বিধান তখন খিল খিল করিয়া হাসে। শ্যামা বলেঃ পড়ার সময় কেন ওকে বিরক্ত করছ বলত?

শীতল বলে, হাসলি যে খোকা?—শীতলের মুখ মেঘের মত অন্ধকার হইয়া আসে, বাপের সঙ্গে ইয়ার্কি হচ্ছে? হারামজাদা ছেলে কোথাকার! বলিয়া ছেলেকে সে আথালি পাথালি মারিতে আরম্ভ করে। বিধান চেঁচায়, বকুল চেঁচায়, শ্যামা চেঁচায়, বাড়িতে একেবারে হৈ চৈ বাধিয়া যায়। শ্যামা দুই হাতে বিধানকে বুকের মধ্যে আড়াল করে, শীতল গায়ের ঝাল ঝাড়িতেই শ্যামার গায়ে দুচারটা মার বসাইয়া দেয় অথবা সেগুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইযা শ্যামার গায়ে লাগে বুঝিবার উপায় থাকে না। শ্যামা তো আজ গৃহিণী, মোটাসোটা রাজরাণীর মত তাহার চেহারা, শীতল কি এখন তাহাকে ইচ্ছা করিয়া মারিবে?

এমনিভাবে দিন যায়, ঠান্ডায় শীতের দিনগুলি হ্রস্ব হইয়া আসে। মামা সেই যে একবার শ্যামাকে কুড়িটি টাকা দিয়াছিল আজ পর্যন্ত সে আর একটি পয়সাও আনিয়া দেয় নাই, শ্যামা তবু শীতলের চেয়ে মামাকেই খাতির করে বেশি ঃ মামার সঙ্গে শ্যামার বনে, শ্যামার ছেলেদের মামা বড় ভালবাসে, শীতলের চেয়েও বুঝি বেশি। নিজের বাড়িতে শীতল কেমন পরের মত থাকে, যে সব খাপছাড়া তাহার কান্ড, কে তাহার সঙ্গে আত্মীয়তা করিবে? শীতলকে ভালবাসে শুধু বকুল। মেয়েটার মন বড় বিচিত্র, যা কিছু খাপছাড়া যা কিছু অসাধারণ তাই সে ভালবাসে। শীতলও বোধ হয় খোঁড়া কুকুর, লোম-ওঠা ঘা-ওলা বিড়াল, ভাঙা পুতুল এই সবের পর্যায়ে পড়ে, বকুল তাই শ্যামার ভাষায় বাবা বলিতে অজ্ঞান। ছেলেবেলা হইতে বকুলেব স্বাস্থ্যটি বড় ভাল, চলাফেরা হাসি খেলা স্বাভাবিক নিয়মে সবই তার সুন্দর, কত প্রাণ, কত ভঙ্গি। সকলে তাহাকে ভালবাসে, তার সঙ্গে কথা বলিতে সকলেই উৎসুক, সে কিন্তু যাকে তাকে ধরা দেয় না, নির্মমভাবে উপেক্ষা

করিয়া চলে। খেলনা ও খাবার দিয়া, তোষামোদের কথা বলিয়া তাহাকে জয় করা যায় না। মামা কত চেষ্টা করিয়াছে, পারে নাই। শ্যামার তিন ছেলেই মামার ভক্ত, বকুল কিন্তু তাহার ধারে কাছেও ঘে'ষে না। শ্যামার সঙ্গেও বকুলের তেমন ভাব নাই, শ্যামাকে সে স্পষ্টই অবহেলা করে। বাড়িতে সে ভালবাসে শুধু বাবাকে, শীতল যতক্ষণ বাড়ি থাকে পায়ে পায়ে ঘুরিয়া বেড়ায়, শীতলের চুল তোলে, ঘামাচি মারে, মুখে বিড়ি দিয়া দেশলাই ধরাইয়া দেয়, আর অনর্গল কথা বলে। শীতল বাড়ি না থাকিলে ছাদে গিয়া তাহার গোসাঘরে পুতুল খেলে, মিস্ত্রিদের কাজ দেখে, আর শ্যামার ফরমাস খাটে। শীতল না থাকিলে মেয়েটার মুখের কথা যেন ফুরাইয়া যায়।

একদিন শ্যামা নতুন গুড়ের পায়স করিয়াছে, সকলে পরিতোষ করিয়া খাইল, বকুল কিছুতে খাইবে না, কেবলি বলিতে লাগিল, দাঁড়াও, বাবা আসুক, বাবাকে দাও?

শ্যামা বলিল, সে তো আসবে রাত্তিরে, ওই দ্যাখ্ বড় জাম-বাটিতে তার জন্যে তুলে রেখেছি, এসে খাবে। তোরটা তুই খা।

বকুল বলিল, বাবা পায়েস খেতে আসবে দুটোর সময়।

শ্যামা বলিল, কি করে জানলি তুই আসবে?

বকুল বলিল, আমি বললাম যে আসতে?, বাবা বললে দুটোর সময় ঠিক আসবে,—আমি বাবার সঙ্গে খাব।

শ্যামা বলিল, দেখলে মামা মেয়ের আব্দার? বুড়ো ঢে'কি মেয়ে বাবাকে পায়েস খাবার নেমন্তন্ন করেছেন, আপিস থেকে তিনি পায়েস খেতে বাড়ি আসবেন।...খা বকু, খেয়ে বাটি খালি করে দে। তিনি যখন আসবেন খাবেন এখন, তুই বরং আদর করে খাইয়ে দিস, এখন নিজে খেয়ে আমায় বেহাই দে তো।

বকুল কিছুতে খাইবে না, শ্যামারও জিদ চাপিয়া গেল সেও খাওয়াবেই। পিঠে জোরে দুটা চড় মারিয়া কোন ফল হইল না, বকুল একটু কাঁদিল না পর্যন্ত। আরো জোরে মারিলে কি হইত বলা যায় না, কিন্তু যতই হোক শ্যামার তো মায়ের মন, কতবার কত জোরে আর মায়ের মন লইয়া মেয়েকে মারা যায়? এক খাবলা পায়স তুলিয়া শ্যামা মেয়ের মুখে গুঁজিয়া

দিতে গেল, বকুল দাঁত কামড়াইয়া রহিল, তার মুখ শুধু মাখা হইয়া গেল পায়সে।

হার মানিয়া শ্যামা অভিমানাহত কণ্ঠে বলিল, উঃ, কি জিদ মেয়ের! কিছুতে পারলাম না খাওয়াতে?

দুটোর আগে শীতল সত্য সত্যই ফিরিয়া আসিল। শ্যামা আসন পাতিয়া গেলাসে জল ভরিয়া দিল। ভাবিল শীতল খাইতে বসিলে সবিস্তারে বকুলের জিদের গল্প করিবে। কিন্তু ঘরের মধ্যে বাপ-বেটিতে কি পরামর্শই যে দুজনে তাহারা করিল, খানিক পরে মেয়ের হাত ধরিয়া শীতল বাড়ির বাহির হইয়া গেল। যাওযার আগে শ্যামাব সঙ্গে তাহাদের যে কথা হইল তাহা এই।

শ্যামা বলিল, কোথায় যাচ্ছ শুনি?

শীতল বলিল, চুলোয়।

শ্যামা বলিল, পাযেস খেয়ে যাও।

বকুল বলিল, তোমার পায়েস আমরা খাইনে।

শ্যামা বলিল, দেখো, ভাল করছ না কিন্তু তুমি। আদর দিয়ে দিযে মেয়ের তো মাথা খেলে।

এর জবাবে শীতল বা বকুল কেহই কিছু বলিল না। পা দিয়া পাযসের বাটি উঠানে ছুঁড়িয়া দিযা শ্যামা ফেলিল কাঁদিয়া।

রাত প্রায় নটার সময় দুজনে ফিবিয়া আসিল। বকুলের গায়ে নতুন জামা, পরণে নতুন কাপড়, দু-হাত বোঝাই খেলনা, আনন্দে বকুল প্রায পাগল। আজ কিছুক্ষণের জন্য সকলের সঙ্গেই সে ভাব করিল, শ্যামার অপরাধও মনে রাখিল না, মহোৎসাহে সকলকে সে তাহাব সম্পত্তি দেখাইল, বাবার সঙ্গে কোথায কোথায় গিয়াছিল গল গল করিযা বলিয়া গেল।

শীতল উৎসাহ দিয়া বলিল, কি খেয়েছিস বললি না বকু?

পরদিন রাত্রে প্রেস হইতে ফিরিয়া বকুলকে শীতল দেখিতে পাইল না। শ্যামা বলিল, মামার সঙ্গে সে বনগাঁয়ে পিসির কাছে বেড়াইতে গিয়াছে।

আমায় না বলে পাঠালে কেন?

বললে কি আর তুমি যেতে দিতে? যাবার জন্য কাঁদাকাটা করতে লাগল, তাই পাঠিয়ে দিলাম।

হঠাৎ বনগাঁ যাবার জন্য ও কাঁদাকাটা করল কেন?

কাল পরশু ফিরে আসবে।

ঝোঁকের মাথায় কাজটা করিয়া ফেলিয়া শ্যামার বড় ভয় আর অনুতাপ হইতেছিল, সে আবার বলিল, পাঠিয়ে অন্যায় করেছি। আর করব না।

শীতলের কাছে ত্রুটি স্বীকার করিতে আজকাল শ্যামার এমন বাধ' বাধ' ঠেকে! নিজে চারিদিকে সব ব্যবস্থা করিয়া করিয়া স্বভাবটা কেমন বিগড়াইয়া গিয়াছে, কোন বিষয়ে কারো কাছে যেন আর নত হওয়া যায় না। আর বকুলকে এমনভাবে হঠাৎ বনগাঁয়ে পাঠাইয়াও দিয়াছে তো এই কারণে, মেয়ের উপর অধিকার জাহির করিতে। কাজটা যে বাড়াবাড়ি হইয়া গিয়াছে, ওরা রওনা হইয়া যাওয়ার পরেই শ্যামার তাহা খেয়াল হইয়াছে।

শীতল কিন্তু আজ চেঁচামেচি গালাগালি করিল না, করিলে ভাল হইত, ছড়ি দিয়া শ্যামাকে অমন করিয়া হয়ত সে তাহা হইলে মারিত না। মাথায় ছিটওলা মানুষ, যখন যা করে একেবারে চরম করিয়া ছাড়ে। শ্যামাব গায়ে ছড়ির দাগ কাটিয়া কাটিয়া বসিযা গেল।

মারিয়া শীতল বলিল, বজ্জাত মাগী, তোকে আমি কি শাস্তি দিই দেখ্‌। এই গেল এক নম্বর। দু' নম্বর শাস্তি তুই জন্মে ভুলবি না।

শাস্তি? আবার কি শাস্তি শীতল তাহাকে দিবে? তাহার স্বামী?

বিবাহের পরেই শ্যামা টের পাইয়াছিল শীতলের মাথায় ছিট আছে। পাগলের কাণ্ডকারখানা কিছু বুঝিবার উপায় নাই। পরদিন দশটার সময় নিয়মিতভাবে স্নানাহার শেষ করিয়া শীতল আপিসে গেল। বারটা একটার সময় ফিরিয়া আসিল। শ্যামাকে আড়ালে ডাকিয়া তাহার হাতে দিল একতাড়া নোট। শ্যামা গুণিয়া দেখিল, এক হাজার টাকা। এ কেমন শাস্তি? শীতল কি করিয়াছে, কি করিতে চায়?

এ কিসের টাকা?—শ্যামা রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল।

শীতল বলিল, বাবু বোনাস দিয়েছেন। পরশু লাভের হিসাব হ'ল

কিনা, ঢের টাকা লাভ হয়েছে এবছর,—আমার জন্যেই তো সব? তাই আমাকে এটা বোনাস দিয়েছেন।

এত টাকা! হাজার! আনন্দে শ্যামার নাচিতে ইচ্ছা হইতেছিল। সে বলিল, বাবু তো লোক বড় ভাল?—হ্যাঁগা, কাল বড্ড রেগেছিলে না? বড় মেরেছিলে বাবু কাল—পাষাণের মত। ভাগ্যে কেউ টের পায় নি, নইলে কি ভাবত?—আপিস যাবে নাকি আবার?

যাই, কাজ পড়ে আছে। সাবধানে রেখো টাকা।

এই বলিয়া সেই যে শীতল গেল, আর আসিল না। দুদিন পরে মামা বনগাঁ হইতে একা ফিরিয়া আসিল।

বকুল কই মামা?—শ্যামা জিজ্ঞাসা করিল।

মামা বলিল, কেন, শীতলের সঙ্গে আসে নি? শীতল যে তাকে নিয়ে এল?

তখন সমস্ত বুঝিতে পারিয়া শ্যামা কপাল চাপড়াইয়া বলিল, আমার সর্বনাশ হয়েছে মামা।

কে জানিত পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে চারটি সন্তানের জননী শ্যামার জীবনে এমন নাটকীয় ব্যাপার ঘটিবে?

পাঁচ

বকুলকে সঙ্গে করিয়া শীতল চলিয়া গিয়াছে।

ফিরিয়া যদি সে না আসে, এ শাস্তি শ্যামা সত্যই জীবনে কখনো ভুলিবে না।

মামা বলিল, অত ভাবছিস কেন বল দিকি শ্যামা, রাগের মাথায় গেছে, রাগ পড়লে ফিরে আসবে। সংসারী মানুষ চাকরি-বাকরি ছেড়ে যাবে কোথা? আর ও-মেয়ে সামলানো কি তার কম্মো? দু'দিনে হয়রাণ হয়ে ফিরতে পথ পাবে না।

শ্যামা বলিল, কি কাণ্ড সে করে গেছে মামা, সেই জানে। কাল অসময়ে আপিস থেকে ফিরে আমায় হাজার টাকার নোট দিয়ে গেল। বললে, আপিস থেকে বোনাস দিয়েছে। কাল তো বুঝতে পারিনি মামা, হঠাৎ অত টাকা বোনাস দিতে যাবে কেন,—লাভের যা কমিশন পাবার সে তো ও পায়?

শ্যামার কিছু ভাল লাগে না, বুকের মধ্যে কি রকম করিতে থাকে, কিসে যেন চাপিয়া ধরিয়াছে বুকটা। কাজ করিয়া করিয়া এমন অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে অন্যমনে কলের মত তাহা করিয়া ফেলা যায় তাই, না হইলে শ্যামা আজ শুইয়া থাকিত, সংসার হইত অচল। নটার সময় মিস্ত্রিরা কাজ করিতে আসিল, ঘর প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, আর সাত দিনের মধ্যে ঘর ব্যবহার করা চলিবে। বিধান খাইয়া স্কুলে গেল। মামাও সকাল সকাল খাইয়া, দেখি একটু খোঁজ করে, বলিয়া চলিয়া গেল। বাড়িতে রহিল শুধু শ্যামা আর তাহার দুই শিশুপুত্র, মণি ও ছোটখোকা,—যার নাম ফণীন্দ্র রাখা ঠিক হইয়াছে।

দুপুর বেলা প্রেসের একজন কর্মচারীর সঙ্গে শীতলের মনিব কমলবাবু আসিলেন। রাণীকে দিয়া পরিচয় পাঠাইয়া শ্যামার সঙ্গে দরকারি কয়েকটা কথা বলার ইচ্ছা জানাইলেন। তারপর নিজেই হাঁকিয়া শ্যামাকে শুনাইয়া বলিলেন, তিনি বুড়ো মানুষ, শীতলকে ছেলের মত মনে করিতেন, তাঁর সঙ্গে কথা কহিতে শ্যামার কোন লজ্জা নাই। লজ্জা শ্যামা এমনিই করিত না, ঘোমটা টানিয়া সে বাহিরের ঘরে গেল। রাণী সঙ্গে গিয়াছিল, কমলবাবু বলিলেন, তোমার ঝিকে যেতে বল মা।

রাণী চলিয়া গেলে বলিলেন, শীতল ক'দিন বাড়ি আসেনি মা?

শ্যামা বলিল, বুধবার আপিসে গেলেন, তারপর আর ফেরেন নি।

ওইদিন একটার সময় শীতল যে বাড়ি ফিরিয়া তাহাকে টাকা দিয়া গিয়াছিল, শ্যামা সে কথা গোপন করিল।

একবারও আসেনি, দু' এক ঘণ্টার জন্য?

না।

তোমার টাকাকড়ি কিছু দিয়ে যায় নি?

না।

কমলবাবুর গলাটি বড় মিষ্টি, ঘোমটার ভিতর হইতে আড়চোখে চাহিয়া শ্যামা দেখিল মুখের ভাবও তাঁহার শান্ত, নিস্পৃহ। শ্যামা সাহস পাইয়া বলিল, কোন খবর না পেয়ে আমরা বড় ভাবনায় পড়েছি, আপনি যদি কিছু জানেন—

কমলবাবু বলিলেন, না বাছা, আমরা কিছুই জানিনে। জানলে তোমায় শুধোতে আসব কেন?

মনে হয় আর কিছু বুঝি তাহার বলিবার নাই, এইবার বিদায় হইবেন, কিন্তু কমলবাবু লোক বড় পাকা, কলিকাতায় ব্যবসা করিয়া খান। কথা না বলিয়া খানিকক্ষণ শ্যামাকে তিনি দেখেন, মনে যাদের পাপ থাকে এমনিভাবে দেখিলে তারা বড় অস্বস্তি বোধ করে, কাবু হইযা আসে। তারপর তিনি একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অকস্মাৎ ভগবানের নামোচ্চারণ করেন, বলেন, এটি শীতলের ছেলে বুঝি? বেশ ছেলেটি, কি বল বীরেন?—এসো তো বাবা আমার কাছে, এসো।—নাম বলত বাবা? বল ভয় কি?—মণি? সোনামণি তুমি, না?—মণিকে এই সব বলেন আর আড়চোখে কমলবাবু শ্যামার দিকে তাকান। শ্যামা কাবু হইয়া আসে। ভাবে, হাজার টাকার কথাটা স্বীকার করিয়া কমলবাবুর পা জড়াইয়া ধরিবে নাকি?

কমলবাবু বলেন, বাবা কোথায় গেছে মণি? আপিস গেছে? বাবা খালি আপিস যায়, ভারি দুষ্টু তো তোমার বাবা,—কাল বাড়ি আসেনি বাবা? আসেনি? বড় পাজি বাবাটা, এলে মেরে দিও।—বাবা তবে তোমার বাড়ি এসেছিল কবে? আসেনি? একদিনও আসেনি? দিদিকে নিয়ে বাবা পালিয়ে গেছে?—

শ্যামা বলে, মেয়েকে নিয়ে বনগাঁ বোনের বাড়ি যাবেন বলেছিলেন, বোধ হয় তাই গেছেন।

কমলবাবু বনগাঁয়ে রাখালের ঠিকানাটা লিখিয়া লইলেন, মণির সম্বন্ধে আর তাঁহার কোনরূপ মোহ দেখা গেল না। এবার কড়া সুরেই কথা বলিলেন। বলিলেন, স্বামী তোমার লোক ভাল নয় মা, সব জেনে শুনে তুমি ভান করছ কিনা আমরা জানিনে, তোমার স্বামী চোর,—সংসারে মানুষকে বিশ্বাস করে বরাবর ঠকেছি তবু যে কেন তাকে বিশ্বাস করলাম! আমারি

বোকামি, ভাবলাম, মাইনেতে কমিশনে মাসে দুশো আড়াইশ টাকা রোজগার করছে, সে কি আর সামান্য ক'হাজার টাকার জন্যে এমন কাজ করবে, মেশিন কেনার টাকাগুলো তাই দিলাম বিশ্বাস করে, তেমনি শিক্ষা আমায় দিয়েছে, চোরের স্বভাব যাবে কোথা? তোমায় বলে যাই বাছা, এ ইংরেজ রাজত্ব, ক'দিন লুকিয়ে থাকবে? পুলিসে এখনো খবর দিইনি, বোলো তোমার স্বামীকে, কালকের মধ্যে টাকাটা যদি ফিরিয়ে দেয় এবারের মত ক্ষমা করব,—লোভে পড়ে কত ভাল লোক হঠাৎ অমন কাজ করে বসে, তাছাড়া এতকাল কাজ করে প্রেসের উন্নতি করেছে, পুলিসে টুলিসে দেবার আমার ইচ্ছা নেই,—বোলো এই কথা। কালকের দিনটা দেখে পরশু বাধ্য হয়েই পুলিসে খবর দিতে হবে।—কমলবাবু আবার শ্রান্তির একটা নিশ্বাস ফেলিযা সহসা ভগবানের নামোচ্চারণ করেন, বলেন, টাকাটা যদি তোমার কাছে দিয়ে গিয়ে থাকে?—

শ্যামা নীরবে মাথা নাড়ে।

বিকালে মামা বাড়ি ফিরিলে শ্যামা তাহাকে সব কথা খুলিয়া বলিল, বাইশ বছর আগেকার কথা তুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, খুঁজে পেতে এক পাগলের হাতে আমায় সঁপে দিয়েছিলে মামা, সারাটা জীবন আমি জ্বলে পুড়ে মরেছি, কত দুঃখ কষ্ট সয়ে কত চেষ্টায় সুখের সংসার গড়ে তুলে-ছিলাম, এবার তাও সে ভেঙে খান খান করে দিয়ে গেল, যন্ত্রণা দিয়ে দিয়ে মেয়েটাকে তো মারছেই, আমাদেরও উপায় নেই, না খেয়ে মরতে হবে এবাব, ছেলে নিয়ে কি করব আমি এখন, কি করে ওদের মানুষ করব?

বলিল, পালিয়ে পালিয়ে আর বেড়াবে ক'দিন, ধরা পড়বেই। মেয়েটার তখন কি উপায় হবে মামা, সঙ্গে থাকার জন্য ওকেও দেবে না তো জেল টেল?

মামা বলিল, পাগল, ওইটুকু মেয়ের কখনো জেল হয়? শীতলকে যদি পুলিসে ধরেই, বকুলকে তারাই বাড়ি ফিরিয়ে দিয়ে যাবে।

সমস্ত বাড়িতে বিপদের ছায়া পড়িয়াছে, বিধান সব বুঝিতে পারে, মুখখানা তাহার শুকাইয়া বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। মণি কিছু বোঝে না, সেও অজানা ভয়ে স্তব্ধ হইয়া আছে। মিস্ত্রিরা বিদায় হইয়া যাওয়ার পর সকলের কাছে চারিদিক থমথম করিতে লাগিল। ছেলেদের খাইতে দেওয়া হইল না, উনানে আঁচ পড়িল না, সন্ধ্যার সময় একটা লণ্ঠন জ্বালিয়া দিয়া রাণী বাড়ি

চলিয়া গেল। লণ্ঠনের সামনে বিপন্ন পরিবারটি ম্লান মুখে বসিয়া রহিল নীরবে, ছেলেরা ক্ষুধায় কাতর হইলে শ্যামা বাটিতে করিয়া তাহাদের সামনে কতগুলি মুড়ি দিয়া মুখ ঘুরাইয়া বসিল। তাহার সমস্ত সাধ আহ্লাদ আশা আনন্দ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, কত বড় ভবিষ্যতকে সে মনে মনে গড়িয়া রাখিযা-ছিল শ্যামা ভিন্ন কে তাহার খবর রাখে? পাগলের মত উদয়াস্ত সে খাটিযা গিয়াছে, শীতল তো শুধু টাকা আনিয়া দিয়া খালাস, কোনদিন একটি পরামর্শ দেয় নাই, এতটুকু সাহায্য করিতে আসে নাই,—সংসার চালাইয়াছে সে, ছেলেমেয়ে মানুষ করিয়াছে সে, বাড়িতে ঘর তুলিতেছে সে, বিপদে আপদে বুক দিয়া পড়িয়া তাহার বুকের নীড়কে বাঁচাইয়াছে সে। এবার কি হইবে? বিধবা হইলে বুঝিতে পারিত ভগবান মারিয়াছেন, উপায় নাই। বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত অকারণে একি হইয়া গেল? একটু কলহের জন্য মারিয়া সর্বাঙ্গে কালশিরা ফেলিয়াও শীতলের সাধ মিটিল না, সুখের সংসারে আগুন ধরাইয়া দিয়া গেল?

মামা ঘন ঘন তামাক টানে। ঘন ঘন বলে, এমন উন্মাদ সংসারে থাকে? মামা বড় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। শ্যামা ও তাহার ছেলেদের ভারটা এবার মামা'র উপরেই পড়িব বৈকি? হায়, সে সন্ন্যাসী বিবাগী মানুষ, বাইশ বছব সংসারের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক নাই, হতভাগাটা তাহাকে একি দুরবস্থায ফেলিয়া গেল? বুড়া বয়সে এই সবই তাহার অদৃষ্টে ছিল নাকি? মামা এই সব ভাবে, অরণ্যে প্রান্তরে জনপদে তাহার দীর্ঘ যাযাবর জীবনের স্মৃতি মনে আসে, একটা গেরুয়া কাপড় পর, গায়ে একটা গেরুয়া আলখাল্লা চাপাও, 'গলায় ঝুলাইয়া দাও কতগুলি রুদ্রাক্ষ ও স্ফটিকের মালা, তারপর যেখানে খুসি যাও, আতিথ্য মিলিবে, অর্থ মিলিবে, ভক্তি মিলিবে, কত নারী দেহ দিয়া সেবা করিয়া পুণ্য অর্জন করিবে ঃ ধার্মিকের অভাব কিসের? আজ ধনীর অতিথিশালায় শ্বেতপাথরের মেঝেতে খড়ম খটাখট করিয়া হাঁটা, কাল সম্মুখে অফুরন্ত পথ, ভুট্টা ক্ষেতের পাশ দিয়া গ্রামের ভিতর দিয়া, বনের নিবিড় ছায়া ভেদ করিয়া, পাহাড় ডিঙাইয়া মরুভূমির নিশ্চিহ্নতায়; সন্ধ্যায় গভীর ইঁদারার শীতল জল, সদ্য দোয়া ঈষদুষ্ণ দুধ, ঘিয়ে ভিজানো চাপাটি, আর ভীরু সলজ্জা গ্রাম্য কন্যাদের প্রণাম—একজনকে বাছিয়া বেশি কথা বলা

বেশি অনুগ্রহ দেখানো—কে বলিতে পারে? মামা ভাবে, বুড়ো বয়সে দেশে ফিরিবার বাসনা তাহার কেন হইয়াছিল? আসিতে না আসিতে কি বিপদেই জড়াইয়া পড়িল। মুখে কিন্তু মামা অন্য কথা বলে বলে এমন উন্মাদ সংসারে থাকে? আমি এসেছিলাম বলে তো নইলে তুই স্ত্রীপুত্রকে কার কাছে ফেলে যেতি রে হতভাগা? একেবারে কাণ্ডজ্ঞান নেই? স্ত্রীপুত্রকে পরের ঘাড়ে ফেলে আপিসের টাকা চুরি করে মেয়ে নিয়ে তুই পালিয়ে গেলি?

শ্যামাই শেষে বিরক্ত হইয়া বলে এখন আর ও কথা বলে লাভ কি হবে মামা? কি করতে হবে না হবে পরামর্শ করি এসো।

অনেক রকম পরামর্শই তাহারা করে। মামা একবার প্রস্তাব করে যে শ্যামার কাছে কিছু যদি টাকা থাকে, হাজার দুই তিন, ওই টাকাটা কমল-বাবুকে দিয়া এখনকার মত ঠাণ্ডা করা যায়, পরে শীতল ফিরিয়া আসিলে যাহা হয় হইবে। শ্যামা বলে তাহার টাকা নাই, টাকা সে কোথায় পাইবে? তা ছাড়া শীতল যে ফিরিয়া আসিবে তার কি মানে আছে? তখন মামা বলে, বাড়িটা বিক্রি করিয়া কমলবাবুকে টাকাটা দিয়া দিলে কেমন হয়? শীতল তাহা হইলে পুলিসের হাত হইতে বাঁচে। শ্যামা বলে যে শীতল যদি ফাঁসিও যায় বাড়ি সে বিক্রয় করিতে দিবে না। এই কথা বলিয়া তাহার খেয়াল হয় যে ইচ্ছা থাকিলেও বাড়ি সে বিক্রয় করিতে পারিবে না বাড়ি শীতলের নামে। শুনিয়া মামা একেবারে হতাশ হইয়া বলে যে তা হলেই সর্বনাশ, টাকাগুলি খরচ করিয়া শীতল ফিরিয়া আসিয়াই বাড়িটা বিক্রয় করিয়া নিশ্চয় কমল-বাবুর টাকাটা দিয়া বাঁচিবার চেষ্টা করিবে। শ্যামার মুখ শুকাইয়া যায় সে কাঁদিতে থাকে।

পরামর্শ করিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারা যায় না, বেশির ভাগ আরো বেশি বেশি বিপদের সম্ভাবনাগুলি আবিষ্কৃত হইতে থাকে।

শেষে মামা এক সময় বলে শ্যামা সর্বনাশ করেছিস! আপিসের টাকা থেকে শীতল তোকে দিয়ে যায় নি হাজার টাকা?

শ্যামা বলে, একথা জিজ্ঞেস করছ কেন মামা?

মামা বলে, কেন করছি তুই তার কি বুঝবি পুলিসে বাড়ি সার্চ করবে

না? নোট টোট যদি দিয়ে গিয়ে থাকে তা বেরিয়ে পড়বে না? তোকে ধরে তখন যে টানাটানি করবে রে?

শুনিয়া শ্যামার মুখ পাংশু হইয়া যায়, বলে, কি হবে মামা তবে?

এবার মামা সুপরামর্শ দেয়, বলে, দে দে, আমায় এনে দে টাকাগুলো, দেখ দিকি কি সর্বনাশ করেছিলি? ওরে নোটের যে নম্বর থাকে, দেখা মাত্র ধরা পড়বে ও টাকা কমলবাবুর! ছি ছি, তোর একেবারে বুদ্ধি নেই শ্যামা, দে নোটগুলো আমি নিয়ে যাই, কলকাতায় মেসে হোটেলে ক'দিন গা ঢাকা দিয়ে থাকিগে। আস্তে আস্তে পারি তো নোটগুলো বদলে ফেলব, নয়ত দু'এক বছর এখন লুকানো থাক, পরে একটি দুটি করে বার করলেই হবে।

সেই রাত্রেই নোটের তাড়া লইয়া মামা চলিয়া গেল। শ্যামা বলিল, মাঝে মাঝে তুমি এলে কি ক্ষতি হবে মামা, পুলিস তোমায় সন্দেহ করবে?

মামা বলিল, আমায় কেন সন্দেহ করবে?—আসব শ্যামা, মাঝে মাঝে আমি আসব।

রাত্রি প্রভাত হইল, শ্যামার ঘরের ছাদ পিটানোর শব্দে দিনটা মুখর হইয়া রহিল, দুদিন দুরাত্রি গেল পার হইয়া, না আসিল পুলিস, না আসিল মামা, না আসিল শীতল। শ্যামার চোখে জল পুরিয়া আসিতে লাগিল। কত-কাল আগে তাহার বার দিনের ছেলেটি মরিয়া গিয়াছিল, তারপর আর তো কোন দিন সে ভয়ঙ্কর দুঃখ পায় নাই, ছোটখাট দুঃখ দুর্দশা যা আসিয়াছে স্মৃতিতে এতটুকু দাগ পর্যন্ত রাখিয়া যায় নাই, সুখ ও আনন্দের মধ্যে কোথায় মিশাইয়া গিয়াছে। জীবনে তাহার গতি ছিল, কোলাহল ছিল, আজ কি স্তব্ধতার মধ্যে সেই গতি রুদ্ধ হইয়া গেল দেখো। শ্যামা বসিয়া বসিয়া ভাবে। বকুল? কোথায় কি অবস্থায় মেয়েটা কি করিতেছে কে জানে! শীতলের সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, সময়ে হয় তো খাইতে পায় না, নরম বালিশ ছাড়া মেয়ে তাহার মাথায় দিতে পারিত না, কোথায় কি ভাবে পড়িয়া হয়ত এখন সে ঘুমায়, শীতল হয়ত বকে চুপি চুপি অভিমানিনী লুকাইয়া কাঁদে? বিষ্ণুপ্রিয়ার মেয়ের দেখাদেখি বকুলের কত বাবুয়ানি ছিল, ময়লা ফ্রকটি গায়ে দিত না, মুখে সর মাখিত, লাল ফিতা দিয়া তাহার চুল বাঁধিয়া দিতে হইত, আঁচলে এক ফোঁটা অগুরু দিবার জন্য মার পিছনে পিছনে

আব্দার করিয়া ঘুরিত। কে এখন জামায় তাহার সাবান দিয়া দেয়? কে চুলের বিনুনি করে? বকুলের মুখে কত ধুলা না জানি লাগে, আঁচল দিয়া সে শুধু মুখটি মুছিয়া ফেলে, কে দিবে তাহাকে সফেদা, কে দিবে দুধের সর।

দিন তিনেক পরে মামা আসিল। বলিল সার্চ করে গেছে? করে নি? ব্যাপার তবে কিছু বোঝা গেল না শ্যামা, কি মতলব যেন করেছে কমলবাবু, আঁচ করে উঠতে পারছি না।

শ্যামা বলিল টাকাটার কোন ব্যবস্থা করে তুমি এসে থাকতে পার না মামা এখানে? এই পুলিস আসে, এই পুলিস আসে করে ভয়ে ভয়ে থাকি, এসে ওরা কি করবে কি বলবে কে জানে, মারধোর করে যদি জিনিসপত্র যদি নিয়ে চলে যায়?

মামা একগাল হাসিয়া বলিল থাকব বলেই তো টাকার ব্যবস্থা করে এলাম রে।

কোথায় রেখেছ?

তুই চিনবিনে মস্ত জমিদার। নতুন কাপড়ের পুলিন্দে করে সিলমোহর এ'টে জমা দিয়েছি বলেছি গাঁয়ে আমার বাড়ি ঘর আছে না, তার দলিলপত্র, ঘুরে ধুরে বেড়াই হারিয়ে টারিয়ে ফেলব তোমার সিন্দুকে যদি রেখে দাও বাবা? বড় ভক্তি করে আমায় বলে যোগ তপস্যা সব ছেড়ে দিলেন নইলে আপনি তো মহাপুরুষ ছিলেন, দীক্ষা নেব ভেবেছিলাম আপনার কাছে। জানিস মা পিঠের ব্যথাটা আবার চাগিয়েছে, ব্যথায় কাল ঘুম হয় নি।

বাণী একটু মালিশ করে দিক?—শ্যামা বলিল।

দশ বার দিন কাটিয়া গেল। বিষ্ণুপ্রিয়া একদিন শ্যামাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল রাগারাগি করিয়া মেয়ে লইয়া শীতল চলিয়া গিয়াছে এই পর্যন্ত শ্যামা তাহাকে বলিয়াছে টাকা চুরির কথাটা উল্লেখ করে নাই। বিষ্ণুপ্রিয়া সমবেদনা দেখাইয়াছে খুব বলিয়াছে ভেবে ভেবে রোগা হয়ে গেলে যে, ভেবো না, ফিরে আসবে। বাড়িঘর ছেড়ে ক'দিন আর থাকবে পালিয়ে? তারপর ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিয়াছে, সংসার খরচের টাকাকড়ি রেখে

গেছে তো? শ্যামা জবাবে বলিযাছে, কি কুক্ষণে যে দোতালায় ঘর তোলা আবম্ভ কবেছিলাম দিদি, যেখানে যা ছিল কুড়িযে পেতে সব ওতেই ঢেলেছি, কাল কুাল মিস্ত্রির মজুবি দেব কি কবে ভগবান জানেন।—বলিযা সজল চোখে সে নিশ্বাস ফেলিযাছে। তাবপব বিষ্ণুপ্রিযা খানিক্ষণ ভাবিযাছে, ভ্রূ কুঁচকাইযা একটু যেন বিবক্ত এবং রুষ্টও হইযাছে শেষে উঠিযা গিযা হাতেব মুঠায কি যেন আনিযা শ্যামাব আঁচলে বাঁধিযা দিযাছে। কি লজ্জা তখন এ দুটি জননীব ঃ চোখ তুলিয়া কেহ আব কাবো মুখেব দিকে চাহিতে পারে নাই।

বেশি কিছু নয, পঁচিশটা টাকা। বাড়ি গিযা শ্যামা ভাবিযাছে, এ টাকা সে লইল কেমন কবিযা? কেন লইল? এখনি এমন কি অভাব তাহাব হইযাছে? ভবিষ্যতে আব কি তাহাব সাহায্য দবকাব হইবে না যে এখনি মাত্র পঁচিশটা টাকা লইযা বিষ্ণুপ্রিযাকে বিবক্ত কবিযা বাখিল? তাবপব শ্যামাব মনে পড়িযাছে টাকাটা সে নিজে চাহে নাই বিষ্ণুপ্রিযা যাচিযা দিযাছে। নেওযাটা তবে বোধ হয দোষের হয নাই বেশি। বনগাঁযে মন্দাকে শ্যামা এক দিন একখানা চিঠি লিখিল সেই যে বাখাল সাতশ টাকা লইযাছিল তাব জন্য তাগিদ দিযা। সে যে কত বড় বিপদে পড়িযাছে এক পাতায তা লিখিযা আরেকটা পাতা সে ভবিযা দিল টাকা পাঠাইবাব অনুবোধে। সব না পাবুক, কিছু টাকা অন্তত বাখাল যেন ফেবত দেয।—আমি কি যন্ত্রণায আছি বুঝতে পাবছ তো ঠাকুবঝি ভাই? আমাব যখন ছিল তোমাদেব দিইছি এখন তোমবা আমায না দিলে হাত পাতব কাব কাছে? দিন সাতেক পবে মন্দার চিঠি আসিল অশ্রু সজল এত কথা সে চিঠিতে ছিল যে চাপ দিলে বুঝি ফোঁটা ফোঁটা ঝবিযা পড়িত। দাদা কোথায গেল, কেন গেল, শ্যামা কেন আগে লেখে নাই কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন কেন দেয নাই দেশে দেশে খোঁজ কবিতে কেন লোক ছুটায নাই এমন কবিযা চলিযা যাওযাব সময ছোট বোনটিব কথা দাদাব কি একবাবও মনে পড়িল না? যাই হোক, সামনের ববিবার রাখাল কলিকাতা আসিতেছে, দাদাকে খোঁজ কবাব যা যা ব্যবস্থা দরকার সেই করিবে, শ্যামার কোন চিন্তা নাই। টাকার কথা মন্দা কিছু লেখে নাই।

রবিবার সকালে রাখাল ভারি ব্যস্ত সমস্ত অবস্থায আসিয়া পড়িল,

যেন শীতলের পালানোর পর প্রায় একমাস কাটিয়া যায় নাই, যা কিছু ব্যবস্থা সে করিতে আসিয়াছে, এক ঘণ্টার মধ্যে সে সব না করিলেই নয়। বাড়িতে পা দিয়াই বলিল, কি বৃত্তান্ত সব বল তো বৌঠান।

শ্যামা বলিল, বসুন, জিরোন, সব বলছি।

জিরোব ?—জিরোবার কি সময় আছে!

মন্দার কাছে চিঠিতে শ্যামা শীতলের তহবিল তছরুপের বিষয়ে কিছু লেখে নাই, রাখালকে বলিতে হইল। রাখাল বলিল, শীতল বাবু এমন কাজ করবেন, এ যে বিশ্বাস হতে চায় না বৌঠান! রাগ করে চলে যাওয়া,—হ্যাঁ সেটা সম্ভব, মানুষটা রাগী, কিন্তু—

অনেক কথাই হইল, কতক অর্থহীন, কতক অবান্তর, কতক নিছক ব্যক্তিগত সমালোচনা ও মন্তব্য। আসল কথাটা আর ওঠেই না। শ্যামা রাখালের কথা তুলিবার অপেক্ষা করে, রাখাল ভাবে শ্যামাই কথাটা পাড়ুক; সারাটা সকাল তাহারা ঝোপের এদিক ওদিক লাঠি পিটাইল, ঝোপ হইতে বাঘ বাহির হইবে না পেখম-তোলা ময়ূর বাহির হইবে, সকাল বেলা সেটা আর ঠাহর করা গেল না। বাড়িতে অতিথি আসিয়াছে, শ্যামা রাঁধিতে গেল, রাখাল গল্প জুড়িল মামার সঙ্গে। শ্যামা ভাবিল, কি আশ্চর্য পরিবর্তন আসে মানুষের জীবনে? খোলা মাঠে কি ভাবে হিংস্র শ্বাপদ-ভরা জঙ্গল গড়িয়া ওঠে কয়েকটা বছরে? মুখোমুখি বসিয়া আজ রাখালের মন ও তাহার মনের মুখ দেখাদেখি নাই : দুজনের খোলা মনে যে জঙ্গল গিজ গিজ করিতেছে, তারি মধ্যে দুজনে লুকোচুরি খেলিতেছে। না, ঠিক এভাবে শ্যামা ভাবে নাই, অমন কল্পনা তাহার কোথায়? সে সোজাসুজি সাধারণ ভাবেই ভাবিল যে রাখাল কি স্বার্থপর হইয়া উঠিয়াছে! জঙ্গলের রূপকটা তাহার অনুভূতি।

হ্যাঁ, মানুষ বদলায়। বদলায় না বাড়িঘর, বদলায় না জগৎ। এমনি শীতকালে একদিন রাত্রে বারান্দায় শীতলের বাড়ি ফেরার অপেক্ষায় শীতে তাহাকে কাঁপিতে দেখিয়া রাখাল নিজের গায়ের আলোয়ান গায়ে জড়াইয়া দিয়াছিল, হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া বলিয়াছিল, বৌঠান তুমি শোও, আমি দরজা খুলে দেব। শ্যামার সব মনে আছে, সে সব ভুলিবার কথা নয়। রাখাল

তাকে যেন দামি পুতুল মনে করিত, এতটুকু আঘাত লাগিলে সে যেন ভাঙ্গিয়া যাইবে এমনি যত্ন ছিল রাখালের অসুখ হইলে কপালে হাত বুলানোর আর তো কেহ ছিল না তাহার রাখাল ছাড়া।

টাকার কথাটা দুপুরে উঠিয়া পড়িল রাখাল মাথা নিচু করিয়া বলিল জান তো বৌঠান আমার রোজগার? পঁচানব্বই টাকা মাইনে পাই দুটো সংসার ছেলেমেয়ে কোন মাসে খরচ চলে কোন মাসে ধার হয়। একটা বোনের বিয়ে দিয়েছি এখনো একটা বাকি তারও বয়স হল দু-এক বছরের মধ্যে তার বিয়ে না দিলেও চলবে না এখন কি করে তোমার টাকা দিই বৌঠান?—তোমার অবস্থা বুঝি আমার অবস্থা বুঝে দেখো।

সুতরাং তাহাদের কলহ বাধিয়া গেল খানিক পরেই এমন শীতের দিনে জলে হাত ভিজাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া হঠাৎ পরস্পরের গায়ে দিয়া এক দিন যাহারা হাসাহাসি করিত টাকার জন্য তাহাদের কলহ? একি আশ্চর্য কথা যে সেদিনের স্মৃতি তাহারা ভুলিয়া গেল সংসারের বড় বাস্তবতার মধ্যে যে ইতিহাস স্মরণ করা মাত্র দুদিন আগেও যাহারা অবাস্তব স্বপ্ন দেখিতে পারিত? শ্যামা কড়া কড়া অপমানজনক কথা বলিল সেই সাত শত টাকার উল্লেখ করিয়া রাখালকে সে একরকম জুয়াচোর প্রতিপন্ন করিয়া দিল। রাখাল জবাবে বলিল শ্যামা যদি মনে করিয়া থাকে নিজের হকের ধন ছাড়া শীতলের কাছে কোন দিন সে একটি পয়সা নিয়াছে শীতল জেল হইতে ফিরিলে শ্যামা যেন আর একবার তাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখে। শ্যামা বলিল হকের ধন কিসে? রাখাল বলিল শ্যামা তার কি জানিবে? মন্দার বিবাহ দিবার সময় শীতল যে জুয়াচুরি করিয়াছিল রাখাল বলিয়াই সেদিন তাহার জাত বাঁচাইয়াছিল আর কেহ হইলে বিবাহসভা হইতে উঠিয়া যাইত: শীতল অর্ধেক গয়না দেয় নাই পণের টাকা দেয় নাই একটি পয়সা। তারপর সেই গোড়ার দিকে প্রেসের কি সব কিনিবার জন্য ভুলাইয়া সে যে রাখালের পাঁচশত টাকা লইয়া এক পয়সা কোনদিন ফেরত দেয় নাই শ্যামা কি তা জানে? সংসারে কে কেমন লোক জানিতে রাখালের আর বাকি নাই।

এই সব কথার আদান প্রদান করিবার পর দুজনে বড় বিষণ্ণ হইয়া রহিল। রাখাল বিদায় হইল বিকালে।

শ্যামা বলিল, ঠাকুরজামাই! ভাবনায় চিন্তায় মাথা আমার খারাপ হয়ে গেছে, রাগের সময় দুটো মন্দ কথা বলেছি বলে আপনিও আমায় এই বিপদের মধ্যে ফেলে চললেন?

রাখাল বলিল, না না, সে কি কথা বৌঠান, রাগ কেন করব? তুমিও দুটো কথা বলেছ, আমিও দুটো কথা বলেছি, ওইখানেই ত মিটে গেছে— রাগারাগির কি আছে?

শ্যামা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, আপনারাই এখন আমার বল ভরসা, আপনারা না দেখলে কে আমায় দেখবে? ছেলেমেয়ে নিয়ে আমি ভেসে যাব ঠাকুরজামাই।

বড়দিনের ছুটিতে আবার আসব বৌঠান।—রাখাল বলিল।

গতবার বড়দিনের ছুটিতে সে আসিয়াছিল—এবারও আসিবে বলিয়া গেল। রাখাল? সেই রাখাল? একদিন সে ছিল তাহার বন্ধুর চেয়েও বড়?

শীতের হ্রস্ব দিনগুলি শ্যামার কাছে দীর্ঘ হইয়া উঠিয়াছে, দীর্ঘ রাত্রিগুলি হইয়াছে অন্তহীন। শীতলের বিছানা খালি, বকুলের বিছানা খালি। কি ভঙ্গি করিয়া মেয়েটা শুইত ফুলের মত দেখাইত না তাহাকে? গায়ে লেপ থাকিত না, শীতে মেয়েটা কুণ্ডলী পাকাইয়া যাইত, শুইতে আসিয়া রোজ শ্যামা তাহার গায়ে লেপ তুলিয়া দিত। গভীর রাত্রে শূন্য দৃষ্টিতে শূন্য শয্যার দিকে চাহিয়া শ্যামা জাগিয়া থাকে, চোখ দিয়া জল পড়ে। আর তো মেয়ে নাই শ্যামার, ওই একটি মেয়ে ছিল। আর কী সে মেয়ে! শ্যামার এই ছোট বাড়িতে অতটুকু মেয়ের প্রাণ যেন আঁটিত না, ও যেন ছিল আলো ঘরের চারিদিক উজ্জ্বল করিয়া জানালা দিয়া বাহিরে ছড়াইয়া পড়িত। সে অত প্রচুর ছিল বলিয়া শ্যামা বুঝি তাকে তেমন আদর করিত না? বকুল, ও বকুল, কোথায় গেলি তুই বকুল?

একদিন রাত্রে কে যেন পথের দিকের জানালায় টোকা দিতে লাগিল। শ্যামা জানালার খড়খড়ি ফাঁক করিয়া বলিল, কে?

মৃদুস্বরে উত্তর আসিল, আমি শ্যামা আমি, দরজা খোলো।

জানালা খুলিয়া শ্যামা দেখিল, শীতল একা নয়, সঙ্গে বকুল আছে। দরজা খুলিয়া ওদের সে ভিতরে আনিল, বকুলকে আনিল কোলে করিয়া।

বকুলের গায়ে একটা আলোয়ান জড়ানো, এই শীতে কি আলোয়ানে কিছু হয়, শ্যামার কোলে বকুল থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। শ্যামার মনে হইল মেয়ে যেন তাহার হাল্কা হইয়া গিয়াছে। ঘরে আসিয়া আলোতে বকুলের মুখ দেখিয়া শ্যামা শিহরিয়া উঠিল, ঠোঁট ফাটিয়া, গাল ফাটিয়া, মরা চামড়া উঠিয়া কি হইযা গিযাছে বকুলের মুখ? শ্যামা কথা কহিল না, লেপ কাঁথা যা হাতের কাছে পাইল তাই দিয়া জড়াইযা মেয়েকে কোলে কবিযা বসিল, গায়ের গরমে একটু তো গরম পাইবে?

বকুল তো এমন হইয়াছে, শীতল? মাথায মুখে সে কম্ফর্টার জডাইযা আসিয়াছিল, সেটা খুলিয়া ফেলিতে শ্যামা দেখিল তাব চেহারা তেমনি আছে, পুলিসের তাড়ায় পথে বিপথে ঘুরিযা বেড়াইয়াছে বলিয়া মনে হয না। গায়ে তাহার দামি নূতন গরম কোট, চাদরটাও নূতন। না, শীতলেব কিছু হয় নাই। মেয়েটার অদৃষ্টে দুঃখ ছিল, সেই শুধু আধ-মরা হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।

ওর জ্বর হয়েছিল।—শীতল বলিল।

জ্বর? তাই বটে, অসুখ না হইলে মেয়ে কেন এত রোগা হইযা যাইবে? শ্যামা শীতলের মুখের দিকে চাহিল, চোখ দিয়া তাহার জল গড়াইয়া পড়িল, ধরা গলায় বলিল, জন্মে থেকে ওর একদিনেব জন্যে গা গবম হয় নি!

শীতল কি তাহা জানে না? এ তাহাকে অনর্থক লজ্জা দেওয়া। শ্যামা এবার তাহার প্রতিকারহীন অপকীর্তির কথা তুলুক, তাহা হইলেই গৃহে প্রত্যাবর্তন তাহার সফল হয়। পরস্পরের দিকে চাহিয়া তাহারা যেন শত্রুতাব পরিমাপ করিতে লাগিল। শ্যামার কি করিয়াছে শীতল? প্রেসের টাকা যদি সে চুরি করিয়া থাকে, সেজন্য জেলে যাইবে সে ঃ সে স্বাধীন মানুষ নয়? শ্যামার তো সে কোন ক্ষতি করে নাই! বরং বাইশ বছর মাসে মাসে ওকে সে টাকা আনিয়া দিয়াছে। এবার যদি সে ছুটিই নেয, কি বলিবার আছে শ্যামার? এমনি সব কথা ভাবিতে গিযা শীতলের বুঝি চোখ পড়িল ঘুমন্ত ছেলে দুটির দিকে, মণি আর ছোট খোকা, যার নাম ফণীন্দ্র, বকুলের গাযে জড়ানোর জন্য ওদের গা হইতে লেপটা শ্যামা ছিনাইয়া লইয়াছে। ওদের

দেখিয়া শুধু নয়, কবে শীতল ভুলিতে পারিয়াছিল তার চেয়ে পরাধীন কেহ নাই, সৃষ্টিতত্ত্বের সে গোলাম, জেলে যাওয়ার, মরিয়া যাওয়ার অধিকার তাহার নাই? সে পাগল বলিয়াই না এ কথা ভুলিয়া গিয়াছিল? জানালা বন্ধ ঘরে শীতের স্তব্ধ রাত্রি, এই ঘরে দায়ে পড়া স্নেহ মমতার সঙ্গে সুখ-শান্তির বিরাট সমন্বয়টা দিনে আসিলে বোঝা যাইত না। এই ঘরে এমনি শীতের রাত্রে লেপ মুড়ি দিয়া সে কতকাল ঘুমাইয়াছে! তুচ্ছ তুলার তোষকে, তুচ্ছ দৈনন্দিন ঘুম! তেমনি ভাবে আর সে কোন দিন এখানে ঘুমাইতে পারিবে না। তুচ্ছ তুলার তোষকে তুচ্ছ দৈনন্দিন ঘুম আজ কত দুর্লভ!

ধীরে ধীরে তাহারা কথা বলিতে লাগিল, দুজনের মাঝে যেন দুস্তর ব্যবধান একজন কথা বলিলে এতটা দূরত্ব অতিক্রম করিয়া আরেকজনের কাছে পৌঁছিতে যেন সময় লাগে।

শ্যামা বলিল, টাকা কি সব খরচ করে ফেলেছ?

শীতল বলিল, না, দুচার শ বোধ হয় গেছে মোটে।

শ্যামা বলিল তাহলে কালকেই তুমি যাও কমলবাবুর হাতে পায়ে ধরে পড় গিয়ে টাকা ফিরে পেলে তিনি বোধ হয় আর গোলমাল করবেন না।

শীতল বলিল যদি করেন গোলমাল? তা'হলে টাকাও যাবে, জেলও খাটব। তার চেয়ে আমার পালানোই ভাল। তোমায় যে টাকা দিয়ে গেছি তাইতেই এখন চলবে আমি পশ্চিমে চলে যাই সেখানে দোকান টোকান দিয়ে যা করে হোক রোজগারের একটা পথ করে নিতে পারব মাঝে মাঝে দেশে এসে এমনি রাত দুপুরে তোমার সঙ্গে দেখা করে টাকা পয়সা দিয়ে যাব। তারপর দু'চার বছর কেটে গেলে বাড়িটা বিক্রি করে তোমরা এদিক ওদিক কিছু দিন ঘুরে ফিরে আমি যেখানে থাকব সেইখানে চলে যাবে। ছ' হাজার টাকার তো মামলা, কে আর অতদিন মনে করে রাখবে কমলবাবুও ভুলে যাবে, পুলিসেও খোঁজখোঁজ আর নেবে না।

শ্যামা বলিল বাড়ি বিক্রি করব কি করে? বাড়ি তো তোমার নামে।

এতক্ষণে শীতল একটু হাসিল, বলিল, সে আমি তোমায় করে দান করে দিয়েছি, খুকি হবার সময় আমার একবার অসুখ হয়েছিল না?--

সেইবার। আমার বাড়ি হলে কমলবাবু এতক্ষণ বাড়ি বিক্রি করে টাকা আদায় করে নিত।

শ্যামার মনে হয় শীতলকে সে চিনিতে পারে নাই। মাথায় একটু ছিট আছে, ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ যা তা করিয়া বসে, কিন্তু বুকখানা স্নেহ মমতায় ভরপুর।

ঘণ্টা দুই পরে সাব ইনসপেক্টর রজনী ধর আসিলেন। ভারি অমায়িক লোক। হাসিয়া বলিলেন, না মশাই না, দেশে দেশে আপনাকে আমরা খুঁজে বেড়াইনি, যত বোকা ভাবেন আমাদের অত বোকা আমরা নই, বি-এ এম-এটা আমরাও তো পাশ করি? আপনার বাড়িটাতে শুধু একটু নজর রেখেছিলাম —আমি নই, আমি মশায় থানায় ঘুমোচ্ছিলাম—অন্য লোক। আপনি একদিন আসবেন তা জানতাম,—সবাই আসে, স্ত্রী পরিবারের মায়া বড় মায়া মশায়। টাকাগুলো আছে নাকি পকেটে? দেখি একবার হাতড়ে। না থাকে তো নেই, টাকার চেয়ে আপনাকেই আমাদের দরকার বেশি আপনাকে পাওয়া আর দু'শোটি টাকা পাওয়া সমান কিনা। জানেন না বুঝি? আপনার জন্যে কমলবাবু যে দু'শো টাকা পুরস্কার জমা দিয়েছেন।—নইলে এই শীতের রাত্রে বিছানা ছেড়ে উঠে এসেও আপনার সঙ্গে এমন মিষ্টি মিষ্টি কথা কই?

শ্যামার কান্না, ছেলেমেয়ের কান্না, সর্বসমেত পাঁচটি প্রাণীর কান্নার মধ্যে শীতলকে লইয়া সাব ইনসপেক্টর চলিয়া গেল।

মামা বলিল, কাঁদিসনে শ্যামা, কাল জামিনে খালাস করে আনব। তারপর চুপি চুপি বলিল, কি মুখ্যু দেখলি? টাকাগুলো পকেটে করে নিয়ে এসেছে! নিজেও গেলি টাকাও গেল,—গেল ত?

শীতলের জেল হইয়াছে দু'বছর।

শ্যামা একজন ভাল উকিল দিয়াছিল। শীতলের এই প্রথম অপরাধ। টাকাও কমলবাবু প্রায় সব ফিরিয়া পাইয়াছিলেন- শ্যামা যে হাজার টাকা লুকাইয়া ফেলিয়াছিল আর শীতল যে শ'তিনেক খরচ করিয়াছিল, সেটা ছাড়া। জেল শীতলের ছ'মাস হইতে পারিত, এক বছর হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু শীতলের কিনা মাথায় ছিট আছে বিচারের সময় হাকিমকে সে যেন একদিন কি সব বলিয়াছিল—যেসব কথা মানুষকে খুসি করে না। তাই শীতলকে হাকিম কারাবাস দিয়াছিলেন আঠার মাস আর জরিমানা করিয়াছিলেন দু'হাজার টাকা, অনাদায়ে আরও দশ মাস কারাবাস। জরিমানা দিলে কমলবাবু অর্ধেক পাইতেন অর্ধেক যাইত সরকারী তহবিলে। এই জরিমানার ব্যাপারটা শ্যামাকে ক'দিন বড় ভাবনায় ফেলিয়াছিল। মামা না থাকিলে সে কি করিত বলা যায় না বকুলকে শীতল যেদিন গভীর রাত্রে ফিরাইয়া দিতে আসিয়াছিল সেদিন দু'টি ঘণ্টা সময়ের মধ্যে তাদের যেন একটা অভূতপূর্ব ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া গিয়াছিল, দুই যুগ একত্র বাস করিয়াও তাহাদের যাহা আসে নাই ঃ স্বামীর জন্য সে রাত্রে বড় মমতা হইয়াছিল শ্যামার। কিন্তু মামা তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল জরিমানার টাকা দেওয়াটা বড় বোকামির কাজ হইবে বিশেষত বাড়ি বাঁধা না দিয়া যখন পুরো টাকাটা যোগাড় হইবে না—টাকা কই শ্যামার? হাজার টাকার নম্বর দেওয়া নোটগুলি তো এখন বাহির করা চলিবে না। বাহির করা চলিলেও আরেক হাজার টাকা? কাজ নাই ওসব দুর্বুদ্ধি করিয়া। আঠার মাস যাকে কয়েদ খাটিতে হইবে সে আর দশ মাস বেশি কাটাইতে পারিবে না জেলে? দশ মাসই বা কেন? বছরে ক'মাস জেল যে মকুব হয়। তারপর শেষের চার ছ'মাস জেলে থাকিতে কয়েদীর কি আর কষ্ট হয়? তখন নামে মাত্র কয়েদী, সকালে বিকালে একবার নাম ডাকে, বাস, তারপর কয়েদীর যেখানে খুসি যায় যা খুসি করে,—রাজার হালে থাকে।

বাড়িতেও তো আসতে পারে, তবে এক আধ ঘণ্টাব জন্যে?

না তা পাবে না,—জেলেব বাইবে যেতে আসতে দেয, দ্দণ্ড দাঁড়িয়ে এব ওব সঙ্গে কথা বলতে দেয, তাই বলে নজব কি বাখে না একেবাবে? তাছাডা কযেদীব পোষাক পবে কোথায যাবে?—কেউ ধবে এনে দিলে তো শেষ পর্যন্ত দাঁড়াবে পালিযে যাচ্ছিল'—আবাব দেবে ছ'মাস ঠুকে' জেলেব কাণ্ডকাবখানাব কথা আব বলিসনে শ্যামা মজাব জাযগা জেল—শীতল যত কষ্ট পাবে ভাবছিস তা সে পাবে না ওই প্রথম দিকে একটু যা মনেব কষ্ট।

উৎসাহেব সঙ্গে গড়গড কবিযা মামা বলিযা যায অবাধ অকুণ্ঠ' কত অভিজ্ঞতাই জীবনে মামা সংগ্রহ কবিযাছে'

শ্যামা সজল চোখে বলিযাছিল এত খববও তুমি জান মামা' তুমি না থাকলে কি যে কবতাম আমি—ভেবে ভেবে পাগল হযে যেতাম।—বছবে ক'মাস কযেদ মকুব কবে মামা? ভাল হযে থাকলে বোধ হয শীগগিব ছেড়ে দেয একদিন গিযে দেখা কবে বলে আসব ভাল হযেই যেন থাকে।

পাডায ব্যাপাবটা জানাজানি হইযা গিযাছে। পাডাব যেসব বাডিব মেযেদেব সঙ্গে শ্যামাব জানাশোনা ছিল শ্যামাব সঙ্গে তাহাদেব ব্যবহাবও গিযাছে সঙ্গে সঙ্গে বদলাইযা। কেহ সহান্ভূতি দেখায নীববে ও সববে: কেহ কোন বকম অন্ভূতিই দেখায না বিস্ময সমবেদনা অবহেলা কিছ্ই নয। পাড়াব নকুড়বাব্ব পবিবাবেব সঙ্গে শ্যামাব ঘনিষ্ঠতা ছিল বেশি এখন ওদেব বাড়ি গেলে ওবা বসিতে বলিতে ভুলিযা যায সংসাবেব কাজেব চেযে শ্যামাব দিকে নজব একটু বেশি দিতে মনে থাকে না কথা বলিতে বলিতে ওদেব কেমন উদাস বৈবাগ্য আসে কত যেন শ্রান্ত ওবা চোযাল ভাঙিযা এখ্নি হাই উঠিবে। শ্যামাব বাডিতে যাবা বেডাইতে আসিত তাদেব মধ্যে তাবাই শ্ধ্ আসা যাওযা সমানভাবে বজায বাখিযাছে এমন কি বাডাইযাও দিযাছে যাবা আসিলে শ্যামাব সম্মান নাই না আসিলে নাই অপমান।

বিধান এতকাল শঙ্কবেব সঙ্গে বাড়িব গাডিতে স্কুলে গিযাছে, একদিন দশটাব সময বই-খাতা লইযা বাহিব হইযা গিযা খানিক পবে সে আবাব ফিবিযা আসিল। শ্যামা জিজ্ঞাসা কবিল স্কুলে গেলি নে?

শঙ্কবকে নিযে গাড়ি চলে গেছে মা।

তোকে না নিয়েই চলে গেল? কেন রে খোকা, দেরি করে তো যাস নি তুই?

পরদিন আরও সকাল সকাল বিধান বাহির হইয়া গেল, আজও সে ফিরিয়া আসিল খানিক পরেই, মুখখানা শুকনো করিয়া। শ্যামা তখন বকুলকে ভাত দিতেছিল। সে বলিল, আজকেও গাড়ি চলে গেছে নাকি খোকা?

বিধান বলিল, ড্রাইভার আমাকে গাড়িতে উঠতে দিলে না মা, বললে, মাসিমা বারণ করে দিয়েছে—

এমন টনটনে অপমান জ্ঞান বিধানের, থামের আড়ালে সে লুকাইয়া দাড়াইয়া থাকে সে যেন অপরাধ করিয়া কার কাছে মার খাইয়া আসিয়াছে। শ্যামা বকুলকে ভাত দিয়া রান্নাঘরে পলাইয়া যায় অতবড় ছেলে তাহার অপমানিত হইয়া ঘা খাইয়া আসিল, ওকে সে মুখ দেখাইবে কি করিবা?

দুপুরবেলা শ্যামা বিষ্ণুপ্রিয়ার বাড়িতে গেল। দোতলায় বিষ্ণুপ্রিয়ার নিভৃত শয়নকক্ষ, সিঁড়ি দিয়া শ্যামা উপরে উঠিতে যাইতেছিল, রান্নাঘরের দাওয়া হইতে বিষ্ণুপ্রিয়ার ঝি বলিল, কোথা যাচ্ছ মা হনহন করে?—যেও নি, গিন্নিমা ঘুমুচ্ছে,—এমনি ধারা সময় কারো বাড়ি কি আসতে আছে, যাও মা এখন, বিকেলে এসো।

শ্যামা বলিল দিদির হাসি শুনলাম যে ঝি, জেগেই আছেন।

ঝি বলিল, হাসি শুনবে নি তো কি কান্না শুনবে মা? ওপরে এখন যেতে মানা যেও না।

শ্যামা অগত্যা বাড়ি ফিরিয়া গেল। ভাবিল, পাঁচটার সময় আর একবার আসিয়া বলিয়া দেখিবে, উপায় কি বিধানের তো স্কুলে না গেলে চলিবে না? বাড়ি ফিরিতেই বিধান বলিল কোথা গিয়েছিলে মা?

ওই ওদের বাড়ি।

কাদের বাড়ি বিধান জিজ্ঞাসা করিল না। ছেলেবেলা হইতে শ্যামা এই ছেলেটিকে অদ্ভুত বলিয়া জানে রহস্যময় বলিয়া জানে, ছ'বছর বয়সে এই ছেলে তাহার উদাস নয়নে দুর্বোধ্য স্বপ্ন দেখিত ডাকিলে সাড়া মিলিত না, কথা কহিয়া খেলা দিয়া না যাইত হাসানো, না চলিত ভোলানো। আর

নিষ্ঠুর? সময় সময় শ্যামার মনে হইত ছেলে যেন পাষাণ,—রক্তমাংসে তৈরি বুক ওর নাই। তারপর ওর প্রকৃতির কত বিচিত্র দিক স্পষ্ট হইয়া উঠিয়া আবার ওর মধ্যেই কোথায় লুকাইয়া গিয়াছে,—একটির পর একটি দুর্বোধ্যতা, রাশি রাশি মুখোস পরিয়া সে যেন জন্মিয়াছিল একে একে খুলিয়া চলিযাছে, ওর আসল পরিচয় আজো শ্যামা চিনিল না। কত সময় সে ভয় পাইয়া ভাবিয়াছে, বাপের পাগলামিই কি ছেলের মধ্যে প্রবলতর হইয়া দেখা দিতেছে, ওকি একদিন পাগল হইয়া যাইবে? অত কি ভাবে ও, সময় সময় জননীর উন্মাদ ভালবাসাকে কেমন করিয়া দুপায়ে মাড়াইযা চলে অতটুকু ছেলে! বিধানকে মনে মনে শ্যামা ভয় করে। বিষ্ণুপ্রিয়ার বাড়ি যাওয়ার কথা ওকে সে বলিতে পারিল না।

বিধান বলিল, ওদের গাড়িতে আমি আর স্কুলে যাব না মা, কখখনো কোনদিন যাব না।

ওরা যদি আদর করে ডাকতে আসে?

ডাকতে এলে মেরে তাড়িয়ে দেব।

শুনিযা শ্যামারও মনে হইল এই তো ঠিক, অত অপমান তাহারা সহিবে কেন? যাদের মোটর নাই ছেলে কি তাদের স্কুলে যায় না? সহসা উদ্ধত আত্মসম্মান জ্ঞানে শ্যামার হৃদয় ভরিয়া গেল। না, শঙ্করের সঙ্গে গাড়িতে তাহার ছেলেকে স্কুলে যাইতে দেওযার জন্য বিষ্ণুপ্রিয়ার তোষামোদ সে করিবে না।

পরদিন মামার সঙ্গে ছেলেকে সে স্কুলে পাঠাইয়া দিল। বলিল, এ মাসের ক'টা দিন মোটে বাকি আছে, এ'কটা দিন ট্রামে নগদ টিকিট কিনে ওকে স্কুলে দিয়ে এসো নিয়ে এসো মামা, এ'কদিন তোমার সঙ্গে এলে গেলে তারপর ও নিজেই যাতাযাত করতে পারবে, মাস কাবারে কিনে দেব একটা মাসিক টিকিট।

বিধান অবজ্ঞার সুরে বলিল, যা তুমি খালি ভাব!- আমার চেয়ে কত ছোট ছেলে একলা ট্রামে চেপে স্কুলে যায়। আমি যেখানে খুসি যেতে পারি মা,—যাইনি ভাবছ? ট্রামে করে কদ্দিন গেছি চিড়িয়াখানায় চলে।

শ্যামা স্তম্ভিত হইয়া বলিল, স্কুল পালিয়ে একলাটি তুই চিড়িয়াখানায় যাস্ খোকা!

বিধান বলিল, রোজ নাকি? একদিন দুদিন গেছি মোটে—স্কুল পালাইনি তো। প্রথম ঘণ্টা ক্লাশ হয়ে কদ্দিন আমাদের ছুটি হয়ে যায় ক্লাশের একটা ছেলে মরে গেলে আমরা বুঝি স্কুল করব? এমনি হৈ চৈ করি যে হেডমাস্টার ছুটি দিয়ে দেয়।

প্রথম প্রথম শীতলের জন্য বকুল কাঁদিত। দোতলার ঘরখানা শ্যামা তাহাদের শয়নকক্ষ করিয়াছে দামি জিনিসপত্রের বাক্স প্যাঁটরা বাড়তি বাসন কোসনও ওই ঘরে থাকে সকালে বিকালে ওঘরে কেহ থাকে না শুধু বকুল আপন মনে পুতুল খেলা করে। পুতুল খেলিতে খেলিতে বাবার জন্য নিঃশব্দে সে কাঁদিত মনের মানুষকে না দেখাইয়া অতটুকু মেয়ের গোপন কান্না স্বাভাবিক নয় কি মন বকুলের কে জানে। কোন কাজে উপরে গিয়া শ্যামা দেখিত মুখ বাঁকাইয়া চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে বকুল তাহার পুতল পরিবারটিকে খাওয়াইতে বসাইয়াছে। মেয়ে কার জন্য কাঁদে শ্যামা বুঝিতে পারিত এ বাড়িতে সেই জেলের কয়েদীটাকে ও ছাড়া আর তো কেহ কোনদিন ভালবাসে নাই। মেয়েকে ভুলাইতে গিয়া শ্যামারও কান্না আসিত।

মেয়েকে কোলে করিয়া পুরানো বাড়ির ছাদে নূতন ঘরে ঝক্‌ঝকে দেয়ালে ঠেস দিয় শ্যামা বসিত বুজিত চোখ। শ্যামার কি শ্রান্তি আসিয়াছে? আগের চেয়ে খাটুনি এখন কত কম তাই সম্পন্ন করিতে সে কি অবসন্ন হইয়া পড়ে?

শীতলের জেলে যাইতে যাইতে শীত কমিয়া আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল শীতলের জেলে যাওয়াটা অভ্যাস হইয়া আসিতে আসিতে শহরতলী যেন বসন্তের সাড়া পাইয়াছে। ধানকলের চোঙাটার কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়া উত্তরে উড়িয়া যায়, মধ্যাহ্নে যে মৃদু উষ্ণতা অনুভূত হয় তাহা যেন যৌবনের স্মৃতি। শ্যামার কি কোনদিন যৌবন ছিল? কি করিয়া সে চারটি সন্তানের জননী হইয়াছে, শ্যামার তো তা মনে নাই। আজ সে দারুণ বিপন্ন, স্বামী তার জেল খাটিতেছে, উপার্জনশীল পুরুষের আশ্রয়

তাহার নাই, ভবিষ্যত তাহার অন্ধকার, শহরতলীতে বন-উপবনের বসন্ত আসিলেও জীবনে কবে তাহার যৌবন ছিল তা কি শ্যামার মনে পড়া উচিত? কি অবান্তর তার বর্তমান জীবনে এই বিচিত্র চিন্তা? মুমূর্ষুর কাছে যে নাম-কীর্তন হয়, এ যেন তারই মধ্যে সুর তাল লয় মান খুঁজিয়া বেড়ানো।

জেলের কয়েদী বাপের জন্য যে মেয়ের চোখের জল তাকে কোলে করিয়া স্বামীর বিরহে সকাতর হওয়া কর্তব্য কাজ, কিন্তু জননী শ্যামা, তুমি আবার ছেলে চাও শুনিলে দেবতারা হাসিবেন যে, মানুষ যে ছি ছি করিবে।

মামা বলে, এইবার উপার্জনের চেষ্টা সুরু করি শ্যামা, কি বলিস?

শ্যামা বলে, কি চেষ্টা করবে?

মামা রহস্যময় হাসি হাসিয়া বলে, দেখ না কি করি। কলকাতায় উপার্জনের ভাবনা! পথে ঘাটে পয়সা ছড়ানো আছে, কুড়িয়ে নিলেই হ'ল।

একটা দুটো ক'রে নোটগুলো বদলানো আরম্ভ করলে হয় না?

তুই ভারি ব্যস্তবাগীশ শ্যামা! থাক না, নোট কি পালাচ্ছে? সংসার তোর অচলও তো হয়নি বাবু এখনো!

হয়নি, হতে আর দেরি কত?

সে যখন হবে, দেখা যাবে তখন,—এখন থেকে ভেবে মরিস কেন?

মামার সম্বন্ধে শ্যামা একটু হতাশ হইয়াছে। মামার অভিজ্ঞতা প্রচুর, বুদ্ধিও চোখা, কিন্তু স্বভাবটি ফাঁকিবাজ। মুখে মামা যত বলে কাজে হয়ত তার খানিকটা করিতে পারে, কিন্তু কিছু না করাই তাহার অভ্যাস। কোন বিষয়ে মামার নিয়ম নাই, শৃংখলা নাই। পদ্ধতির মধ্যে মামা হাঁপাইয়া ওঠে। গা লাগাইয়া কোন কাজ করা মামার অসাধ্য, আরম্ভ করিয়া ছাড়িয়া দেয়। নকুড়বাবু ইনসিওরেন্স বেচিয়া খান, তাঁকে বলিয়া কহিয়া শ্যামা মামাকে একটা এজেন্সী দিয়াছিল, মামারও প্রথমটা খুব উৎসাহ দেখা গিয়াছিল, কিন্তু দুদিন দু'একজন লোকের কাছে যাতায়াত করিয়াই মামার ধৈর্য ভাঙিয়া গেল, বলিল, এতে কিছু হবে না শ্যামা, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে টাকার দরকার,

লোককে ভজিযে ভাজিযে ইনসিওব কবিযে পযসাব মুখ দেখা দুদিনের কম্ম নয বাবু, আমাব ওসব পোষাবে না। দোকান দেব একটা।

শ্যামা বলিল, দোকান দেবাব টাকা কই মামা?

মামা বহস্যময হাসি হাসিযা বলিল, থাম না তুই দেখ না আমি কি কবি।

শ্যামা সন্দিগ্ধ হইযা বলিল আমাব সে হাজাব টাকায যেন হাত দিও না মামা।

মামা বলিল ক্ষেপেছিস শ্যামা, তোব সে টাকা তেমনি পুলিন্দে কবা আছে।

সকালে উঠিযা মামা কোথায চলিযা যায, শ্যামা ভাবে বোজগারের সন্ধানে বাহিব হইযাছে। শহবে গিযা মামা এদিক ওদিক ঘোবে কোথাও ভিড় দেখিলে দাঁড়ায সংএব মত বেশ করিয়া আধ ঘণ্টা ধবিযা দুটি একটি সহজ ম্যাজিক দেখাইযা যাহাবা অষ্টধাতুব মাদুলি বিষ তাডানো ভূত-ছাড়ানো শিকড় বিক্রয কবে ধৈর্য সহকাবে মামা গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত তাহাদেব লক্ষ্য কবে। ফুটপাতে যে সব জ্যোতিষী বসিযা থাকে তাদেব সঙ্গে মামা আলাপ কবে। কোনদিন সে স্টেশনে যায কোনদিন গঙ্গাব ঘাটে, কোনদিন কালিঘাটে। যে সব ছন্নছাডা ভবঘুবে মানুষ মানুষকে ফাঁকি দিযা জীবিকা অর্জন কবিযা বেড়ায দেখিতে দেখিতে তাদেব সঙ্গে মামা ভাব জমাইযা ফেলে সুখ দুঃখেব কত কথা হয। সাধু নিশ্বাস ফেলিযা বলে শহবে যেমন জাকজমক বোজগাবেব সুবিধা তেমন নয বড বেযাড়া শহবেব লোকগুলি মফঃস্বলের যাহাবা শহবে আসে শহবে পা দিয়া তাবাও যেন চালাক হইযা ওঠে নাঃ শহবে সুখ নাই। মামা বলে গ্যাট হবে বসে থাকলে কি শহবে সাধুব পযসা আছে দাদা যাও না, শিশিতে জল পুবে ধাতুদৌর্বল্যেব ওষুধ বেচ না গিযে যত ফেনা কাটবে মুখে তত বিক্রি। পথ মামা বোজই হাবায, সে আবেক উপভোগ্য ব্যাপাব। পথ জিজ্ঞাসা কবিলে কলিকাতাব মানুষ এমন মজা কবে! কেউ বিনাবাক্যে গট গট কবিযা চলিযা যায কেউ জলেব মত কবিযা পথেব নির্দেশটা বুঝাইযা দিতে চাহিযা উত্তেজিত অস্থিব হইযা ওঠে। মন্দ লাগে না মামার। শহবেব পথও অন্তহীন শহবেব পথেও অফুবন্ত বৈচিত্র্য

ছড়ানো. ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্তি আসিবে এতবড় ভবঘুরে কে আছে? প্রত্যহ মামা শহরেই কারো বাড়িতে অতিথি হইয়া দুপুরের খাওয়াটা যোগাড় করিবার চেষ্টা করে. কোনদিন সুবিধা হয় কোনদিন হয় না। বাড়িতে আজকাল খাওয়া দাওয়া তেমন ভাল হয় না, শ্যামা বড় কৃপণ হইয়া পড়িয়াছে।

কিছু হ'ল মামা?—শ্যামা জিজ্ঞাসা করে।

মামা বলে, হচ্ছে রে হচ্ছে. বলতে বলতে কি আর কিছু হয়?

এদিকে শ্যামার টাকা ফুরাইয়া গিয়াছে। নগদ যা কিছু সে জমাইয়াছিল, ঘর তুলিতে, শীতলের জন্য উকিলের খরচ দিতেই তাহা প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল, বাকি টাকায় ফাল্গুন মাস পর্যন্ত খরচ চলিল, তারপর আর কিছুই রহিল না। বড়দিনের সময় রাখাল আসিয়াছিল, টাকা আসে নাই। ইতিমধ্যে শ্যামা তাহাকে দুখানা চিঠি দিয়াছে, দশ বিশ করিয়াও শ্যামার পাওনাটা সে কি শোধ করিতে পারে না? জবাব দিয়াছে মন্দা, লিখিয়াছে, পাওনার কথা কি লিখেছ বৌ. উনি যা পেতেন তার চেয়েও কম টাকা নিয়েছিলেন দাদার কাছ থেকে, যাই হোক, তুমি যখন দুরবস্থায় পড়েছ বৌ, তোমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করা আমাদের উচিত বৈ কি, এ মাসে পারব না, সামনের মাসে কিছু টাকা তোমায় পাঠিয়ে দেব।

কিছু টাকা, কত টাকা? কুড়ি।

সেদিন বোধ হয় চৈত্র মাসের সাত তারিখ। বাড়িতে মেছুনি আসিয়াছিল। একপোয়া মাছ রাখিয়া পয়সা আনিতে গিয়া শ্যামা দেখিল দুটি পয়সা মোটে তাহার আছে। বাক্স প্যাঁটরা হাতড়াইয়া ক'দিন অপ্রত্যাশিতভাবে টাকাটা সিকিটা পাওয়া যাইতেছিল, আজও তেমনি কিছু পাওয়া যাইবে শ্যামা করিয়াছিল এই আশা,—কিন্তু দুটি তামার পয়সা ছাড়া আর কিছুই সে খুঁজিয়া পাইল না।

মাছের দু' আনা দাম মামাই দিল।

শ্যামা বলিল, এমন করে আর একটা দিনও তো চলবে না মামা? একটা কিছু উপায় কর? দু'চারখানা নোট তুমি নিয়ে এসো সেই টাকা থেকে, তারপর যা কপালে থাকে হবে।

মামা বলিল, টাকা চাই?—নে না বাবু দু'পাঁচ টাকা আমারি কাছ

থেকে, আমি তো কাঙাল নই? বলিয়া মামা দশটা টাকা শ্যামাকে দিল।

মামার তবে টাকা আছে নাকি? লুকাইযা রাখিয়াছে? শ্যামা বলিল, দশ টাকায় কি হবে মামা? চাল্দিকে অভাব খাঁ খাঁ করছে, কোথায় ঢালব এ টাকা?

এখনকার মত চালিয়ে নে মা, ফুরিয়ে গেলে বলিস্।

আর ক'টা দাও। খোকার মাইনে, দুধের দাম—

মামা হাসিয়া বলিল, আর কোথায় পাব?

কিন্তু শ্যামার মনে সন্দেহ ঢুকিয়াছে, কিছু টাকা মামা নিশ্চয় লুকাইয়া রাখিযাছে, এমনি চুপ করিয়া থাকে, অচল হইলে পাঁচ টাকা দশ টাকা বাহির করে। অবিলম্বে আরও বেশি টাকার প্রয়োজন শ্যামাব ছিল না, তবু মামার সঙ্গতি আঁচ করিবাব জন্য সে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। মামা শেষে রাগ কবিযা বলিল, বললাম নেই, বিশ্বাস হ'ল না বুঝি? দেখগে আমার ব্যাগ খুঁজে!

ব্যাগ মামার শ্যামা আগেই খুঁজিয়াছে। দু'খানা গেরুয়া বসন, একটা গেরুয়া আলখাল্লা, কতকগুলি রুদ্রাক্ষ ও স্ফটিকের মালা, কতকগুলি কালো কালো শিকড়, কাঠের একটা কাঁকুই, টিনের ছোট একটি আরসি আর এমনি দুটো চারটে জিনিস মামার সম্বল। পযসা কড়ি ব্যাগে কিছুই নাই। তবু মামার যে টাকা নাই শ্যামা তাহা পুরাপুরি বিশ্বাস করিতে পারিল না।

দশটা টাকা যে কোথা দিয়া শেষ হইযা গেল শ্যামা টেবও পাইল না। মামার কাছে হাত পাতিলে এবার মামা সঙ্গে সঙ্গে টাকা বাহির করিযা দিল না, বকিতে বকিতে বাহির হইয়া গিয়া একবেলা পরে আবার দশ টাকার একটা নোট আনিয়া দিল। শ্যামার প্রশ্নের জবাবে বলিল শিষ্য দিয়াছে।

চৈত্র মাসের মাঝামাঝি ইংরাজি মাস কাবার হইলে একদিন সকালে শ্যামা রাণীকে জবাব দিল। রাণীকে সে দু'মাস আগেই ছাড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিল, ঝি রাখিবার সামর্থ্য তাহার কোথায়?—মামার জন্য পারে নাই। মামা বলিয়াছিল, বড় তুই ব্যস্তবাগীশ শ্যামা, এত খরচের মধ্যে একটা ঝির মাইনে তুই দিতে পারবি নে, কত আর মাইনে ওর? আগে অচল হোক, তখন ছাড়াস, একা একা তুই খেটে খেটে মরবি আমি তা দেখতে পারব না শ্যামা—।

এবার মামাকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই রাণীকে শ্যামা বিদায় করিয়া দিল। সারাদিন টহল দিয়া সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরিয়া মামা খবরটা শুনিয়া বলিল, তাই কি হয় মা! এতগুলো ছেলেমেয়ে, একা তুই পারবি কেন? ওসব বুদ্ধি করিস নে, এমনি যদি খরচ চলে একটা ঝির খরচও চলবে। আমি ওর মাইনে দেব'খন যা।

সকালে মামা নিজে গিয়া রাণীকে ডাকিয়া আনিল। বলিল, এমনি তো কাজের অন্ত নেই, বাসনমাজা ঘর-ধোয়ার কাজও যদি তোকে করতে হয শ্যামা, ছেলেমেয়েদের মুখের দিকে কে তাকাবে লো, ভেসে যাবে না ওরা? এ বুড়ো যদ্দিন আছে, সংসার তোর একভাবে চলে যাবে শ্যামা, কেন তুই ভেবে ভেবে উতলা হয়ে উঠিস্?

শ্যামার চোখে জল আসে। কলতলায় রাণী বাসন মাজিতেছে,—এতক্ষণ ও কাজ তাকেই করিতে হইত, নিজের মামা ছাড়া তাহা অসহ্য হইত কার? সংসাবে আত্মীয়েব চেয়ে আপনার কেহ নাই। মানুষ করিযা বিবাহ দিয়াছিল, তারপর কুড়ি বছর দেশবিদেশে ঘুরিয়া আসিয়া আত্মীয় ছাড়া কে মমতা ভুলিয়া যায় না?

শ্যামাকে উপার্জ্জনের অনেক পন্থাব কথা শুনাইবাব পব যে পন্থাটি অবলম্বন করা চৈত্র মাসের মধ্যেই মামা স্থির করিযা ফেলিল শ্যামাকে এক দিন তাহার আভাসটুক আগেই সে দিয়া বাখিয়াছিল। শুভ পয়লা বৈশাখ তারিখে মামা দোকান খুলিল।

বড় রাস্তায গলির মোড়েব কাছাকাছি ছোট একটি দোকান ঘব খালি হইয়াছিল বাব টাকা ভাড়া। গলি দিয়া বাব তিনেক পাক খাইযা শ্যামাব বাড়ি পেৌঁছিতে হয একদিন বাড়ি ফিবিবাব সময 'এই দোকান ভাড়া দেওযা যাইবে' খড়ি দিযা আঁকাবাঁকা অক্ষবে এই বিজ্ঞাপনটি পাঠ কবিবামাত্র মামার মতলব স্থির হইয়া গেল। ঘবটি ভাড়া লইযা মামা মনোহাবি দোকান খুলিয়া বসিল। ছোট দোকান, পুতুল, খাতা, পেন্সিল, চা, বিস্কট, লজেঞ্চুস, হ্যারিকেনের ফিতা, মাথার কাঁটা, সিঁদুর এই সব অল্প দামি জিনিসের, দু' বোতল সুবাসিত পরিশোধিত নারিকেল তৈলের বোতলের চেয়ে দামি জিনিস মামার দোকানে রহিল কিনা সন্দেহ। কাঁচের কেস আলমারি প্রভৃতি

কিনিয়া দোকান দিয়া বসিতে দু'শ টাকার বেশি লাগিল না। মামা দোকানের নাম রাখিল শ্যামা ষ্টোরস্।

দু'শ টাকা মামা পাইল কোথায়? জিজ্ঞাসা করিলে মামা বলে, শিষ্য দিয়েছে। কেমন শিষ্য জানিস শ্যামা বোম্বাই শহরের মার্চেণ্ট জুয়েলার-লাখোপতি মানুষ। প্রয়াগে কুম্ভমেলায় গিয়ে হাজার হাজার ছাইমাখা সন্ন্যাসীর মধ্যে গেরুয়া কাপড়টি শুধু পরে গায় একটা কুর্তা চাপিয়ে এক ধারে বসে আছি না একরতি ভস্ম না একটা রুদ্রাক্ষ জটাফটা'ত কস্মিন কালে রাখিনে ওই অত সাধুর মধ্যে লাখোপতি মানুষটা করলে কি অবাক হয়ে খানিক আমায় দেখলে দেখে সটান এসে লুটিয়ে পড়ল পায়ে। বলল, বাবা এত গুটা মালের মধ্যে তুমি সাচ্চা সাধু তোমার ভড়ং নেই অনুমতি দাও সাধু সেবা করি। মামা অকৃত্রিম আত্মপ্রসাদে চোখ বুজিয়া মৃদু মৃদু হাসে।

শ্যামা বলে তা যদি বল মামা এখনো তোমার মুখে চোখে যেন জ্যোতি ফোটে মাঝে মাঝে। কিছু পেয়েছিলে মামা সাধনার গোড়ার দিকে সাধুরা যা পায় টায় ক্ষমতা না কি বলে কে জানে বাবু তাই কিছু?

মামা নিশ্বাস ফেলিয়া বলে পাই নি? ছেড়েছুড়ে দিলাম বলে লেগে যদি থাকতাম শ্যামা–।

দোকান করার টাকাটা তবে ভক্তই দিয়াছে? শ্যামার সেই হাজার টাকায় হাত পড়ে নাই? শ্যামার মন খুঁতখুঁত করে। কুড়ি বছর অদৃশ্য থাকিবার রহস্য আবরণটি এক সঙ্গে বাস করিতে করিতে মামার চারিদিক হইতে খসিয়া পড়িতেছিল শ্যামা যেন টের পাইতেছিল দীর্ঘকাল দেশ বিদেশে ঘুরিলেই মানুষের কতগুলি অপার্থিব গুণের সঞ্চার হয় না একটু হয়ত খাপছাড়া স্বভাব হইয়া যায় তার বেশি আর কিছু নয় বিনা সঞ্চয়ে ঘুরিয়া বেড়ানো ছাড়া হয়ত এসব লোকের দ্বারা আর কোন কাজ হয় না। মামা যে এমন একটি ভক্তকে বাগাইয়া রাখিয়াছে চাহিলেই যে দু'চারশ টাকা দান করিয়া বসে, শ্যামার তাহা বিশ্বাস করিতে অসুবিধা হয়। তেমন জবর দস্ত লোক তো মামা নয়?

একদিন সন্ধ্যার পর চাদরে গা ঢাকিয়া শ্যামা দোকান দেখিয়া আসিল।

দোকান চলিবে ভরসা হইল না। শ্যামা-ষ্টোরসএর সামনে রাস্তার ওপারে মস্ত মনোহারি দোকান, চারপাঁচটা বিদ্যুতের আলো, টিমটিমে কেরাসিনের আলো জ্বালা মামার অতটুকু দোকানে কে জিনিস কিনিতে আসিবে? মামার যেমন কাণ্ড, দোকান দিবার আর যায়গা পাইল না।

মামার উৎসাহের অন্ত নাই, বিধান ও খুকী দোকান দোকান করিয়া পাগল, মণিরও দুবেলা দোকানে যাওয়া চাই। মামা ওদের বিস্কুট ও লজেঞ্জুষ দেয়, দোকানের আকর্ষণ ওদের কাছে তাহাতে আরও বাড়িয়া গিয়াছে। জিনিস বিক্রয় করিবার সখ বিধানের প্রচণ্ড। বলে এবার যে খদ্দের আসবে তাকে আমি জিনিস দেব দাদু, এ্যাঁ? মামা বলে, পারবি কি খোকা, খদ্দের বিগড়ে দিবি শেষে! কিন্তু অনুমতি মামা দেয়। বিধান ছোট শো-কেসটির পিছনে টুলটার উপরে গম্ভীর মুখে বসে, মামা কোণের বেঞ্চিটার উপর বসিয়া চশমা চোখে দিয়া বিড়ি টানিতে টানিতে খবরের কাগজ পড়ে। ক্রেতা যে আসে হয়ত সে পাড়ার ছেলে, ঈর্ষার দৃষ্টিতে বিধানের দিকে চাহিয়া বলে, কি রে বিধু'—বিধান বলে, কি চাই? সে পাকা দোকানী, কেনা বেচার সময় তার সঙ্গে বন্ধুত্ব অচল, খোস গল্প করিবার তার সময় কই? চশমার ফাঁক দিয়া মামা সহকারীর কার্য্যকলাপ চাহিয়া দ্যাখে, বলে, কাঁচি? ওই ও কোণার টিনের কৌটোতে—দু'বড়ি এক পয়সায়, কাগজে মুড়ে দে খোকা!.

এদিকে দোকান চলে ওদিকে মামা আজ দশটাকা কাল পাঁচটাকা সংসার খরচ আনিয়া দেয়ঃ মামার চারিদিকে রহস্যের ভাঙ্গা আবরণটি আবার যেন গড়িয়া উঠিতে থাকে। পাড়ার লোকে এতকাল মামাকে অতিথি বলিয়া খাতির করিত, এখন প্রতিবেশী গৃহস্থের প্রাপ্য সহজ সমাদর দেয় তবে অতটুকু দোকান দেওয়ার জন্য পাড়ার অনেক চাকুরে বাবুর কাছে মামার আসন নামিয়া গিয়াছে, খুব যারা বাবু দু'এক পয়সার জিনিস কিনিতে মামাকে তাদের কেহ তুমি পর্যন্ত বলিয়া বসে।

মামা বলে, কি চাই বললে? পরিমল নস্যি? ওই ও দোকানে যাও!

অপমান করিয়া মামার কাছে কারো পার পাওয়ার যো নাই।

বৈশাখ মাস শেষ হইলে শ্যামা একদিন বলিল, দোকানের হিসাবপত্র কবলে মামা, লাভটাভ হ'ল?

মামা বলিল লাভ কিবে শ্যামা, বসতে না বসতে কি লাভ হয়? খরচ উঠুক আগে।

শ্যামা বলিল, নতুন দোকান দিযে বসাব খবচ দু'এক মাসে উঠবে না তা জানি মামা, তা বলিনি, বিক্রীব ওপোর লাভটাভ কি বকম হল হিসাব করনি?—কত বেচলে, কেনা দাম ধবে কত লাভ বইল, কবনি সে হিসাব?

মামা বলিল, তুই আমাকে দোকান করা শেখাতে আসিসনে শ্যামা!

এবার গ্রীষ্মেব ছুটি হওয়ার আগে ক্লাশের ছেলেদের অনেকেই নানা স্থানে বেড়াইতে যাইবে শুনিযা বিধানের ইচ্ছা হইয়াছিল সেও কোথাও যায—কোথায যাইবে? কোথায তাহার কে আছে, কার কাছে সে গিয়া কিছুদিন থাকিযা আসিতে পারে? বনগাঁ গেলে হইত,—মন্দাকে শ্যামা চিঠি লিখিযাছিল, মন্দা জবাব দিযাছে এখন সেখানে চাবিদিকে বড় কলেরা বসন্ত হইতেছে—এখন না গিযা বিধান যেন পূজাব সময যায়।

বিষ্ণুপ্রিযাবা এবার দার্জ্জিলিং গিয়াছে। তখনও স্কুলেব ছুটি হয় নাই,—শঙ্কব সঙ্গে যাইতে পারে নাই। বিষ্ণুপ্রিয়া এখানে থাকিবার সময় শঙ্কব বোধ হয সাহস পাইত না, বিষ্ণুপ্রিযা দার্জ্জিলিং চলিযা গেলে একদিন বিকালে সে এ বাড়িতে আসিল।

শ্যামা বাবান্দায তবকাবি কুটিতেছিল বিধান কাছেই দেযালে ঠেস্ দিযা বসিযা ছেলেদেব একটা ইংবাজি গল্পেব বই পড়িতেছিল, মুখ তুলিযা শঙ্কবকে দেখিযা সে আবাব পড়ায মন দিল।

শঙ্করকে বসিতে দিযা শ্যামা বলিল, কে এসেছে দেখ খোকা।

বিধান শুধু বলিল, দেখেছি।

বিধান কি আজো সে অপমান ভোলে নাই, বন্ধু বাড়ি আসিয়াছে তার সঙ্গে সে কথা বলিবে না? লাজুক শঙ্করেব মুখখানা লাল হইয়া উঠিয়াছিল, শ্যামা টান দিযা বিধানেব বই কাড়িয়া লইল, বলিল, নে, ঢের বিদ্যে হয়েছে, যা দিকি দুজনে দোতালায়, বাতাস লাগবে একটু,—যা গরম এখানে!

বিধান আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে গিয়া বসিল। শ্যামা বলিল, তোমাদের

ঝগড়া হয়েছে নাকি শঙ্কর?—ও বুঝি কথা বলে না তোমার সঙ্গে? কি পাগল ছেলে!—না বাবা, যেও না তুমি, পাগলাটাকে আমি ঠিক করে দিচ্ছি।

ঘরে গিয়া শ্যামা ছেলেকে বোঝায়। বলে যে শঙ্করের কি দোষ? শঙ্কর তো তাদের অপমান করে নাই, যে বাড়ি বহিয়া ভাব করিতে আসে তার সঙ্গে কি এমন ব্যবহার করিতে হয়? ছি! কিন্তু এ তো বোঝানোর ব্যাপার নয়, অন্ধ অভিমানকে যুক্তি দিয়া কে দমাইতে পারে? ছেলেকে শ্যামা বাহিরে টানিয়া আনে, সে মুখ গোঁজ করিয়া থাকে। শঙ্কর বলে, আমি যাই মাসিমা।

আহা বেচারীর মুখখানা ম্লান হইয়া গিয়াছে।

শ্যামা রাগিয়া বলে, ছি খোকা ছি, একি ছোট মন তোর, একি ছোট-লোকের মত ব্যবহার? যা তুই আমার সামনে থেকে সরে!—বোসো বাবা তুমি, কটা কথা শুধোই—দিদি পত্র দিয়েছে? সেখানে ভাল আছে সব? তুমি যাবে না দার্জিলিং স্কুল বন্ধ হলে?

শ্যামা শঙ্করের সঙ্গে গল্প করে, হাঁটুতে মুখ গুঁজিয়া বিধান বসিয়া থাকে, কি ভয়ানক কথা ছেলেকে সে বলিয়াছে শ্যামার তা খেয়ালও থাকে না। তারপর বিধান হঠাৎ কাঁদিয়া ছুটিয়া দোতালায় চলিয়া যায়। লাজুক শঙ্কর বিব্রত হইয়া বলে, কেন বকলেন ওকে?—বলিয়া উসখুস করিতে থাকে।

তারপর সেও উপরে যায়। খানিক পরে শ্যামা গিয়া দেখিয়া আসে, দুজনে গল্প করিতেছে।

সেই যে তাহাদের ভাব হইয়াছিল, তারপর শঙ্কর প্রায়ই আসিত। শঙ্করের ক্যারমবোর্ডটি পড়িয়া থাকিত এ বাড়িতেই, উপরে খোলা ছাদে বসিয়া সারা বিকাল তাহারা ক্যারম খেলিত। বন্ধে তাহার সহিত বিধানের দার্জিলিং যাওয়ার কথাটা শঙ্করই তুলিয়াছিল, বিষ্ণুপ্রিয়া ইহা পছন্দ করিবে না জানিয়াও শ্যামা আপত্তি করে নাই, তেমন আদর যত্ন বিধান না হয় নাই পাইবে, সেখানে অতিথি ছেলেটিকে পেট ভরিয়া খাইতে তো বিষ্ণুপ্রিয়া দিবেই? কিন্তু রাজি হইল না বিধান। একসঙ্গে দার্জিলিং গিয়া থাকার কত লোভনীয় চিত্রই যে শঙ্কর তার সামনে আঁকিয়া ধরিল, বিধানকে বাঁকানো

গেল না। যথাসময়ে শঙ্কর চলিয়া গেল সেই শীতল পাহাড়ী দেশে, এখানে বিধানের দেহ গরমে ঘামাচিতে ভরিয়া গেল।

মনে মনে শ্যামা বড় কষ্ট পাইল। অভাব অনটনের অভিজ্ঞতা জীবনে তাহার পুরানো হইয়া আসিয়াছে, এমন দিনও তো গিয়াছে যখন সে ভাল করিয়া দেহের লজ্জাও আবরণ করিতে পারে নাই, কিন্তু আজ পর্যন্ত চারটি সন্তানের কোন বড় সাধ শ্যামা অপূর্ণ রাখে নাই—আকাশের চাঁদ চাহিবার সাধ নয়, শ্যামার ছেলেমেয়ে অসম্ভব আশা রাখে না, শ্যামার মত গরীবের পক্ষে পূরণ করা হয়ত কিছু কঠিন এমনি সব সাধারণ সখ, সাধারণ আব্দার। বিধান একবার সাহেবি পোষাক চাহিয়াছিল, তাদের ক্লাশের পাঁচ ছ'টি ছেলে যে রকম বেশ ধরিয়া স্কুলে আসে। দোতালার ঘরের জন্য ইট সুরকি কিনিয়া শ্যামা তখন ফতুর হইয়া গিয়াছে। তবু ছেলেকে পোষাক তো সে কিনিয়া দিয়াছিল।

শ্যামার চোখে আজকাল সব সময় একটা ভীরুতার আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। শীতলের উপরেও কোনদিন সে নিশ্চিন্ত নির্ভর রাখিতে পারে নাই, কমল প্রেসের চাকরীতে শীতল যখন ক্রমে ক্রমে উন্নতি করিতেছিল তখনও নয়, তবু তখন মনে যেন তাহার একটা জোর ছিল। আজ সে জোর নষ্ট হইয়া গিয়াছে। চোরের বৌ? জীবনে এ ছাপ তাহার ঘুচিবে না, স্বামীর অপরাধে মানুষ তাহাকে অপরাধী করিয়াছে, কেহ বিশ্বাস করিবে না, কেহ সাহায্য দিবে না, সকলেই তাহাকে পরিহার করিয়া চলিবে। যদি প্রয়োজনও হয় ছেলেমেয়েদের দু বেলার আহার সংগ্রহ করিবার সঙ্গত উপায় খুঁজিয়া পাইবে না, বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন সকলে তাহাকে এড়াইয়া চলিতে চায়, নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা সে করিবে কিসের ভরসায়? বিধবা হইলেও সে বোধ হয় এতদূর নিরুপায় হইত না। দু বছর পরে শীতল হয়ত ফিরিয়া আসিবে, হয়ত আসিবে না। আসিলেও শ্যামার দুঃখ সে কি লাঘব করিতে পারিবে? নিজের প্রেস বিক্রয় করিয়া কতকাল শীতল অলস অকর্মণ্য হইয়া বাড়ি বসিয়াছিল সে ইতিহাস শ্যামা ভোলে নাই। তবু তখন শীতলের বয়স কম ছিল, মন তাজা ছিল। এই বয়সে দু'বছর জেল খাটিয়া আসিয়া আর কি সে এত বড় সংসারের ভার গ্রহণ করিতে পারিবে?

নিজেই হয়ত সে ভার হইয়া থাকিবে শ্যামার।

এক আছে মামা। সেও আবার খাঁটি একটি রহস্য, ধরা ছোঁয়া দেয় না। কখনো শ্যামার আশা হয় মামা বুঝি লাখপতিই হইতে চলিয়াছে, কখনো ভয় হয় মামা সর্বনাশ করিয়া ছাড়িবে। সংসারে শ্যামা মানুষ দেখিয়াছে অনেক, এরকম খাপছাড়া অসাধারণ মানুষ একজনকেও তো সে স্থায়ী কিছু করিতে দেখে নাই। সংসারে সেটা যেন নিয়ম নয়। সাধারণ মোটা বুদ্ধি সাবধানী লোকগুলিই শেষ পর্যন্ত টিঁকিয়া থাকে শীতলের মত যারা পাগলা মামার মত যারা খেয়ালী হঠাৎ একদিন দেখা যায় তারাই ফাঁকিতে পড়িয়াছে। জীবন তো জুয়া খেলা নয়।

স্কুল খুলিবার কয়েকদিন পরে শঙ্কর দার্জিলিং হইতে ফিরিয়া আসিল। শ্যামার সাদর অভ্যর্থনা বোধ হয় তাহার ভাল লাগিত একদিন সে দেখা করিতে আসিল শ্যামার সঙ্গেই। শ্যামা দেখিয়া অবাক পকেটে ভরিয়া সে দার্জিলিংএর কয়েক রকম তরকারি লইয়া আসিয়াছে। বিধান তখন দোকানে গিয়াছিল হাতের কাজ ফেলিয়া রাখিয়া শ্যামা শঙ্করের সঙ্গে আলাপ করিল। বকুল নামিয়া আসিল নিচে মার গা ঘেঁষিয়া বসিয়া বড় বড় চোখ মেলিয়া সে সবিস্ময়ে শঙ্করের দার্জিলিং বেড়ানোর গল্প শুনিল। শুধু বিধানকে নয় শঙ্কর বকুলকেও ভালবাসে। কেবল সে বড় লাজুক বলিয়া বিধানের কাছে যেমন বকুলের কাছে তেমনি ভালবাসা কোথায় লুকাইবে ভাবিয়া পায় না। পকেটে ভরিয়া সে কি শ্যামার জন্য শুধু তর কারিই আনিয়াছে? মুখ লাল করিয়া বকুলের জিনিসও সে বাহির করিয় দেয়ঃ কে জানিত দার্জিলিং গিয়া বকুলের কথা সে মনে রাখিবে?

শ্যামা বড় খুসি হয়। সোনার ছেলে, মাণিক ছেলে। কি মিষ্টি স্বভাব আম কাটিয়া শ্যামা তাহাকে খাইতে দেয় তারপর রঙীন স্ফটিকের মাল গলায় দিয়া বকুল গল গল করিয়া কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে দেখিয় হাসিমুখে কাজ করিতে যায়, পাঁচ মিনিট পরে দেখিতে পায় দুজনে দোতালায় গিয়াছে। রাণীকে শোনাইয়া শ্যামা বলে, বড় ভাল ছেলে রাণী, একটু অহঙ্কার নেই। তারপর দোতালায় দুমদাম করিয়া ওদের ছুটাছুটির শব্দ ওঠে, বকুলের অজস্র হাসি ঝরণার মত নিচে ঝরিয়া পড়ে, এ ওর পিছনে

ছুটিতে ছুটিতে একবার তাহারা একতলাটা পাক দিয়া যায় দুরন্ত মেয়েটার পাল্লায় পড়িয়া লাজুক শঙ্করও যেন দুরন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

পরদিন বিধান স্কুলে চলিয়া গেলে শ্যামা বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে দেখা করিতে গেল। দাসী তখন স্নানের আগে বিষ্ণুপ্রিয়ার চুলে গন্ধ তেল দিতেছিল চওড়া-পাড় কোমল সাড়িখানি লুটাইয়া বিষ্ণুপ্রিয়া আনমনে বসিয়াছিল শ্বেত-পাথরের মেঝেতে, কে বলিবে সেও জননী। এত বয়সে ওর ঢং দেখিয়া মনে মনে শ্যামার হাসি আসে—প্রথম কন্যার জন্মের পর ও আবার সন্ন্যাসিনী সাজিয়াছিল! আজ প্রতিদিন তিনটি দাসী মিলিয়া ওই স্থূল দেহটাকে ঘষিয়া মাজিয়া ঝকঝকে করিবার চেষ্টায় হয়রাণ হয়। গায়ে বঙটঙ দেয় নাকি বিষ্ণুপ্রিয়া ?

বিষ্ণুপ্রিয়া বলিল বোসো।

শ্যামা মেঝেতেই বসিয়া বলিল কবে ফিরলেন দিদি? দিব্যি সেরেছে শরীর রাজরাণীর মত রূপ করে এসেছেন বঙ যেন আপনার দিদি ফেটে পড়ছে। অসুখ শরীর নিয়ে হাওয়া বদলাতে গেলেন আমরা এদিকে ভেবে মরি করে দিদি আসবেন খবর পেয়ে ছুটে এসেছি।

বিষ্ণুপ্রিয়া হাই তুলিল উদাস ব্যথিত হাসির সঙ্গে বলিল, এসেই আবার গরমে শরীরটা কেমন কেমন করছে উঠতে বসতে বল পাইনে, বেশ ছিলাম সেখানে—খুকি তো কিছুতে আসবে না, কিন্তু ইস্কুল টিস্কুল সব খুলে গেল কত আর কামাই করবে? তাই সকলকে নিয়ে চলেই এলাম।

দার্জিলিংএ শুনেছি খুব শীত?—শ্যামা বলিল।

শীত নয়? শীতের সময় বরফ পড়ে। বিষ্ণুপ্রিয়া বলিল।

একথা সেকথা হয়, ভাঙা ভাঙা ছাড়া ছাড়া আলাপ। শ্যামার খবর বিষ্ণুপ্রিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করে না। শ্যামার ছেলেমেয়েরা সকলে কুশলে আছে কি না, শ্যামার দিন কেমন করিয়া চলে জানিবার জন্য বিষ্ণুপ্রিয়ার এতটুকু কৌতূহল দেখা যায় না। শ্যামার বড় আপশোষ হয়। কে না জানে বিষ্ণুপ্রিয়া যে একদিন তাহাকে খাতির করিত সেটা ছিল শুধু খেয়াল, শ্যামার নিজের কোন গুণের জন্য নয়। বড়লোকের অমন কত খেয়াল থাকে। শ্যামাকে একটু সাহায্য করিতে পারিলে বিষ্ণুপ্রিয়া যেন কৃতার্থ হইয়া যাইত। না মিটাইতে

পারিলে বড়লোকের খেয়াল নাকি প্রবল হইয়া ওঠে শ্যামা শুনিয়াছে আজ দুঃখের দিনে শ্যামার জন্য কিছু করিবার সখ বিষ্ণুপ্রিয়ার কোথায় গেল? তারপর হঠাৎ এক সময় শ্যামার একটা অদ্ভুত কথা মনে হয় মনে হয় বিষ্ণুপ্রিয়া যেন প্রতীক্ষা করিয়া আছে। কিছু কিছু সাহায্য বিষ্ণুপ্রিয়া তাহাকে করিবে কিন্তু আজ নয়—শ্যামা যেদিন ভাঙিয়া পড়িবে কাঁদিয়া হাতে পায়ে ধরিয়া ভিক্ষা চাহিবে এমন সব তোষামোদের কথা বলিবে ভিখারির মুখে শুনিতেও মানুষ যাহাতে লজ্জা বোধ করে—সেইদিন।

বাড়ি ফিরিয়া শ্যামা বড় অপমান বোধ করিতে লাগিল মনে মনে বিষ্ণুপ্রিয়াকে দুটি একটি শাপান্তও করিল। তব একদিক দিয়া সে যেন খুসিই হয় একটু যেন আরাম বোধ করে। অন্ধকার ভবিষ্যতে এ যেন ক্ষীণ একটি আলোক বিষ্ণুপ্রিয়ার এই অপমানকর নিষ্ঠুর প্রত্যাশা। একান্ত নিরুপায় হইয়া পড়িলে বিষ্ণুপ্রিয়ার হাতে পায়ে ধরিয়া কাঁদাকাটা করিয়া সাহায্য আদায় করা চলিবে এ চিন্তা আঘাত করিয়াও শ্যামাকে যেন সান্ত্বনা দেয়।

দিনগুলি এমনিভাবে কাটিতে লাগিল। আকাশে ঘনাইয়া আসিল বর্ষার মেঘ মানুষের মনে আসিল সজল বিষণ্ণতা। ক দিন ভিজিতে ভিজিতে স্কুল হইতে বাড়ি ফিরিয়া বিধান জ্বরে পড়িল হারান ডাক্তার দেখিতে আসিয়া বলিল ইনফ্লুয়েঞ্জা হইয়াছে। রোজ একবার করিয়া বিধানকে সে দেখিয়া গেল। আজ পর্যন্ত শ্যামার ছেলেমেয়ের অসুখে বিসুখে অনেকবার হারান ডাক্তার এ বাড়ি আসিয়াছে শ্যামা কখনো টাকা দিয়াছে কখনো দেয় নাই। এবার ছেলে ভাল হইয়া উঠিলে একদিন সে হারান ডাক্তারের কাছে কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল বাবা, এবার তো কিছুই দিতে পারলাম না আপনাকে?

হারান বলিল তোমার মেয়েকে দিয়ে দাও আমাদের বকুলরাণীকে?

কান্নার মধ্যে হাসিয়া শ্যামা বলিল, তা নিন এখুনি নিয়ে যান।

শ্যামার জীবনে এই আরেকটি রহস্যময় মানুষ। শীর্ণকায় তিরিক্ষে মেজাজের লোকটির মুখের চামড়া যেন পিছন হইতে কিসে টান করিয়া রাখিয়াছে, মনে হয় মুখে যেন চকচকে পালিশ করা গাম্ভীর্য। সর্বদা কি যেন

সে ভাবে বাস যেন সে করে একটা গোপন সুরক্ষিত জগতে,—সংসারে মানুষের মধ্যে চলাফেরা কথাবার্তা যেন তাহার কলের মত, আন্তরিকতা নাই অথচ কৃত্রিমও নয়। শ্যামার কাছে সে যে টাকা নেয় না এর মধ্যে দয়ামায়ার প্রশ্ন নাই, মহত্ত্বের কথা নাই, টাকা শ্যামা দেয় না বলিয়াই সে যেন নেয় না, অন্য কোন কারণে নয়। শ্যামা দুরবস্থায় পড়িয়াছে একথা কখনো সে কি ভাবে?

মনে হয় বকুলকে বুঝি হারান ডাক্তার ভালবাসে। শ্যামা জানে তা সত্য নয়। এ বাড়িতে আসিয়া হারানের বুঝি অন্য এক বাড়ির কথা মনে পড়ে শ্যামা আর বকুল বুঝি তাহাকে কাদের কথা মনে পড়াইয়া দেয়। বকুলকে কাছে টানিয়া হারান যখন তাহার মুখের দিকে তাকায় শ্যামাও যেন তখন আর একজনকে দেখিতে পায় গায়ে শ্যামার কাঁটা দিয়া ওঠে। এ বাড়িতে রোগি দেখিতে আসিবার জন্য হারান তাই লোলুপ, একবার ডাকিলে দশবার আসে না ডাকিলেও আসে। মানুষকে অপমান না করিয়া যে কথা বলিতে পারে না রোগির অবস্থা সম্বন্ধে আত্মীয়ের ব্যাকুল প্রশ্নে পর্যন্ত যে সময় সময় আগুনের মত জ্বলিয়া ওঠে বহুদিন আগে শ্যামার কাছে সে পোষ মানিয়াছিল। শ্যামা তখন হইতে সব জানে। একটা হারানো জীবনের পুনরাবৃত্তি এইখানে হারানের আরম্ভ হইয়াছিল একান্ত পৃথক একান্ত অমিল পুনরাবৃত্তি তা হোক তাও হারানের কাছে দামি। শ্যামা ছিল হারানের মেয়ে সুখময়ীর ছায়া সুখময়ীর কথা শ্যামা শুনিয়াছে। এই ছায়াকে ধরিয়া হারান শ্যামার সমান বয়সের সময় হইতে সুখময়ীর জীবন স্মৃতির বাস্তব অভিনয় আবিষ্কার করিয়াছে বকুলের মত একটি মেয়েও নাকি সুখময়ীর ছিল। শ্যামার ছেলেরা তাই হারানের কাছে মূল্যহীন ওদের দিকে সে চাহিয়াও দেখে না। এ বাড়িতে আসিয়া শ্যামা ও বকুলকে দেখিবার জন্য সে ছটফট করে।

অথচ শ্যামা ও বকুলকে সে স্নেহ করে কিনা সন্দেহ। ওরা তুচ্ছ ওরা হারানের কেউ নয় হারান পুলকিত হয় শ্যামার কণ্ঠ ও কথা বলার ভঙ্গিতে, —শ্যামার চলন দেখিয়া বকুলের দুরন্তপনা ও চাঞ্চল্য দেখিয়া তাহার মোহের সীমা থাকে না। মমতা যদি হারানের থাকে তাহা অবাস্তবতার প্রতি—শ্যামার

উচ্চারিত শব্দ ও কয়েকটি ভঙ্গিমায় এবং বকুলের প্রাণের প্রাচুর্যে—মানুষ দুটিকে হারান কখনো ভালবাসে নাই শোকে যে এমন জীর্ণ হইয়াছে সে কবে রক্তমাংসের মানুষকে ভালবাসিতে পারিয়াছে?

শ্যামা তাই হারানের সঙ্গে আত্মীয়তা করিতে পারে নাই হারানের কাছে অনুগ্রহ দাবী করিতে আজো তাহার লজ্জা করে। বিধানের চিকিৎসা ও ওষুধের বিনিময়ে কাঞ্চন মুদ্রা দিবার অক্ষমতা জানাইবার সময় হারান ডাক্তারের কাছে শ্যামা তাই কাঁদিয়া ফেলিল।

বিধানের পরে অসুখে পড়িল বকুল। বকুলের অসুখ? বকুলের অসুখ এ বাড়িতে আশ্চর্য ঘটনা। মেয়েকে লইয়া পালাইয়া গিয়া সেই যে শীতল তাহার জ্বর করিয়া আনিয়াছিল সে ছাড়া জীবনে বকুলের কখনো সামান্য কাসিটুকু পর্যন্ত হয় নাই রোগ যেন পৃথিবীতে ওর অস্তিত্বের সংবাদই রাখিত না। সেই বকুলের কি অসুখ হইল এবার? ছোটখাট অসুখ তো ওর শরীরে আমল পাইবে না। প্রথম ক'দিন দেখিতে আসিয়া হারান ডাক্তার কিছু বলিল না, তারপর রোগের নামটা শুনাইয়া শ্যামাকে সে আধমরা করিয়া দিল। বকুলের টাইফয়েড হইয়াছে।

জান মা, এই যে কলকেতা শহর এ হ'ল টাইফয়েডের ডিপো, এবার যা সুরু হয়েছে চাদ্দিকে জীবনে এমন আর দেখিনি, তিরিশ বছর ডাক্তারি করছি সাতটি টাইফয়েড রোগির চিকিচ্ছে কখনো আর করিনি এক সঙ্গে—এই প্রথম।

এমনি, ছেলেদের চেয়ে বকুলের সম্বন্ধে শ্যামা ঢের বেশি উদাসীন হইয়া থাকে সেবাযত্নের প্রয়োজন মেয়েটার এত কম নিজের অস্তিত্বের আনন্দেই মেয়েটা সর্বদা এমন মশগুল যে ওর দিকে তাকানোর দরকার শ্যামার হয় না। কিন্তু বকুলের কিছু হইলে শ্যামা সুদ সমেত তাহাকে তাহার প্রাপ্য ফিরাইয়া দেয়, কি যে সে উতলা হইয়া ওঠে বলিবার নয়। বকুলের অসুখে সংসার তাহার ভাসিয়া গেল কে রাঁধে কে খায়, কোথা দিয়া কি ব্যবস্থা হয়, কোন দিকে আর নজর রহিল না, অনাহারে অনিদ্রায় সে মেয়েকে লইয়া পড়িয়া রহিল। এদিকে রাণীও বকুলের প্রায় তিন দিন পরে একই রোগে শয্যা লইল। মামা কোথা হইতে একটা খোট্টা চাকর আর উড়িয়া বামুন যোগাড়

করিয়া আনিল, পোড়া ভাত আর অপক্ক ব্যঞ্জন খাইয়া মামা, বিধান আর মণির দশা হইল রোগির মত, শ্যামার কোলের ছেলেটি অনাদরে অনাদরে মরিতে বসিল। বালক ও শিশুদের চেয়ে কষ্ট বোধ হয় হইল মামারই বেশি। দায়িত্ব, কর্ত্তব্য আর পরিশ্রম, মামার কাছে এই তিনটিই ছিল বিষের মত কটু, মামা একেবারে হাঁপাইয়া উঠিল। এতকাল শ্যামার সচল সংসারকে এখানে ওখানে সময় সময় একটু ঠেলা দিয়াই চলিয়া যাইতেছিল, এবার অচল বিপর্যস্ত সংসারটি মামাকে যেন গ্রাস করিয়া ফেলিতে চাহিল, তারপর রহিল অসুখের হাঙ্গামা, ছুটাছুটি, রাতজাগা, দুর্ভাবনা এবং আরও কত কিছু। ওদিকে রাণীর খবরটাও মাঝে মাঝে মামাকে লইতে হয়, ন'দিনের দিন মামা লুকাইয়া কলিকাতা হইতে একজন ডাক্তার আনিয়াছিল, রাণীর কতকগুলি খারাপ উপসর্গ দেখা দিয়াছে, সে বাঁচিবে কিনা সন্দেহ। দীর্ঘ যাযাবর জীবনে ভদ্র অভদ্র মানুষের ভেদাভেদ মামার কাছে ঘুচিয়া গিয়াছিল, কত অস্পৃশ্য পরিবারের সঙ্গে মামা সপ্তাহ মাস পরমানন্দে যাপন করিয়াছে,—যেটুকু ভাসা ভাসা স্নেহ করিবার ক্ষমতা মামার আছে রাণী কেন তাহা পাইবে না? রাণী মরিবে জানিয়া মামার ভাল লাগে না, বহুকাল আগে শ্যামার বিবাহ দিয়া শূন্য ঘরে যে বেদনা ঘনাইয়া আসিয়া মামাকে গৃহছাড়া করিয়াছিল যেন তারই আভাস মেলে। আর বকুল? শ্যামার মেয়েটাকে নিস্পৃহ সন্ন্যাসী মামা কি এত ভালবাসিয়াছে যে ওর রোগ-কাতর মুখখানি দেখিলে সে পীড়া বোধ করে, তাহার ছুটিয়া পালাইতে ইচ্ছা হয় অরণ্যে প্রান্তরে, দূরতম জনপদে, -মানুষের হৃদয় যেখানে স্বাধীন, শোক দুঃখ স্নেহ ভালবাসার সঙ্গে মানুষের যেখানে সম্পর্ক নাই? মামার মুখ দেখিয়া শ্যামা সময় সময় ভয় পাইয়া যায়। বকুলের অসুখের ক'দিনেই মামা যেন আরও বুড়া হইয়া পড়িয়াছে। মিনতি করিয়া মামাকে সে বিশ্রাম করিতে বলে, যুক্তি দেখাইয়া বলে যে মামার যদি কিছু হয় তবে আর উপায় থাকিবে না। কিন্তু মামা যেন কেমন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া গিয়াছে, সে বিশ্রাম করিতে পারে না, প্রয়োজনের খাটুনি খাটিয়া তো সারা হয়ই, বিনা প্রয়োজনেও খাটিয়া মরে।

রাণী যথাসময়ে মারা গেল, বকুলের সেদিন জ্বর ছাড়িয়াছে। বর্ষার সেটা খাপছাড়া দিন,—কি রোদ বাহিরে, মেঘশূন্য কি নির্মল আকাশ!

কেবল শ্যামার নিদ্রাতুর আরক্ত চোখে জল আসে। এ ক'দিন শ্যামা যেন ছিল একটা কামনার রূপক, সন্তানকে সুস্থ করার একটি জ্বলন্ত ইচ্ছা-শিখা-- আজ তাহাকে চেনা যায় না। চোদ্দ দিনে বকুলের জ্বর ছাড়িয়াছে? কিসের চোদ্দ দিন,—চোদ্দ যুগ।

শ্রাবণের শেষে মামা একদিন দোকানটা বেচিয়া দিল। দোকান করা মামার পোষাইল না। ভদ্রলোক দোকান করিতে পারে? শ্যামা হাসিয়া বলিল, তখনি বলেছিলাম মামা, দিও না দোকান তুমি কেন দোকান চালাতে পারবে? —কত টাকা লোকসান দিলে?

মামা বলিল, লোকসান দেব আমি? কি যে তুই বলিস শ্যামা।

তাহ'লে কত টাকা লাভ হ'ল তাই বল?

না লাভ হয় নি, টায় টায় দেনা-পাওনায় মিল খেয়েছে, ব্যস্। যে দিনকাল পড়েছে শ্যামা, আমি বলে তাই, আর কেউ হ'লে ঘর থেকে টাকা ঢেলে খালি হাতে ফিরে আসত কত কোম্পানী এবার লালবাতি জেলেছে জানিস?

দোকান বেচিয়া মামা এবার করিবে কি? যে দুর্নিরীক্ষ্য উৎস হইতে দরকার হইলেই দশ বিশটা টাকা উঠিয়া আসে চিরকাল তাহা টিঁকিবে তো? মামা কিছু বলে না। করুণভাবে মামা শুধু একটু হাসে উৎসুক চোখে আকাশের দিকে তাকায়। শরৎ মানুষকে ঘরের বাহির করে বর্ষান্তে নব-যৌবনা ধরণীর সঙ্গে মানুষের পরিচয় কাম্য কিন্তু বর্ষা তো এখনো শেষ হয় নাই মামা ওই দেখো আকাশে নিবিড় কালো সজল মেঘ শরৎ কোথায় যে তুমি দেশে দেশে নিজের মনের মতো জায়গায় যাইতে চাও? মামার বিষণ্ণ হাসি, উৎসুক চোখ শ্যামাকে ব্যথা দেয়। শ্যামা ভাবে কিছু করিতে না পারিয়া হার মানার দুঃখে মামা ম্রিয়মাণ হইয়া গিয়াছে, ভাগ্নীর ভার লইবে বলিয়া অনেক আস্ফালন করিয়াছিল কিনা এখন তাহার লজ্জা আসিয়াছে। চোরের মত মামা তাই অস্বস্তিতে উসখুস করে। আহা বুড়া মানুষ সারাটা জীবন ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাটাইয়া আসিয়া সংসারের পাকা উপার্জনে অভ্যস্ত লোক গুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কেন পারিয়া উঠিবে? টাকা তো পথে ছড়ানো নাই। ঘরে ঘরে যুবক বেকার হাহাকার করিতেছে। ষাট বছরের ঘর-ছাড়া

বিবাগী এতগুলি প্রাণীর জীবিকা অর্জনের পথ খুঁজিয়া পাইবে কোথায়? শ্যামা বড় মমতা বোধ করে। বলে অত ভেবো না মামা, ভগবান যাহোক একটা উপায় করবেন।

ভগবান? মামার বোধ হয় ভগবানের কথা মনে ছিল না। ভগবান যে মানুষের যাহোক একটা উপায় করেন এও বোধ হয় এতদিন তাহার খেয়াল থাকে নাই। শ্যামা মনে পড়াইয়া দিলে মামা বোধ হয় নিশ্চিন্ত মনেই শ্যামা ও তাহার চারিটি সন্তানকে ভগবানের হাতে সমর্পণ করিয়া ভাদ্রের তিন তারিখে নিরুদ্দেশ হইয়া গেল। যাওয়ার আগে শুধু বলিয়া গেল, কিছু মনে করিস নে শ্যামা তোর সেই হাজার টাকাটা খরচ করে ফেলেছি,—শ' দেড়েক মোটে আছে নে। বুড়ো মামাকে শাপ দিস্‌নে মা একটি টাকা মোটে আমি সঙ্গে নিলাম।

শাপ শ্যামা দেয় নাই পাগলের মত কি যেন সব বলিয়াছিল। কথাগুলি মিষ্টি নয় কোন ভাগ্নীই সাধারণত মামাকে ওসব কথা বলে না। ক্যাম্বিশের ব্যাগটি হাতে করিয়া কম্বলের গুটানো বিছানাটা বগলে করিয়া মামা যখন চলিয়া গেল শ্যামা তখনও পাগলের মত কি সব যেন বলিতেছে।

সাত

পরের বছর শরৎ কালে—শ্যামা প্রথম সন্তানের জননী হওয়ার সময় পৃথিবীতে শরৎ কালটা যেমন ছিল এখনো তেমনি থাকার মত আশ্চর্য শরৎকালে—ছেলেমেয়েদের সঙ্গে লইয়া শ্যামা বনগাঁ গেল। বলিল ঠাকুরঝি আমার আর তো কোথাও আশ্রয় নেই খেতে না পেয়ে আমার ছেলেমেয়ে মরে যাবে ওদের তুমি দুটি দুটি খেতে দাও আমি তোমার বাড়ি দাসী হয়ে থাকব।

মন্দা মুখ ভার করিয়া বলিল, এসেছ থাকো, ওসব বোলো না বৌ। তোমাদের কথা আমি ভালবাসি নে।

শ্যামা বনগাঁয়ে রহিয়া গেল।

শ্যামার গত বছরের ইতিহাস বিস্তারিত লিখিলে সুখপাঠ্য হইত না বলিয়া ডিঙাইয়া আসিয়াছি ঃ এ তো দারিদ্র্যের কাহিনী নয়। শ্যামা যে একবার দুদিন উপবাস করিয়াছিল সে কথা লিখিয়া কি হইবে? ব্রত-পূজা করিয়া কত জননী অমন অনেক উপবাস করে, শ্যামা খাদ্যের অভাবে করিয়াছিল বলিয়া তো উপবাসের সঙ্গে উপবাসের পার্থক্য জন্মিয়া যাইবে না? শ্যামার গহনাগুলি গিয়াছে। বিবাহের সময় মামা শ্যামাকে প্রায় হাজার টাকার গহনাই দিয়াছিল, নিজের প্রেস বিক্রয় করিয়া শীতলের দীর্ঘকাল বেকার বসিয়া থাকাব সময় চুড়ি হার বালা আর নাক ও কানের দু'টি একটি ছুটকো গহনা ছাড়া বাকি সব গিয়াছিল, কমল প্রেসের চাকরির সময় দোতালায় ঘর তুলিবার ঝোঁকে শ্যামা টাকা জমাইয়াছে, হাঙরমুখো পুরানো প্যাটার্নের বালা ভাঙিয়া আর একটু ভারি তারের বালা গড়ানো ছাড়া নতুন কোন গহনা সে কখনো করে নাই। এক বছরেই তাই ঘরের বিক্রয়যোগ্য আসবাবের সঙ্গে শ্যামার গহনাগুলিও গিয়াছে। থাকিবার মধ্যে আছে একটি আংটি আর দুহাতে দু'গাছি চুড়ি।

বিধানকে বড়লোকের স্কুল হইতে ছাড়াইয়া কাশীপুরের সাধারণ স্কুলটিতে ভর্তি করিয়া দিয়াছিল, বিধান হাঁটিয়াই স্কুলে যাইত। ধোপার সঙ্গে শ্যামা কোন সম্পর্ক রাখিত না, বাড়িতে সিদ্ধ করিয়া কাপড় জামা সাফ করিত,—কাপড় জামা দুই সে কিনিত কম দামি, মোটা, টিকিত অনেক দিন। খোকার জন্য দুধ কিনিত এক পোয়া, দু' বছর বয়সের আগেই খোকা দিব্যি ভাত খাইতে শিখিয়াছিল, পেট ভরিয়া খাইয়া টিং টিংএ পেটটি দুলাইয়া দুলাইয়া শ্যামার পিছু পিছু সে হাঁটিয়া বেড়াইত,—শ্যামা তাহাকে স্তন দিত সেই অপরাহ্ণে, সারাদিন বুকে যে দুধটুকু জমিত বিকালে তাহাতেই খোকার পেট ভরিয়া যাইত। কত হিসাব ছিল শ্যামার, ব্যাপক ও বিস্ময়কর! ভাতের ফেনটুকু রাখিলে যে ভাতের পুষ্টি বাড়ে এটুকু পর্যন্ত সে খেয়াল রাখিত। তাহার এই আশ্চর্য হিসাবের জন্য ছোট খোকার পেটটা একটু বড় হওয়া ছাড়া ছেলেমেয়েদের কারো শরীর তেমন খারাপ হয় নাই। রোগা হইয়াছে শুধু শ্যামা। শেষের দিকে শ্যামার যে মখমলের মত মসৃণ উজ্জ্বল চামড়াটি দেখা

দিয়াছিল তাহা মলিন বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। এক বছরে কারো বয়স এক বছরের বেশি বাড়ে না, শ্যামারও বাড়ে নাই, কিন্তু তাহাকে দেখিয়া কে তাহা ভাবিতে পারিবে। গত যে বসন্ত ব্যর্থ গিয়াছে তার আগেরটি উতলা করিয়াছিল কোন্ শ্যামাকে? বনগাঁয়ে এই যে শীর্ণা নিষ্প্রভজ্যোতি শ্রান্ত নারীটি আসিয়াছে, শহরতলীর সেই বাড়িটির দোতালায় সমাপ্তপ্রায় নতুন ঘরটির ছায়ায় দাঁড়াইয়া বসন্তের বাতাসে ধানকলের ছাই উড়িতে দেখিয়া জেলের কয়েদী স্বামীর জন্য এরই যৌবন কি ক্ষোভ করিয়াছিল?

শেষের দিকে পরাণ ডাক্তার বারো টাকা ভাড়ায় একতলাতে একটি ভাড়াটে জুটাইয়া দিয়াছিল, সরকারী আফিসের এক কেরাণী, সম্প্রতি স্ত্রী ও শিশুপুত্র লইয়া দাদার সঙ্গে পৃথক হইয়া আসিয়াছে। কেরাণী বটে কিন্তু বড়ই তাহারা বিলাসী। হাঁড়ি কলসী, পুরানো লেপ-তোষক, ভাঙ্গা রঙচটা বাক্স প্রভৃতিতে শ্যামার ঘর ভরা থাকিত, ওরা আসিয়া ঝকঝকে সংসার পাতিয়া বসিল, জিনিসপত্র তাহাদের বেশি ছিল না কিন্তু যা ছিল সব দামী ও সুদৃশ্য। বৌটি শ্যামা শুনিল বড়লোকের মেয়ে, স্কুলেও নাকি পড়িয়াছিল, স্বাধীন ভাবে একটু ফিটফাট থাকিতে ভালবাসে—বড় ভাইএর সঙ্গে ওদের পৃথক হওয়ার কারণটাও তাই। পৃথক হইয়া বৌটি যেন বাঁচিয়াছে। নিজের সংসার পাতিতে কি তাহার উৎসাহ! পথের দিকে যে ঘরে শ্যামা আগে শুইত তার জানালায় জানালায় সে নতুন পর্দা দিল, চিকণ কাজ করা দামী খাটটি, বোধ হয় বিবাহের সময় পাইয়াছিল, দক্ষিণের জানালা ঘেঁসিয়া পাতিল, আয়না বসানো টেবিলটি রাখিল ঘরে ঢুকিবার দরজার সোজা অপর দিকের দেয়ালের কাছে। খাট টেবিল আর কাঠের একটি চেয়ার তাহার সমগ্র আসবাব, তাই যেন তার ঢের। ভাঁড়ারে তাকের উপর মসলাপাতি রাখিবার কয়েকটি নতুন চকচকে টিন, কাঁচের জার, ষ্টোভ, চায়ের বাসন আর দুটি একটি টুকিটাকি জিনিস রাখিয়া, রাখিবার আর কিছুই তাহার রহিল না, সমস্ত ঘরে একটি রিক্ত পরিচ্ছন্নতা ঝক ঝক করিতে লাগিল। সংসার করিতে করিতে একদিন হয় ত সে শ্যামার মতই ঘরবাড়ি জঞ্জালে ভরিয়া ফেলিবে, সুরুতে আজ সবই তাহার আনকোরা ও সংক্ষিপ্ত। বাড়াবাড়ি ছিল শুধু তাহাদের প্রেমের। এমন নির্লজ্জ নিবিড় প্রেম শ্যামা জীবনে আর দ্যাখে

নাই। বিবাহ তাহাদের হইয়াছিল চার পাঁচ বছর আগে এতকাল কে যেন তাহাদের প্রেমের উৎস মুখটিতে ছিপি আঁটিয়া রাখিয়াছিল, এখানে মুক্তি পাইয়া তাহা উথলিয়া উঠিয়াছে। ভাল শ্যামার লাগিত না। নিরানন্দ বিমর্ষ তাহার জীবন, সন্তানের তাহার অন্নবস্ত্রের অভাব, তারই পায়ের তলে তারই বাড়ির একতলায় এ কি বিসদৃশ প্রণয়-রস-রঙ্গ? কই, বয়সকালে শ্যামা তো ওরকম ছিল না? স্বামীর সঙ্গে মেয়েমানুষের এত কি ছেলেমানুষী, হাসা-হাসি, খেলা ও ছল করা কলহ? একটি ছেলে হইয়াছে, সম্মুখে অন্ধকার ভবিষ্যত, কত দুশ্চিন্তা কত দায়িত্ব ওদের, এমন হাল্কা ফাজলামিতে দিন কাটাইলে চলিবে কেন?

বৌটির নাম কনকলতা। শ্যামা জিজ্ঞাসা করিত, তোমার স্বামী কত মাইনে পান?

কনক বলিত, কত আর পাবে, মাছিমারা কেরাণী তো, বেড়ে বেড়ে নব্বইএর মত হয়েছে,—খরচ চলে না দিদি। একটা ছেলে পড়ালে আরও কিছু আসে, আমি বারণ করি,—সারাদিন আপিস করে আবার ছেলে পড়াবে না কচু,—কি হবে বেশি টাকা দিয়ে? যা আসে তাই ঢের,—নয়? মাসের শেষে বড্ড টানাটানি পড়ে দিদি, খরচ চলে না।

কনক এমনিভাবে কথা বলিত, উল্টাপাল্টা পূব পশ্চিম। বলিত, একা স্বাধীনভাবে সে মহা স্ফূর্তিতে আছে, আবার বলিত একা একা থাকতে ভাল লাগে না দিদি, আত্মীয় স্বজন দু'চারটি কাছে না থাকলে বড্ড যেন ফাঁকা-ফাঁকা লাগে,—নয়? শ্যামা বুঝিত, আনন্দে আহ্লাদে সোহাগে সে ডগমগ, কথা সে বলে না শুধু বকবক করে, ওর কথার কোন অর্থ নাই। কনকের বয়স বোধ হয় ছিল কুড়ি বাইশ বছর, শ্যামা যে বয়সে প্রথম মা হইয়াছিল, —এই বয়সে বৌটির অবিশ্বাস্য খুকী-ভাবে শ্যামা থ' বনিয়া যাইত, কেমন রাগ হইত শ্যামার। মেয়েমানুষ এমন নির্ভয়, এমন নিশ্চিন্ত, এমন আহ্লাদী? এই বুদ্ধি-বিবেচনা লইয়া সংসারে ও টিঁকিবে কি করিয়া? বড়লোকের মেয়ে বুঝি এমনি অসার হয়?

তবু, বিরুদ্ধ সমালোচনা-ভরা শ্যামার মন, কি দিয়া কনক যেন আকর্ষণ করিত। চৌবাচ্চার ধারে ওরা যখন পরস্পরের গায়ে জল ছিটাইয়া

হাসিয়া লুটাইয়া পড়িত কনকের স্বামী যখন তাহাকে শূন্যে তুলিয়া চৌবাচ্চায় একটা চুবানি দিয়া আবার বুকে করিয়া ঘরে লইয়া যাইত, খানিক পরে শুকনো কাপড় পরিয়া আসিয়া কনকের কাজের ছন্দে আবার অকাজের ছন্দ মিশিতে থাকিত তখন শ্যামার—কে জানে কি হইত শ্যামার চোখের জল গাল বাহিয়া তাহার মুখের হাসিতে গড়াইয়া আসিত।

কনকের স্বামী আপিস গেলে সে নীচে নামিয়া বলিত সব দেখে ফেলেছি কনক।

কনকের লজ্জা নাই সে হাসিয়া ফেলিত জ্বালিয়ে মারে দিদি, আপিস গেলে যেন বাঁচি।

দোতালার ঘরখানা আর ছাদটুকু ছিল শ্যামার গৃহ জিনিসপত্র সহ সে বাস করিত ঘরে রাঁধিত ছাদে একখানা করোগেটেড টিনের নীচে। পাশে শুধু নকুড়বাবুর ছাদ নয় আশে পাশের আরও কয়েক বাড়ির ছাদ হইতে উদয়াস্ত শ্যামার সংসারের গতিবিধি দেখা যাইত। প্রথম প্রথম অনেকগুলি কৌতূহলী চোখ দেখিতেও ছাড়িত না যখন তখন ছাদে উঠিয়া নকুড়বাবুর বৌ জিজ্ঞাসা করিত কি করছ বকুলের মা? শ্যামা বলিত রাঁধছি দিদি— বলিত সংসারের কাজকর্ম করছি দিদি – কি রাঁধলেন এবেলা? রাঁধিত এবং সংসারের কাজকর্ম করিত শ্যামা আর কিছু করিত না? ধানকলের ধুমোদ্গারী চোঙটার দিকে চাহিয়া থাকিত না? রাত্রে ছেলেমেয়েরা ঘুমাইয়া পড়িলে জাগিয়া বসিয়া থাকিত না হিসাব করিত না দিন মাস সপ্তাহের টাকা আনা পয়সার?

উদভ্রান্ত চিন্তাও শ্যামা করিত নিশ্বাসও ফেলিত। জননীত্ব কেমন যেন নীরস অর্থহীন মনে হইত শ্যামার কাছে। কোথায় ছিল এই চারটি জীব কি সম্পর্ক ওদের সঙ্গে তাহার অসহায়া স্ত্রীলোক সে মেরুদণ্ড বাঁকানো এ ভার তার ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছে কেন? কিসের এই অন্ধ মায়া? জগজ্জননী মহামায়া কিসের ধাঁধাঁয় ফেলিয়া তাহাকে দিয়া এত দুঃখ বরণ করাইতেছেন? সুখ কাকে বলে একদিনের জন্য সে তাহা জানিতে পারিল না তাহার একটা প্রাণ নিঙড়াইয়া চারটি প্রাণীকে সে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে—কেন? কি লাভ তাহার? চোখ বুজিয়া সে যদি আজ কোথাও চলিয়া যাইতে পারিত।—ওরা

দুঃখ পাইবে, না খাইয়া হয়ত মরিয়া যাইবে, কিন্তু তাহাতে কি আসিয়া যায় তার? সে তো দেখিতে আসিবে না! পেটের সন্তানগুলির প্রতি শ্যামা যেন বিদ্বেষ অনুভব করিত,—সব তাহার শত্রু, জন্ম-জন্মান্তরের পাপ! কি দশা তাহার হইয়াছে ওদের জন্য!

শেষের দিকে শ্যামা আর চালাইতে পারিত না, মাসিক বারো টাকায় এতগুলি মানুষের চলে না। তাই কুড়ি টাকা ভাড়ায় সমস্ত বাড়িটা কনক-লতাকে ছাড়িয়া দিয়া সে বনগাঁয় রাখালের আশ্রয়ে চলিয়া আসিয়াছে।

বড় রাস্তা ছাড়িয়া ছোট রাস্তা, পুকুরের ধারে বিঘা পরিমাণ ছোট একটি মাঠ, লাল ইঁটের একতলা একটি বাড়ি ও কলাবাগানের বেড়ার মধ্যবর্তী দুহাত চওড়া পথ, তারপর রাখালের পাকা ভিত্, টিনের দেয়াল ও শণের ছাউনির বৈঠকখানা। তিনখানা তক্তপোষ একত্র করিয়া তার উপরে সতরঞ্চি বিছানো আছে। তিন জাতের মানুষের জন্য হুঁকা আছে তিনটি। কাঠের একটা আলমারিতে পুরাতন বিবর্ণ দপ্তর, কাঠের একটি বাক্সের সামনে শীর্ণকায় টিকিসমেত একজন মুহুরি। রাখালের মুহুরি? নিজে সে সামান্য চাকরি করে, মুহুরি দিয়া তাহার কিসের প্রয়োজন? বাহিরের ঘরখানা দেখিলেই সন্দেহ হয় রাখালের অবস্থা বুঝি খারাপ নয়, অনেকটা উকিল মোক্তারের কাছারি ঘরের মত তাহার বৈঠকখানা। বৈঠকখানার পরেই বহিরাঙ্গন, সেখানে দুটো বড় বড় ধানের মরাই। তারপর রাখালের বাসগৃহ, আটদশটি ছোট বড় টিনের ঘরের সমষ্টি, অধিবাসীদের সংখ্যাও বড় কম নয়।

ক'দিন এখানে বাস করিয়াই শ্যামা বুঝিতে পারিল রাখাল তাহাকে মিথ্যা বলিয়াছিল, সে দরিদ্র নয়। মধ্যবিত্তও নয়। সে ধনী। চাকরী রাখাল সামান্য মাহিনাতেই করে কিন্তু সে অনেক জমিজমা করিয়াছে, বহু টাকা তাহার সুদে খাটে। রাখালের সম্পত্তি ও নগদ টাকার পরিমাণটা অনুমান করা সম্ভব নয়, তবু সে যে উঁচুদরের বড়লোক চোখ কান বুজিয়া থাকিলেও তাহা বোঝা যায়। মোটরগাড়ি, দামি আসবাব, গৃহের রমণীবৃন্দের বিলাসিতার উপকরণ গ্রাম্য গৃহস্থের ধনবত্তার পরিচয় নয়, তাহাদের অবস্থাকে ঘোষণা করে

পোষ্যের সংখ্যা ধানেব মবাই খাতকেব ভিড। বাখালেব তিনটি জোড়া তক্তপোষ সকালবেলা খাতকেব ভিড়ে ভবিষা যাষ।

দেখিয়া শুনিযা শ্যামা নিশ্বাস ফেলিল। রাগ ও বিদ্বেষ এবাব যেন তাহাদেব হইল না অনেক অভিজ্ঞতা দিযা শ্যাম এখন বুঝিতে পারিষাছে রাখাল একা নয এমনি জগৎ। এমন কবিযা মিথ্যা বলিতে না জানিলে, ছল ও প্রবঞ্চনায এমন দক্ষতা না জন্মিলে সকালে উঠিযা দশ বিশটি খাতকের মুখ দেখিবাব সৌভাগ্য মানুষেব হয না। বাখালেব দোষ নাই। মানুষেব মাঝে মানুষেব মত মাথা উঁচু কবিবাব একটিমাত্র যে পন্থা আছে তাই সে বাছিযা নিযাছে। রাখাল তো ধর্মযাজক নয বিবাগী সন্ন্যাসী নয সে সংসাবী মানুষ, সংসাবে দশজনে যে ভাবে আত্মোন্নতি কবে সেও তেমনিভাবে অর্থসম্পদ সঞ্চয কবিযাছে।

শ্যামা সব জানে। বড়লোক হইবাব সমস্ত কলা কৌশল। কেবল স্ত্রীলোক কবিযা ভগবান তাহাকে মাবিযা রাখিযাছেন!

রাখালেব দ্বিতীয পক্ষেব বৌ সুপ্রভাকে দেখিযা প্রথমে শ্যামা চোখ ফিবাইতে পাবে নাই। বাখালেব দুবাব বিবাহ কবাব কাবণটাও তখন সে বুঝিতে পাবিযাছিল। এত রূপ দেখিলে মাথাব ঠিক থাকে পুরুষ মানুষেব! একটি ছেলে আব একটি মেযে হইযাছে সুপ্রভাব শ্যামা আসিবাব আগে সে নাকি অনেকদিন অসুখেও ভুগিযাছিল তবু এখনো সে ছবিব মত প্রতিমাব মত সুন্দরী। এমন সতীন থাকিতে মন্দা যে কেমন কবিযা এখানে গৃহিণীর পদটি অধিকাব কবিযা আছে, চাবিদিকে সকলকে হুকুম দিযা বেডাইতেছে—সুপ্রভাকে পর্যন্ত ভাবিযা প্রথমটা শ্যামা আশ্চর্য হইযা গিযাছিল। তাবপব সে টের পাইযাছে যতই রূপ থাক সুপ্রভার বুদ্ধি নাই বড় সে বোকা। পুতুলেব মত সে পবেব হাতে নডে চড়ে সাহস কবিযা যে তাহাব উপর কর্তৃত্ব কবিতে যায তাবই কর্তৃত্ব স্বীকাব কবে একেবাবে সে মাটিব মানুষ, ঘোবপ্যাঁচ বোঝে না নিজেব পাওনা গণ্ডা বুঝিযা লইতে জানে না। তবু বাখাল কিনা আজও ছোটবৌ বলিতে অজ্ঞান, মনে মনে সকলেই সুপ্রভাকে ভয কবে এ বাড়িতে আদবেব তাহাব সীমা নাই। সুপ্রভা প্রভুত্ব কবাব চেযে নির্ভর কবিতেই ভালবাসে বেশি, আদব পাওযাটাই তাব জীবনে সব চেযে বড

প্রাপ্য। মন্দার গৃহিণীপনার ভিত্তিও ওইখানেই,—সুপ্রভাকে সে নয়নের মণি করিয়া রাখিয়াছে। কে বলিবে সুপ্রভা তাহার সতীন? স্নেহে যত্নে সুপ্রভার দিনগুলিকে সে ভরাট করিয়া রাখে, নিজের হাতে সে সুপ্রভাকে সাজায়, সুপ্রভার ঘরখানা সাজায়, সুপ্রভার শয্যা রচনা করিযা দেয়, সতীনের প্রতি স্বামীর গভীর ভালবাসাকে হাসিমুখে গ্রহণ করে।

সতীনের সংসারেও তাই এখানে কলহ-বিবাদ মান-অভিমান মন-কষাকষি নাই। মন্দা ভুলিয়া গিয়াছে সে বধূ। এই মূল্য দিয়া সে হইযাছে গৃহিণী।

কলিকাতার চেয়ে ঢের বেশি সুখেই শ্যামা এখানে বাস কবিতে লাগিল। পরের বাড়ি পরের আশ্রয়ে থাকিবার একটু যা লজ্জা। এখানে আসিবার আগে শ্যামা ভাবিয়াছিল এমন নিবুপায হইযা আত্মীয়ের বাড়ি যাইতেছে, পদে পদে কত অপমান সেখানে না জানি তাহার জুটিবে, এখানে কিছুদিন ভয়ে ভযে থাকিবার পর দেখিল গাযে পড়িয়া অপমান কেহ করে না, সে যে এখানে আশ্রিতা সময়ে অসময়ে সেটা মনে করাইযা দিবারও কেহ এখানে নাই, মানাইয়া চলিতে পারিলে এখানে বাস কবা কঠিন নয।

এখানকার গ্রাম্য আবহাওয়াটিও শ্যামাব বেশ লাগিল। শহরতলীর যে বাড়িতে বিবাহের পর হইতে এতকাল সে বাস করিয়াছিল সেখানটা শহবেব মত ঘিঞ্জি নয়, তবু সেখানে তাহারা যেন বন্দী-জীবন যাপন করিত, ইঁটেব অরণ্যের মধ্যে প্রকৃতির যেটুকু প্রকাশ ছিল তা যেন শহরেব পার্কেব মত ছেলে-ভুলানো ব্যাপার। তাছাড়া, সেখানে তাহারা ছিল কূণে, ঘবের কোণে নিজেদের লইয়া থাকিত, প্রতিবেশী থাকিয়াও ছিল না। এখানে জীবনের সঙ্গে জীবনের বড় নিবিড় মেশামিশি। মিতালি যেখানে নাই সেখানেও অজস্র মেলামেশা আছে, সহজ বাস্তব মেলামেশা, শহরের মেলামেশার মত কোমল ও কৃত্রিম নয়, খাঁটি জিনিস। শ্যামার ছেলেমেয়েরা যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে। এখানে তাহারা প্রকাণ্ড অঙ্গন পাইয়াছে, বাগান পুকুর পাইয়াছে, ধুলো-মাটিতে খেলা করার সুযোগ পাইয়াছে, আর পাইয়াছে সঙ্গী। বাড়িতেই শ্যামার প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের সাথী আছে, বিধানের জন্মের সময় মন্দা যে কোলের ছেলেটিকে লইয়া কলিকাতায় গিয়াছিল তার নাম অজয়, সকলে

অজু বলিযা ডাকে, বিধানের সঙ্গে তাহার খুব ভাব হইয়া গেল। অজয় এক-ক্লাশ নিচে পড়ে। পড়াশোনায বিধান বড় ভাল, মন্দার ছেলেদের মাস্টার একদিন বিধানকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া এই রায দিযাছেন। মন্দা জানিযা খুশি হইযাছে বিধান কলিকাতাব ছেলে বলিযা অজযেব সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠতায় মন্দাব যেটুকু ভয ছিল মাস্টাবেব মন্তব্য শোনাব পব আর তাহা নাই।

সুপ্রভা বকুলকে ভালবাসিযা ফেলিযাছে।

বলে, কি মেযে আপনাব বৌদিদি দিযে দিন মেযেটা আমাকে দেবেন?

বলে মেযে বলে ওকে কিছু শেখাচ্ছেন না এতো ভাল কথা নয? আজকালকাব দিনে লেখাপড়া গানটান না জানলে কে নেবে মেযেকে? একটু একটু সবি শেখাতে হবে ঠাকুরঝি।

সুপ্রভাই উদ্যোগ কবিযা বকুলকে মেযেস্কুলে ভর্তি কবিযা দিল, বলিল স্কুলেব মাহিনা সেই দিবে। গানটান শিখাইবার যখন উপায নাই, লেখাপড়াই একটু শিখুক। বকুলকে সে যত্ন কবে লুকাইযা ভাল জিনিস খাইতে দেয যে সব জিনিস শুধু মন্দা ও তাব ছেলেমেযেব জন্য বরাদ্দ। কিন্তু এবা বকুল ওসব খাইতে চায না বলে দাদাকে দাও, ভাইকে দাও? সুপ্রভা তাতে বড খুশি হয। কি নিস্বার্থপব মেযেটাব মন? যেমন দেখিতে সুন্দব তেমনি মিষ্টি স্বভাব ও যেন বাজবাণী হয ভগবান।

বাজবাণী? এতবাব সুপ্রভা এই আশীর্বাদেব পুনবাবৃত্তি কবে কেন, বকুলকে বাজবাণী কবিতে এত তাহাব উৎসাহ কিসেব? বাজবাণী হওযার সখ ছিল নাকি সুপ্রভাব মনে সেই ক্ষোভ বহিযা গিযাছে? কিছু বুঝিবাব উপায নাই। সুপ্রভাকে অসুখী মনে হয কদাচিৎ। চুপচাপ বসিযা সে অনেক সময়ই থাকে সেটা তাব স্বভাব মুখ তাহাব সব সময বিমর্ষ দেখায না, চোখে তাহাব সব সময ঘনাইযা আসে না উৎসুক দিবা-স্বপ্নাতুবাব দৃষ্টি। তবু শ্যামা মাঝে মাঝে সন্দেহ কবে। অত যাব বুপ সে কি একেবাবেই নিজেব মূল্য জানে না, কুমাবী জীবনে আশা কি সে কবে নাই কল্পনা কি তাব ছিল না? বুড়া বযসে রাখাল যখন তাহাকে বিবাহ কবিযা তিন পুত্রের জননী সতীনের সংসারে আনিযাছিল গোপনে সে কি দু'এক বিন্দু অশ্রুপাত করে নাই?

বাড়ি ভাড়াব কুড়িটা টাকা নিয়মিত আসে। দু'মাস টাকা পাঠাইয়া কনক একবাব শ্যামাকে একখানা পত্র লিখিল। পাশে কোন বাড়িতে বিদ্যুতের আলো নেওয়া হইতেছে, দেখিয়া কনকেব সখ জাগিযাছে তাবও বিদ্যুতেব আলো চাই। বাড়িটা তাদেব পছন্দ হইয়াছে স্থায়িভাবে তাবা ওখানে রহিয়া গেল, এক কাজ করিলে হয না দিদি? খবচপত্র কবিযা তারা বিদ্যুৎ আনাক মাসে মাসে বাড়ি ভাড়াব টাকায সেটা শোধ হইবে? এই পত্র পাইয়া শ্যামা বড চিন্তায পড়িযা গেল। এখানে তাহাব নানা রকম খবচ আছে স্কুলের মাহিনা, জামাকাপড়—এসব তাহাকেই দিতে হয এটা ওটা খুচরা খরচও আছে অনেক বাড়িভাড়াব টাকা না আসিলে সে কবিবে কি? অথচ বিদ্যুৎ আনিতে না দিলে ওরা যদি অন্য বাড়িতে উঠিযা যায? সঙ্গে সঙ্গে আবার কি ভাডাটে মিলিবে? শেষে শ্যামা মিনতি করিয়া কনককে চিঠি লিখিল। লিখিল ওই কুড়িটা টাকা তাহাব সম্বল ওই টাকা ক'টির জোরে সে পরের বাড়ি পড়িযা আছে বাড়িতে বিদ্যুৎ আনিবার তার ক্ষমতা কই? শ্যামা যে কি দুঃখে পড়িযাছে কনক যদি তাহা জানিত—

এ চিঠি ডাকে দিবারও প্রযোজন হইল না, কনকলতাব স্বামীব নিকট হইতে সবিনয নিবেদন ভনিতার আর একখানা পত্র আসিল শ্যামার বাড়ি হইতে আপিসে যাতাযাত কবা বডই অসুবিধা একটি ভাল বাড়ি পাওয়া গিযাছে শহবেব মধ্যে ইংবাজি মাসটা কাবাব হইলে তাহারা উঠিযা যাইবে। কলিকাতাব কেবাণী-ভাড়াটেব বাসা বদলানো বোগেব খবব তো শ্যামা জানিত না, তাহাব মুখ শুকাইযা গেল। কনকলতার উপর রাগ ও অভিমানেব তাহাব সীমা রহিল না। শ্যামাব সঙ্গে না তাহাব অত ভাব হইযাছিল দুঃখেব কথা বলিতে বলিতে শ্যামাব চোখে জল আসিলে সে না সান্ত্বনা দিযা বলিত ভেবো না দিদি ভগবান মুখ তুলে চাইবেন? শ্যামা কত নিবুপায সে তাহা জানে, কলিকাতায় বাড়িভাড়া কবিযাই সে থাকিবে তবু শ্যামাব বাড়িতে থাকিবে না। এতকাল অসুবিধা ছিল না, আজ হঠাৎ অসুবিধা হইযা গেল?

রাখালকে চিঠিখানা দেখাইযা শ্যামা বলিল, ঠাকুরজামাই, এবাব কি হবে? কুড়িটে করে টাকা পাচ্ছিলাম, ভগবান তাতেও বাদ সাধলেন।

রাখাল বলিল, আহা, কলকাতায় কি আর ভাড়াটে নেই। যাক না ওবা,

ফের ভাড়াটে আসবে,—ওপরে একখানা নিচে তিনখানা ঘর, কুড়ি টাকায় ও-বাড়ি লুপে নেবে না? পাড়ার কাউকে চিঠি দাও না?

হারান ডাক্তারকে শ্যামা একখানা পত্র লিখিয়া দিল। হারান জবাব দিল, ভয় নাই, বাড়ি শ্যামার খালি থাকিবে না, দু'এক মাসের মধ্যে আবার অবশ্যই ভাড়াটে জুটিবে।

ইংরাজি মাসের পাঁচ ছয় তারিখে শ্যামা ভাড়ার টাকার মণিঅর্ডার পাইত, এবার দশ তারিখ হইয়া গেল টাকা আসিল না। কনকলতারা কোথায় উঠিয়া গিয়াছে শ্যামা জানিত না, নিজের বাড়ির ঠিকানাতেই সে তাগিদ দিয়া চিঠি লিখিল, ভাবিল, পোস্টাপিসে ওরা কি আর ঠিকানা রাখিয়া যায় নাই? এ পত্রের কোন জবাব শ্যামা পাইল না।

মন্দা বলিল, দিচ্ছে ভাড়া! এতকাল যে দিয়েছিল তাই ভাগ্যি বলে জেনো বৌ! কলকাতার লোকে বাড়ি ভাড়া দেয় নাকি? একমাস দু'মাস দেয়, তারপর য'দিন পারে থেকে অন্য বাড়িতে উঠে যায়,—কর ভাড়া আদায় মোকদ্দমা করে!

শ্যামা বিবর্ণ মুখে বলিল, আমার যে একটি পয়সা নেই ঠাকুরঝি? আমি যে ওই ক'টা টাকার ভরসা ক'রছিলাম?

মন্দা বলিল, জলে তো পড়নি?

তারপর বলিল, বাড়িটা বেচে দিলেই তো পার বৌ? এত কষ্ট সয়ে ও বাড়ি রেখে করবে কি? থাকতেও তো পারছ না নিজে? টাকাটা হাতে এলে বরং লাগবে কাজে,—তারপর কপালে থাকে বাড়ি আবার হবে, না থাকে হবে না! দাদা বেরিয়ে এসে কিছু একটা করবে নিশ্চয়। নাও যদি করে বৌ, ছেলে তো উপযুক্ত হয়ে উঠবে তোমার বাড়ির টাকা শেষ হতে হতে,—তখন আর তোমার দুঃখ কিসের?

মুখখানা মন্দা ম্লান করিয়া আনিল, দুঃখের সঙ্গে বলিল, ও বাড়ি বেচতে বলতে আমার ভাল লাগছে ভেবো না বৌ,—আমার বাপের ভিটে তো। কিন্তু কি করবে বল? নিরুপায় হলে মানুষকে সব করতে হয়।

বাড়িটা বিক্রয় করিয়া ফেলার কথা শ্যামা ভাবিতেও পারে না। একটা বাড়ি না থাকিলে মানুষের থাকিল কি? দেশে একটা ভিটা থাকিলেও

শহরতলীর ওই বাড়িটা সে বিক্রয় করিয়া ফেলিতে পারিত, কিন্তু দেশ পর্যন্ত কি শ্যামার আছে! যে গ্রামে সে জন্মিয়াছিল তার কথা ভাল করিয়া মনেও নাই। মামার ভিটেখানা নিজের মনে করিয়াছিল, বেচিয়া দিয়া মামা নিরুদ্দেশ হইয়া গেল। স্বামীর ওই একরত্তি বাড়িটুকু সে পাইয়াছে, বুকের রক্ত জল করা টাকায় বাড়ির সংস্কার করিয়াছে, আজ তাও সে বিক্রি করিয়া দিবে? ও বাড়ির ঘরে ঘরে জমা হইয়া আছে তাহার বাইশ বছরের জীবন, ওইখানে সে ছিল বধূ, ছিল জননী, চারটি সন্তানকে প্রসব করিয়া ওইখানে সে বড় করিয়াছে, ও-বাড়ির প্রত্যেকটি ইঁট যে তার চেনা, দেয়ালের কোথায় কোন পেরেকের গর্তে কবে সে চুন লেপিয়া দিয়াছিল তাও যে তার স্মরণ আছে। পরের হাতে বাড়ি ছাড়িয়া দিয়া আসিতে তার মন যে কেমন করিয়াছিল, জগতে কে তা জানিবে। হায়, ও-বাড়ির প্রত্যেকটি ইঁটের জন্য শ্যামার যে অপত্য স্নেহ।

অথচ এদিকেও আর চলে না। নাই বলিয়া শ্যামার হাতে কিছুই যে নাই অপরে তাহা বিশ্বাস করে না, শ্যামাও মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না বকুলের জমানো একটি চকচকে আধুলি ছাড়া আর একটি তামার পয়সাও তাহার নাই। মাসকাবারে সুপ্রভা গোপনে বিধানের স্কুলের মাহিনাটা দিয়া দিল, চাহিলে সুপ্রভার কাছে আরও কিছু হয়ত পাওয়া যাইত, শ্যামার চাহিতে লজ্জা করিল। এবার বড় শীত পড়িয়াছে। বিধানের গরম জামা গতবার ছোট হইয়া গিয়াছিল, ছেলেটা হু হু করিয়া বড় হইয়া উঠিতেছে, এ-বছর নূতন একটা জামা কিনিয়া দিতে পারিলে ভাল হইত। আলোয়ানটাও তাহার ছিঁড়িয়া গিয়াছে। ওদের বেশ-ভূষা চাহিয়া দেখিতে শ্যামার চোখে জল আসে। বাড়িবার মুখে বছর বছর ওদের পোষাক বদলানো দরকার, পুরানো সেলাই-করা আঁটো জামা পরিয়া ওদের ভিখারির সন্তানের মত দেখায়, শুধু সাবান দিয়া জামাকাপড়গুলি আর যেন সাফ হইতে চায় না, কেমন লালচে রঙ ধরিয়া যায়। পূজার সময় রাখাল ওদের একখানি করিয়া তাঁতের কাপড় দিয়াছিল, মানাইয়া পরা চলে এমন জামা নাই বলিয়া বিধান লজ্জায় সে কাপড় একদিনও পরে নাই।

মনটা শ্যামা ঠিক করিতে পারে না। মন্দার কথাগুলি মনের মধ্যে

ঘুরিতে থাকে। রাখালের সঙ্গে একদিন সে এ বিষয়ে পরামর্শ করিল। রাখালও বাড়িটা বিক্রি করার পরামর্শই দিল। বলিল, বাড়িভাড়া দিবার হাঙ্গামা কি সহজ। অর্ধেক বছর বাড়ি হয়ত খালিই পড়িয়া থাকিবে, ভাড়াটে জুটিলেও ভাড়া যে নিয়মিত পাওয়া যাইবে তারও কোন মানে নাই, একেবারে না পাওয়াও অসম্ভব নয়। তারপর বাড়ির পিছনে খরচ নাই? পুরানো বাড়ি, মাঝে মাঝে মেরামত করিতে হইবে, বছর বছর চুনকাম করিয়া না দিলে ভাড়াটে থাকিবে না—ড্রেন নেওয়া হইয়াছে শ্যামার বাড়িতে? এবার হয়ত ড্রেন না লইলে কর্পোরেশন ছাড়িবে না, সে অনেক খরচের কথা, শ্যামা কোথা হইতে খরচ করিবে?

বাড়ি পোষা হাতী পোষার সমান বৌঠান, বাড়ি তুমি ছেড়ে দাও।

বিধান রাত প্রায় এগারোটা অবধি পড়ে, বকুল মণি ওরা ঘুমাইয়া পড়ে অনেক আগে। সেদিন রাত্রে শ্যামা বিধানকে বলিল খোকা সবাই যে বাড়ি বিক্রি করে দিতে বলছে বাবা?

বিধানের সঙ্গে শ্যামা আজকাল নানা বিষয়ে পরামর্শ করে, ভবিষ্যতের কত জল্পনা কল্পনা যে তাদের চলে তাহার অন্ত নাই। বিধান বলে, বড় হইয়া সে মস্ত চাকরি করিবে তারপর শঙ্করের মত একটা মোটর কিনিবে। শঙ্করের মোটর? শীতলের জেল হইবার পর শঙ্করের মোটরে তার যে স্কুলে যাওয়া বন্ধ হইয়াছিল সে অপমান বিধান কি মনে করিয়া রাখিয়াছে? রাত জাগিয়া তাই এত ওর পড়াশোনা? শীতলের কথা বিধান কখনো বলে না। পড়া শেষ করিয়া ছেলে শুইতে আসিলে শ্যামা কতদিন প্রতীক্ষা করিয়াছে, চুপি চুপি বিধান হয়ত জিজ্ঞাসা করিবে, বাবা কবে ছাড়া পাবে মা? কিন্তু কোনদিন বিধান এ প্রশ্ন করে না। যে তীব্র অভিমান ওর হয়ত বাপের জেল হওয়ার লজ্জা ওকে মূক করিয়া রাখে পরের বাড়ি তারা যে এভাবে পড়িয়া আছে, এজন্য বাপকে দোষী করিয়া মনে হয়ত ও নালিশ পুরিয়া রাখিয়াছে।

আলোটা নিভাইয়া শ্যামা বিধানের মাথার কাছে লেপের মধ্যে পা ঢুকাইয়া বসে। একপাশে ঘুমাইয়া আছে বকুল মণি ও ফণী এপাশে অবোধ বালক বুকে ক্ষোভ ও লজ্জা পুরিয়া এত রাত্রে জাগিয়া আছে। শ্যামা ছেলের বুকে একখানা হাত রাখে। বেড়ার ফুটা দিয়া জ্যোৎস্নার কতকগুলি রেখা

ঘরের ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছে। বাগানে শিয়ালগুলি ডাক দিয়া নীরব হইল। বেড়ার ব্যবধান পার হইয়া পাশের ঘরে রাখালের মামাতো বোন রাজবালাব স্বামীর সঙ্গে ফিস ফিস কথা শোনা যায়, রাজবালার স্বামী আদালতে পঁচিশ টাকায় চাকরী করে। পঁচিশ টাকায় অত ফিস ফিস কথা? শ্যামার স্বামী মাসে তিনশ' টাকাও রোজগার করিয়াছে, নিজের বাড়িতে নিজের পাকা শয়নঘরে স্বামীর সঙ্গে অত কথা শ্যামা বলে নাই।— আর ওই চাপা হাসি? শ্যামা শিহরিয়া ওঠে।

ক'দিন পরে শ্যামার বাড়ি-বিক্রয়-সমস্যার মীমাংসা হইয়া গেল। হারান ডাক্তার মণিঅর্ডারে পঁচিশটা টাকা পাঠাইয়া লিখিলেন, বাড়িতে তিনি নূতন ভাড়াটে আনিয়াছেন, তাঁর পরিচিত লোক। ভাড়া আদায় কবিয়া মাসে মাসে তিনিই শ্যামাকে পাঠাইয়া দিবেন।

শ্যামার মুখে হাসি ফুটিল। পঁচিশ টাকা? পাঁচ টাকা ভাড়া বাড়িয়াছে? এখন তাহার রাজবালার স্বামীর সমান উপার্জন! কপাল হইতে কয়েকটা দুশ্চিন্তার চিহ্ন এবার মুছিয়া ফেলা চলে।

মাসখানেক পরে একদিন সকালে কোথা হইতে শঙ্কর আসিয়া হাজির। গায়ে ব্লেজারের কোট, তলায় স্ট্রাইপ দেওয়া সার্ট, পরণে শান্তিপুরে ধুতি, পায়ে মোজা,—কলিকাতায় বোঝা যাইত না, এখানে তাহাকে শ্যামার ভারি বাবু মনে হইল, রাখালেব এই বাড়িতে। শ্যামা রাঁধিতেছিল, পরণের কাপড়খানা তাহার ছেঁড়া হলুদমাখা, হাতে দুটি শাঁখা ছাড়া কিছু নাই। কলিকাতা হইতে কে একটি ছেলে তার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে শুনিয়া সে কি ভাবিতে পারিয়াছিল সে শঙ্কর! শঙ্কর কেন বনগাঁ আসিবে?

শ্যামাকে শঙ্কর প্রণাম করিল। শ্যামার গর্বেব সীমা রহিল না। মোটা হলুদ-মাখা ছেঁড়া কাপড় পরণে? কি হইয়াছে তাহাতে! সুপ্রভা, মন্দা, রাজবালা সকলের কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে রাজপুত্র প্রণাম তো করিল তাহাকে! খুসি হইয়া শ্যামা বলিল, ষাট ষাট, বেঁচে থাক বাবা, বিদ্যাদিগ্‌গজ হও! কি আবেগ শ্যামার আশীর্বচনে! শঙ্করের মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া গেল।

তারপর শ্যামা জিজ্ঞাসা করিল, বনগাঁ এসেছ কেন শঙ্কর?

শঙ্কর বলিল, ক্রিকেট খেলতে এসেছি মাসিমা, এখানকার স্কুলের সঙ্গে আমাদের স্কুলের ম্যাচ।

শ্যামা, বিধান, মণি সকলেই শঙ্করকে দেখিয়া খুসি হইয়াছে। অভিমান করিয়াছে বকুল। পুজোর সময় আসব বলে এখন বাবু এলেন, বলিয়া সে মুখ ভার করিয়া আছে। কবে শঙ্কর বকুলের কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল পুজোর সময় সে বনগাঁ আসিবে সে খবর কেহ রাখিত না, বকুলের কথায় বড়রা হাসে, শঙ্কর শ্যামার দিকে চাহিয়া সলজ্জ ভাবে কৈফিয়ৎ দিয়া বলে, পুজোর সময় মধুপুর গেলাম যে আমরা!—তোকে চিঠি লিখিনি বিধান সেখান থেকে ?

বকুল অর্ধেক ক্ষমা করিয়া বলে, তোমার জিনিসপত্র কই ?

শঙ্কর বলে, বোর্ডিংএ আমাদের থাকতে দিয়েছে, সেখানে রেখেছি।

বকুল বলে, বোর্ডিং কি জন্যে, আমাদের বাড়ি থাক না ?

শঙ্কর মুখ নিচু করিয়া একটু হাসে। শ্যামা তাকায় মন্দার দিকে। শঙ্করকে এখানে থাকার নিমন্ত্রণ জানায় কিন্তু সুপ্রভা! প্রথমে শঙ্কর রাজি হয় না, ভদ্রতার ফাঁকা ওজর করে। কলিকাতার ছেলে সে, ওসব কায়দা তার দুরস্ত। শেষে সুপ্রভার হাসি ও মিষ্টি কথার কাছে পরাজয় মানিয়া সে আতিথ্য স্বীকার করে। লজ্জার যে আবরণটি লইয়া সে এ-বাড়িতে ঢুকিয়াছিল ক্রমে ক্রমে তাহা খসিয়া যায়, কানু ও কালুর সঙ্গে তাহার ভাব হয়, বিধানের পড়ার ঘরে খানিক হৈ-চৈ করিয়া উঠানে তাহারা মার্বেল খেলে, তারপর স্কুলের বেলা হইলে সকলে স্নান করিতে যায় পুকুরে। শ্যামা বারণ করিয়া বলে, সাঁতার জান না, তুমি পুকুরে যেও না শঙ্কর। জল তুলে এনে দিক, তুমি ঘরে স্নান কর।

শঙ্কর বলিয়া যায়, বেশি জলে যাব না মাসিমা।

তবু শ্যামার বড় ভয় করে। বিধান, বকুল, মণি এরা সাঁতার শিখিয়াছে, কালু ও কানু তো পাকা সাঁতারু, পুকুরের জল তোলপাড় করিয়া ওরা স্নান করিবে; উৎসাহের মাথায় শঙ্করের কি খেয়াল থাকিবে সে সাঁতার জানে না ? বাড়ির একজন চাকরকে সে পুকুরে পাঠাইয়া দেয়। খানিক পরে হৈ-চৈ

করিতে করিতে সকলে ফিরিয়া আসে, শঙ্কর আসে বিধান ও চাকরটার গায়ে ভর দিয়া এক পায়ে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে। শামুকে না কিসে শঙ্করের পা কাটিয়া দরদর করিয়া রক্ত পড়িতেছে।

বকুল দুরন্ত দুঃসাহসী মেয়ে, বকিলে, মারিলে, ব্যথা পাইলে সে কাঁদে না কিন্তু রক্ত দেখিলে সে ভয় পায়, ধুলো-কাদা ধুইয়া শ্যামা যতক্ষণ শঙ্করের পা বাঁধিয়া দেয় সে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে থাকে।

মন্দা ধমক দিয়া বলে, তোর পা কেটেছে নাকি, তুই অত কাঁদছিস কি জন্যে? কেঁদে মেয়ে একেবারে ভাসিয়ে দিলেন!

শঙ্কর বলে, কেঁদো না বুকু, বেশি কাটেনি তো!

আগে বিধান হয়ত শঙ্করের জন্য অনায়াসে সাতদিন স্কুল কামাই করিত, এখন পড়াশোনার চেয়ে বড় তাহার কাছে কিছু নাই, সে স্কুলে চলিযা গেল। কানু ও কালু কোন উপলক্ষে স্কুল কামাই করিতে পারিলে বাঁচে, অতিথির তদ্বিরের জন্য বাড়িতে থাকিতে তারা রাজি ছিল, মন্দার জন্য পারিল না। স্কুলে গেল না শুধু বকুল। সারা দুপুর এক মুহূর্তের জন্য সে শঙ্করের সঙ্গ ছাড়িল না। এ যেন তার বাড়ি-ঘর, শঙ্কর যেন তারই অতিথি, সে ছাড়া আর কে শঙ্করকে আপ্যায়িত করিবে? ফণীকে ঘুম পাড়াইয়া তাহার অবিশ্রাম বকুনি শুনিতে শুনিতে শ্যামার চোখও ঘুমে জড়াইযা আসে,—বকুলের মুখে যেন ঘুমপাড়ানি গান। বাড়ির কারোর সঙ্গে ও-মেয়েটার স্নেহের আদান-প্রদান নাই, কারো সোহাগ-মমতায় ও ধরা-ছোঁয়া দেয় না, অনুগ্রহের মত করিযা সুপ্রভার ভালবাসাকে একটু যা গ্রহণ করে, শঙ্করের সঙ্গে এত ওর ভাব হইল কিসে, পরের ছেলে শঙ্কর? এক তার পাগল ছেলে বিধান, আর এক পাগলী মেয়ে বকুল,—মন ওদের বুঝিবার যো নাই। শ্যামা যে এত করে মেয়েটার জন্য, দু' মিনিট ওর অদ্ভুত অনর্গল বাণী শুনিবার জন্য লুব্ধ হইয়া থাকে, কই শ্যামার সঙ্গে কথা তো বকুল বলে না? কাছে টানিয়া আদর করিতে গেলে মেয়ে ছটফট করে, জননীর দু'টি স্নেহ-ব্যাকুল বাহু যেন ওকে দড়ি দিয়া বাঁধে। জগতে কে কবে এমন মেয়ে দেখিয়াছে?

শ্যামা একটা হাই তোলে। জিজ্ঞাসা করে, হ্যাঁ শঙ্কর, আমাদের

বাড়ির দিকে কখনো যাও টা'ও বাবা? হারাণ ডাক্তার ভাড়াটে এনে দিলেন তার নামটাও জানিনে!

শঙ্কর বলে, ভাড়াটে কই কেউ আসেনি তো? সদর দরজায় তালা বন্ধ।

শ্যামা হাসিল তুমি জান না শঙ্কর এক মাসের ওপোর ভাড়াটে এসেছে পঁচিশ টাকা ভাড়া দিয়েছে ওদিকে তুমি যাওনি কখনো।

শঙ্কর বলে না মাসীমা আপনাদের বাড়ি খালি পড়ে আছে কেউ নেই বাড়িতে। জানালা কপাট বন্ধ সামনে বাড়িভাড়ার নোটিশ ঝুলছে—আমি কদ্দিন দেখেছি।

শ্যামা অবাক হইয়া বলে তবে কি ভাড়াটে উঠে গেল?

আপনি যাদের ভাড়া দিয়েছিলেন তারা যাবার পর কেউ আসেনি মাসীমা। আমি যাই যে মাঝে মাঝে নকুড় বাবুর বাড়ি আমি জানিনে?—শঙ্কর হাসে ভাড়াটে এলে কি বাইরে তালা দিয়ে লুকিয়ে থাকত?

হারাণ তবে ছুতা করিয়া তাহাকে অর্থ-সাহায্য করিতেছে? হারাণের কাছে কোনদিন টাকা সে চাহে নাই কেবল ভাড়াটে উঠিয়া যাওয়া উপলক্ষে হারাণকে সেই যে সে চিঠি লিখিয়াছিল সেই চিঠিতে দুঃখের কাঁদুনি গাহিয়াছিল অনেক। তাই পড়িয়া হারাণ তাহাকে পঁচিশ টাকা পাঠাইয়া দিয়াছে যতদিন বাড়িতে তাহার ভাড়াটে না আসে মাসে মাসে নিজেই তাহাকে এই টাকাটা দেওয়া ঠিক করিয়াছে হারাণ? সংসারে আত্মীয় পর সত্যই চেনা যায় না। শ্যামা কে হারাণের? শ্যামার মত দুঃখিনীর সংশ্রবে হারাণকে সর্বদা আসিতে হয় শ্যামার জন্য এত তার মমতা হইল কেন?

তিন দিন পরে শঙ্কর কলিকাতা চলিয়া গেল। এই তিন দিন সে ভাল করিয়া হাঁটিতে পারে নাই ঘরের মধ্যে সে বন্দী হইয়া থাকিয়াছে। মজা হইয়াছে বকুলের। বাড়ির ছেলেরা বাহিরে চলিয়া গেলে একা সে শঙ্করকে দখল করিতে পারিয়াছে। শঙ্কর চলিয়া গেলে কদিন বকুল মনমরা হইয়া রহিল।

তিন চার দিন পরে হারাণের মণিঅর্ডার আসিল। সই করিয়া টাকা নেওয়ার সময় শ্যামার মনে হইল গভীর ও গোপন একটি মমতা দূর হইতে

তাহার মঙ্গল কামনা করিতেছে, স্বার্থ ও বিদ্বেষ ভরা এই জগতে যার তুলনা নাই। দুঃখের দিনে কোথায় রহিল সেই বিষ্ণুপ্রিয়া, স্বামীর পাপের ছাপ মারা সন্তান গর্ভে লইয়া একদিন যে ভিখারিণীর মত জননী শ্যামার সখ্য চাহিয়াছিল? যার এক মাসের পেট্রোল খরচ পাইলে সন্তানসহ শ্যামা দুমাস বাঁচিয়া থাকিতে পারিত?

টাকার প্রাপ্তিসংবাদ দিয়া হারাণকে সে একখানা পত্র লিখিল। হারাণের ছল যে সে ধরিতে পারিয়াছে সে সব কিছু লিখিল না, লিখিল আর জন্মে সে বোধ হয় হারাণের মেয়ে ছিল, হারাণ তার জন্য যা করিয়াছে এবং করিতেছে জীবনে কখনো কি শ্যামা তাহা ভুলিবে। এমনি আবেগপূর্ণ অনেক কথাই শ্যামা লিখিল।

হারাণ জবাবও দিল না।

না দিক। শ্যামা তো তাহাকে চিনিয়াছে। শ্যামার দুঃখ নাই।

শীতলের সঙ্গে শ্যামার যোগসূত্র শীতলের কয়েদ হওয়ার গোড়াতেই ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, জেলে গিয়া কখনো সে শীতলের সঙ্গে দেখা করে নাই, চিঠিপত্রও লেখে নাই। কোথায় কোন্ জেলে শীতল আছে তাও শ্যামা জানে না। আগে জানিবার ইচ্ছাও হইত না। এখন শীতলের ছাড়া পাওয়ার সময় হইয়া আসিয়াছে। সে কোথায় আছে, কবে খালাস পাইবে মাঝে মাঝে শ্যামার জানিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু জানিবার চেষ্টা সে করে না। শীতলকে কাছে পাইবার বিশেষ আগ্রহ শ্যামার নাই। সব সময় সে যে স্বামীর উপর রাগ ও বিদ্বেষ অনুভব করে তাহা নয়, বরং কোথায় লোহার শিকের অন্তরালে পাথর ভাঙ্গিয়া সে মরিতেছে ভাবিয়া সময় সময় মমতাই সে বোধ করে, তবু মনে তাহার কেমন একটা ভয় জন্মিয়া গিয়াছে শীতল ফিরিয়া আসিলে আবার সে দারুণ কোন বিপদে পড়িবে। তা ছাড়া ব্যস্ত হইয়া লাভ কি? ছাড়া পাইলে স্ত্রী পুত্রকে শীতল খুঁজিয়া লইবে নাকি?

বেশ শান্তিতে আছে সে। নাইবা রহিল তাহার নিজের বাড়িতে থাকিবার আনন্দ, আর্থিক স্বচ্ছলতার সুখ? এখানে ছেলেমেয়েদের শরীর ভাল আছে, বিধানের অদ্ভুত পড়াশোনার ফল ফলিতেছে, স্কুলের হেডমাস্টার নিজে রাখালকে বলিয়াছেন বিধানের মত ছেলে ক্লাসে দুটি নাই। শ্যামা

আবাব আশা কবিতে পাবে, ধ্ সব ভবিষ্যতে আবাব বঙেব ছাপ লাগিতে থাকে। নাইবা রহিল তাহাব স্বামীব নিকট আশা ভবসা, একদিন ছেলে তাহাকে সুখী কবিবে।

কেবল, পড়িয়া পড়িয়া বিধান বোগা হইয়া যাইতেছে, এত ও বাত জাগিয়া পড়ে। যেমন পবিশ্রম কবে তেমন খাওয়া ছেলেটা পায না। পবেব বাড়িতে কেইবা হিসাব কবে যে একটা ছেলে দিবাবাত্রি খাটিতেছে একটু ওব ভালমত খাওয়া পাওয়া দবকাব, দুধ ঘিব প্রযোজন ওব সবচেযে বেশি? শ্যামা কি কবিবে? চাহিযা চিন্তিয়া চুবি কবিযা যতটা পাবে ভাল জিনিস বিধানকে খাওযায, কিন্তু বেশি বাড়াবাড়ি কবিতে সাহস পায না। এ আশ্রয ঘুচিয়া গেলে তাব তো উপায় থাকিবে না।

মন্দা যখন চেঁচামেচি কবিতে থাকে : একি কাণ্ড বাবা এ বাড়িব, ভূতেব বাড়ি নাকি এটা সন্দেশ কবে পাথবেব বাটি ভবে বাখলাম বাটি অর্ধেক হ'ল কি কবে? এ কাজ মানুষেব বড মানুষের, বিড়েলেও নেয নি, ছেলেপিলেও খাযনি—নিযে দিব্যি আবাব থাপবে থুপবে সমান কবে বাখাব বুদ্ধি ছেলেপিলেব হবে না:– শ্যামাব বুকেব মধ্যে তখন ঢিপ ঢিপ কবে। অর্ধেক? অর্ধেক তো সে নেয নাই। যৎসামান্য নিযাছে। মন্দা টেব পাইল কেমন কবিযা?

সুপ্রভা বলে, অমন কবে বোলো না দিদি, লক্ষ্মী -যে নিযেছে খাবাব জিনিস নিযেছে তো বড় লজ্জা পাবে দিদি।

মন্দা বলে তুই অবাক কবলি বোন চোব লজ্জা পাবে বলে বলতে পাবব না চুবিব কথা?

সুপ্রভা মিনতি কবিযা বলে বলে আব লাভ কি দিদি? এবাব থেকে সাবধানে বেখো।

তবু শ্যামা পবিশ্রমী সন্তানেব জন্য খাদ্য চুবি কবে। দুধ জ্বাল দিতে গিযা সুযোগ পাইলেই দুধে সবে খানিকটা লুকাইযা ফ্যালে, দুধ গবম কবিলে সব তো যায় গলিযা টেব পাইবে কে? বাঁধিতে বাঁধিতে দু'খানা মাছভাজা শ্যামা শালপাতায় জড়াইযা কাপড়েব আড়ালে গোপন কবে, ঘবে গিযা কখন সে তাহা লুকাইযা আসে কে জানিবে? এমনি সব ছোট ছোট

চুরি শ্যামা করে. গোপনে চুরি করা খাবার বিধানকে খাওয়ায়। একবার খানিকটা গাওয়া ঘি যোগাড় করিয়া সে বড় মুস্কিলে পড়িয়াছিল। রাখালের ছেলেমেয়ে ছাড়া আর সকলকে একসঙ্গে বসিয়া খাইতে হয়, আগে অথবা পরে। একা খাইলেও রান্নাঘরে খাইতে হয় ভাত, দাওয়ায় খাইতে হয় জলখাবার, সকলের চোখের সামনে। কেমন করিয়া ঘিটুকু ছেলেকে খাওয়াইবে শ্যামা ভাবিযা পায় নাই। বলিয়াছিল, এমনি একটু একটু খেযে ফ্যাল না খোকা পেটে গেলেই পুষ্টি হবে'

তাই কি মানুষ পারে, কাঁচা ঘি শুধু খাইতে ?

শেষে মুড়িব সঙ্গে মাখিযা দিয়া একটু একটু করিয়া শ্যামা ঘিটুকুব সদ্গতি করিয়াছিল।

খোকার তখন বাৎসরিক পরীক্ষা চলিতেছে, একদিন সকালে শ্যামাকে ডাকিয়া রাখাল বলিল, জান বৌঠান, শীতলবাবু তো খালাস পেয়েছেন আট দশ দিন হল। নকুড়বাবু পত্র লিখেছেন। তোমাদের কলকাতার বাড়িতে এসেই নাকি আছে, দিনরাত ঘরে বসে থাকে কোথাও যায়-টায না

পত্রখানা দেখি ঠাকুর-জামাই ?

নকুড়বাবু লিখিয়াছেন শীতলের চেহারা কেমন পাগলের মত হইযা গিয়াছে, বোধ হয় সে কোন অসুখে ভুগিতেছে, এতদিন হইয়া গেল কেহ তাহার খোঁজ খবর লইতে আসিল না দেখিয়া জ্ঞাতার্থে এই পত্র লিখিলেন।

রাখাল বলিল, তোমাদের বাড়িতে না ভাড়াটে আছে বৌঠান ? শীতল বাবু ওখানে আছেন কি করে ?

কি জানি ঠাকুরজামাই কিছু বুঝতে পারছি না। আপনি একবার যান না কলকাতা ?

কথাটা এখানে প্রকাশ করিতে শ্যামা রাখালকে বারণ করিয়া দিল। বিধান পরীক্ষা দিতেছে, এখন এ সংবাদ পাইলে হয় ত সে উত্তেজিত হইযা উঠিবে, ভাল লিখিতে পারিবে না।—বছরকার পরীক্ষা সহজ তো নয় ঠাকুর-জামাই, এখন কি ওকে ব্যস্ত করা উচিত ?

পাগলের মত চেহারা হইয়া গিয়াছে ? অসুখে ভুগিতেছে ? বিধানের পরীক্ষা না থাকিলে শ্যামা নিজে দেখিতে যাইত। কিন্তু এখানে শীতল

আসিল না কেন? লজ্জায়? কি অদৃষ্ট মানুষটার! দু'বছর জেল খাটিয়া বাহির হইয়া আসিল, ছেলেমেয়ের মুখ দেখিবে, স্ত্রীর সেবা পাইবে, তার বদলে খালি বাড়িতে মুখ লুকাইয়া একা অসুখে ভুগিতেছে। এত লজ্জাই বা কিসের? আত্মীয়স্বজনকে মুখ কি দেখাইতে হইবে না?

শনিবারের আগে রাখালের কলিকাতা যাওয়ার উপায় ছিল না। দু'দিন ধরিয়া শ্যামা তাহার দুর্ভাগ্য স্বামীর কথা ভাবিল। ভাবিতে ভাবিতে আসিল মমতা।

শ্যামা কি জানিত নকুড়বাবুর চিঠির কথাগুলি যে ছবি তাহার মনে আঁকিয়া দিয়াছিল পরীক্ষায় ব্যস্ত সন্তানের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবার সময়ও তাহা সে ভুলিতে পারিবে না, এত সে গভীর বিষাদ বোধ করিবে? শনিবার রাখালের সঙ্গে সে কলিকাতা রওনা হইল। সঙ্গে লইল শুধু ফণীকে। বিধানকে বলিয়া গেল সে বাড়িটা দেখিয়া আসিতে যাইতেছে, কলি ফেরানোর ব্যবস্থা করিয়া আসিবে, যদি কোন মেরামতের দরকার থাকে তাও করিয়া আসিবে।

-আমার কথা ভেবো না বাবা, ভাল করে পরীক্ষা দিও, কেমন? ছোট পিসীর কাছে খাবার চেয়ে খেও? আর বকুলকে যেন মেরো না খোকা।

বাড়ি পৌঁছিতে সন্ধ্যা পার হইয়া গেল। সদর দরজা বন্ধ, ভিতরে আলো জ্বলিতেছে কিনা বোঝা যায় না, শীতের রাত্রে সমস্ত পাড়াটাই স্তব্ধ হইয়া আছে, তার মধ্যে শ্যামার বাড়িটা যেন আরও নিঝুম। অনেকক্ষণ দরজা ঠেলাঠেলির পর শীতল আসিয়া দরজা খুলিল। রাস্তার আলোতে তাকে দেখিয়া শ্যামা কাঁদিয়া ফেলিল। চোখ মুছিয়া ভিতরে ঢুকিয়া সে দেখিল চারিদিকে অন্ধকার, একটা আলোও কি শীতল জ্বালায় না সন্ধ্যার পর? ফণী ভয়ে তাহাকে সবলে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল, অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়াইয়া শ্যামা শিহরিয়া উঠিল। এমনি সন্ধ্যাবেলা একদিন সে এখানে প্রথম স্বামীর ঘর করিতে আসিয়াছিল, সেদিনও এমনি ছাড়াবাড়ির আবহাওয়া তাহার নিশ্বাস রোধ করিয়া দিতেছিল, সেদিনও তাহার কান্না আসিতেছিল এমনি ভাবে। শুধু, সেদিন বারান্দায় জ্বালানো ছিল টিম টিমে একটা লণ্ঠন।

শীতল বিড় বিড় করিয়া বলিল, মোমবাতি ছিল, সব খরচ হয়ে গেছে।

রাখাল গিয়া মোড়ের দোকান হইতে কতগুলি মোমবাতি কিনিয়া আনিল। এই অবসরে শ্যামা হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া ঘরে গিয়া বসিয়াছে, বাহিরে বড় ঠাণ্ডা। শীতলকে দুটো একটা কথাও সে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, প্রায় অবান্তর কথা, জ্ঞাতব্য প্রশ্ন করিতে কি জানি শ্যামার কেন ভয় করিতেছিল। ভিতরে ঢুকিবার আগে রাস্তার আলোতে শীতলের পাগলের মত মূর্তি দেখিয়া শ্যামা তো কাঁদিয়াছিল, অন্ধকার ঘরে সে বেদনা কি ভয়ে পরিণত হইয়াছে?

রাখাল ফিরিয়া আসিয়া একটা মোমবাতি জ্বালিয়া জানালায় বসাইয়া দিল। ঘরে কিছু নাই, তক্তপোষের উপর শুধু একটা মাদুর পাতা, আর ময়লা একটা বালিশ। মেঝেতে একরাশি পোড়া বিড়ি আর কতগুলি শালপাতা ছড়ানো। যে জামা কাপড়ে দু'বছর আগে শীতল রাত দুপুরে পুলিশের সঙ্গে চলিয়া গিয়াছিল তাই সে পরিয়া আছে, কাপড় বোধ হয় তাহার ওই একখানা, কি যে ময়লা হইয়াছে বলিবার নয়, রাত্রে বোধ হয় সে শুধু আলোয়ানটা মুড়ি দিয়া পড়িয়া থাকে, চৌকীর বাহিরে অর্ধেকটা এখন মাটিতে লুটাইতেছে। এসব তবু যেন চাহিয়া দেখা যায়, তাকানো যায় না শীতলের মুখের দিকে। চোখ উঠিয়া, মুখ ফুলিয়া বীভৎস দেখাইতেছে তাহাকে হাড় কখানা ছাড়া শরীরে বোধ হয় কিছু নাই।

শীতল দাঁড়াইয়া থাকে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে কাঁপে। তারপর সহসা শ্যামার কি হয় কে জানে, ফণীকে জোর করিয়া নামাইয়া দিয়া জননীর মত ব্যাকুল আবেগে শীতলকে জড়াইয়া ধরিয়া টানিয়া আনে, শিশুর মত আলগোছে শোয়াইয়া দেয় মাদুরে, বলে, এমন করে ভুগছ, আমাকে একটা খপরও তুমি দিলে না গো!

পরদিন সকালে সে হারাণ ডাক্তারকে ডাকিয়া পাঠাইল। হারাণকে খবর দিলে পঁচিশ টাকা বাড়িভাড়া পাঠানোর ছলনাটুকু যে ঘুচিয়া যাইবে শ্যামা কি তা ভাবিয়া দেখিল না। ভাবিল বৈকি। রাত্রে কথাটা মনে মনে নাড়াচাড়া করিয়া সে দেখিয়াছে, হারাণের মহৎ ছলনাকে বাঁচাইয়া রাখার জন্য হারাণকে তার ছলনা করা উচিত নয়। সেযে এখানে আসিয়া জানিতে পারিয়াছে বাড়িতে তাহার ভাড়াটে আসে নাই, হারাণ দয়া করিয়া মাসে

মাসে তাকে টাকা পাঠায—এটা হাবাণকে জানিতে দেওযাই ভাল। পবে যদি হাবাণ জনিতে পাবে শ্যামা কলিকাতা আসিযাছিল? তখন কি হইবে? হাবাণ কি তখন মনে কবিবে না যে সব জানিযাও টাকাব লোভে শ্যামা চুপ কবিযা আছে?

হাবান আসিলে শ্যামা তাহাকে প্রণাম কবিল। বলিল ভাল আছেন বাবা আপনি? কাল সন্ধেবেলা এসে পেঁাছেচি আমি আগে তো জানতে পাবি নি কবে খালাস পেযে এখানে এসে পড়ে বযেছে—বিপদেব ওপব কি যে আমাব বিপদ আসছে বাবা কোন দিকে কল কিনাবা দেখতে পাইনে। সমস্ত মুখ ফুলে গিযেছে শবীবে দাবুণ জ্বব ডাকলে ডুকলে সাড়াও ভাল কবে দেয না বাবা। শ্যামা চোখ মুছিতে লাগিল।

হাবান যেন অপবিবর্তনীয মাথাব চুলে পাক ধবিবে দেহে বার্ধক্য আসিবে তবু সে কণামাত্র বদলাইবে না বিধানেব প্রথম অসুখেব সময দেখিতে আসিযা যেমন নির্মমভাবে শ্যামাকে সে কাঁদিতে বাবণ কবিযাছিল আজও তেমনি ভাবে বাবণ কবিল। শ্যামাব জীবনে বহস্যময দুর্বোধ্য মানুষেব পদার্পণ আবও ঘটিযাছে বৈকি গোড়ায ছিল বাখাল তাবপব আসিযাছিল মামা তাবাশঙ্কব কিন্তু এই লোকটিব সঙ্গে তাদেব তুলনা হয না একে একে তাদেব বহস্যেব আববণ খসিযা গিযাছে হাবান শুধু চিবকাল যবনিকাব আড়ালে বহিযা গেল। শ্যামাকে যদি সে স্নেহ কবে স্নেহেব পাত্রীকে দেখিযা একবিন্দু খুসি কি তাহাব হইতে নাই? আজও হাবান ডাক্তাব শুধু বোগী দেখিতে আসাব মত শ্যামাব বাড়ি আসিবে আত্মীয বলিযা ধবা দিবে না?

শীতলকে হাবান অনেকক্ষণ পবীক্ষা কবিল।

বাহিবে আসিযা বাখাল ও শ্যামাকে বলিল কদ্দিন জ্ববে ভুগছে জানিনে বাবু আমি জিজ্ঞাসা কবলে বলতে চায না। অনেকদিন থেকে না খেযে শুকোচ্ছে সেটা বুঝতে পাবি। তাবপব লাগিযেছে ঠাণ্ডা। সব জড়িযে অবস্থা যা দাঁড়িযেছে সাবতে সময নেবে—বড ডাক্তাব ডাকতে চাও ডাকো আমি বাবণ কবিনে কিন্তু ডাক্তাব ফাক্তাব ডাকা মিছে তাও বলে বাখছি—ওব সব চেযে দরকাব বেশি সেবাযত্নেব।

বড ডাক্তাব? হাবানেব চেযে বড ডাক্তাব কে আছে শ্যামা তো জানে

না! শুনিয়া হারান খুসি হয়। বলে, দাও দিকি কাগজ কলম, ওষুদ লিখি। আর মন দিয়ে শোনো যা যা বলে যাই, এতটুকু এদিক ওদিক হলে চলবে না,— টুকেই নাও না কথাগুলো আমার? মনে যা থাকবে আমার জানা আছে।

একে একে হারান বলিয়া যায়,—ওষুদ, পথ্য, সেবার নির্দেশ। ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া সময় বাঁধিয়া দেয়। বারবার সাবধান করে, এতটুকু এদিক ওদিক নয়, আটটায় যে ওষুদ দেওয়ার কথা দিতে যেন আটটা বাজিয়া পাঁচ মিনিটও না হয়, যখন দু'চামচ ফুড দেওয়ার কথা তিন চামচ যেন তখন না পড়ে।

শ্যামা ভয়ে ভয়ে বলে, কোন ব্যবস্থাই তো নেই এখেনে, খালি বাড়িতে এসে উঠেছি আমরা, বনগাঁ কি নিয়ে যাওয়া যাবে না?

হারান যেন আনমনেই বলে, বনগাঁ? তা চল, বনগাঁতেই নিয়ে যাই,-- একটা দিন আমার নষ্ট হবে, হলে আর উপায় কি? জবর করে, না খেয়ে, ঠাণ্ডা লাগিয়ে কি কাণ্ডই বাধিয়ে রেখেছে হতভাগা! ক'টায় গাড়ি? দেড়টায়? তবে সময় আছে ঢের, যাও দিকি তুমি রাখাল ওষুদপত্রগুলি নিযে এসো কিনে, আমি ক'টা রোগী দেখে আসছি ঘুরে এগারোটার মধ্যে।—দু'টো পান আমায় দিতে পার ছেঁচে? দোক্তা থাকে তো দিও খানিকটা।

হারান বুড়ো হইয়া গিয়াছে, পান চিবাইতে পারে না, ছেঁচা পান খায। কিন্তু হারান বদলায নাই। বুড়া হইতে হইতে সে মরিয়া যাইবে, তবু বোধ হয় বদলাইবে না। শ্যামা কি জানে না আত্মীয়তা করিয়া শীতলকে সে বনগাঁ পেঁাছাইয়া দিতে যাইতেছে না, যাইতেছে ডাক্তার হইয়া রোগীর সঙ্গে? শ্যামার বলার অপেক্ষা রাখে নাই। তা সে কোন দিনই রাখে না। সেই প্রথম-বার বিধানের অসুখের সময় জবরতপ্ত শিশুটিকে সে যে গামলার ঠাণ্ডা জলে ডুবাইয়াছিল সেদিনও সে শ্যামার বলার অপেক্ষা রাখে নাই। যা করা উচিত হারান তাই করে। হারানের স্নেহ নাই, আত্মীয়তা নাই, কোমলতা নাই, কত-বার ভুল করিয়া শ্যামা ভাবিয়াছে হারান তাহাকে মেয়ের মত ভালবাসে! তাই যদি সে বাসিবে তবে বাড়িভাড়ার নাম করিয়া টাকা শ্যামাকে সে পাঠাইবে কেন? সোজাসুজি পাঠাইতে কে তাকে বারণ করিয়াছিল? পরের দান গ্রহণ করিতে অন্য সকলের কাছে শ্যামা লজ্জা পাইবে, এই জন্য? হারানের মধ্যে ওসব দুর্বলতা নাই। কে কোথায় কি কারণে লজ্জা পাইবে

হারান কি কখনো তা ভাবে? স্নেহ মনে করিয়া শ্যামা পাছে কাছে ঘেঁষিতে চায় শ্যামা পাছে মনে করে অযাচিত দানের পিছনে হারানের মমতার উৎস লুকাইয়া আছে আত্মীয়তা দাবী করার সুযোগ পাছে শ্যামাকে দেওয়া হয়, তাই না হারান তাহার দানকে শ্যামার প্রাপ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল!

অভিমানে শ্যামার কান্না আসে। অভিমানে কান্না আসিবার বয়স তাহার নয় তবু মনের মধ্যে আজো যে অবুঝ কাঁচা মেয়েটা লুকাইয়া আছে যে বাপের স্নেহ জানে নাই, অসময়ে মাকে হারাইয়াছে ষোল বছর বয়স হইতে জগতে একমাত্র আপনার জন মামাকে খুঁজিয়া পায় নাই স্বামীর ভয়ে দিশেহারা হইয়া থাকিয়াছে সে যদি আজ কাঁদিতে চায় প্রৌঢ়া শ্যামা তাহাকে বারণ করিতে পারিবে কেন?

তাহারা বনগাঁ পৌঁছিলে মন্দা শীতলকে দেখিয়া একটু কাঁদিল তারপর তাড়াতাড়ি তার জন্য বিছানা পাতিয়া দিল এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিয়া ভারি ব্যস্ত হইয়া পড়িল সে সেবাযত্নের ব্যবস্থা করিল ছেলেমেয়েদের সরাইয়া দিল শ্যামাকে বলিতে লাগিল ভেবো না তুমি বৌ, ভেবো না,—ফিরে যখন পেয়েছি দাদাকে ভাল করে আমি তুলবই।

বকুল বিস্ফারিত চোখে শীতলকে খানিকক্ষণ চাহিয়া দেখিল তারপর সে যে কোথায় গেল কেহ আর তাহাকে খুঁজিয়া পায় না। হারান ডাক্তারকেও নয়। কোথায় গেল দুজনে? শেষে সুপ্রভাই তাদের আবিষ্কার করিল বাড়ির পিছনে ঢেঁকিঘরে। ওঘরে বকুল খেলাঘর পাতিয়াছে। ঢেঁকিটার উপরে পাশাপাশি বসিয়া গম্ভীর মুখে কি যে তাহারা আলোচনা করিতেছিল তারাই জানে সুপ্রভা দেখিয়া হাসিয়া বাঁচে না। ডাক্তার নাকি বুড়া? জগতে এত জায়গা থাকিতে, কথা বলিবার এত লোক থাকিতে বুড়া ঢেঁকিঘরে বসিয়া আলাপ করিতেছে বকুলের সঙ্গে!

যা তো খোকা ডেকে আন ওদের। বুড়োকে বল মুখ হাত ধুয়ে নিতে, খেতে টেতে দি। তোর বাবা কি খাবে তাও তো বলে দিলে না ঢেঁকিঘরে গিয়ে বসে রয়েছে?

হারান আসে, মুখ হাত ধোয়, সুপ্রভা ঘোমটা টানিয়া তাহাকে জলখাবার দেয়। বকুল কিন্তু ঢেঁকিঘরেই বসিয়া থাকে। সুপ্রভা গিয়া বলে, ও

বকু খাবিনে তুই? তোর বাবা এল তুই এখেনে বসে আছিস?

—ও আমার বাবা নয়।

শোন কথা মেয়ের!—সুপ্রভা হাসে, আয়, চলে আয় আমার সঙ্গে একটু এখানে তোকে বসে থাকতে হবে না।

রাত্রিটা এখানে থাকিয়া পরদিন সকালে হারান কলিকাতা চলিয়া গেল। শ্যামা সাবধান হইয়া গিয়াছিল হারানকে অতিরিক্ত আত্মীয়তা জানাইবার কোন চেষ্টাই সে করিল না। যাওয়ার সময় শুধু ঘটা করিয়া প্রণাম করিয়া বলিল মেয়েকে ভুলবেন না বাবা।

খুব ধীরে ধীরে শীতল আরোগ্যলাভ করিতে লাগিল। সে নিঝুম নিশ্চুপ হইয়া গিয়াছে। আপনা হইতে কথা সে একেবারেই বলে না অপরে বলিলে কখনো দু'এক কথায় জবাব দেয় কখনো কিছু বলে না। কেহ কথা বলিলে বুঝিতে যেন তাহার দেরি হয়। ক্ষুধা তৃষ্ণা বোধও যেন তাহার নাই খাইতে দিলে খায় না দিলে কখনো চায় না। চুপচাপ বিছানায় পড়িয়া থাকিয়া সে যে ভাবে তা তো নয়। এখানে আসিয়া কদিনের মধ্যে চোখ ওঠা তাহার সারিয়া গিয়াছে সব সময় সে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। দু বছর জেল খাটিলে মানুষ কি এমনি হইয়া যায়? কবে ছাড়া পাইয়াছিল শীতল? কলিকাতার বাড়িতে আসিবার সে তো ছিল দশ বারোদিন তার আগে? প্রথমে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া কিছু জানা যায় নাই। পরে অল্পে অল্পে জানা গিয়াছে পনের কুড়ি দিন কোথায় কোথায় ঘুরিয়া শীতল কলিকাতার বাড়িটাতে আশ্রয় লইয়াছিল। জানিয়া শ্যামার বড় অনুতাপ হইয়াছে। এই দারুণ শীতে একখানা আলোয়ান মাত্র সম্বল করিয়া স্বামী তাহার এক মাসের উপর কপর্দকহীন অবস্থায় যেখানে সেখানে কাটাইয়াছে! জেলে থাকিবার সময় শীতলের সঙ্গে সে যোগসূত্র রাখে নাই কেন? তবে তো সময় মত খবর পাইয়া ওকে সে জেলের দেউড়ি হইতে সোজা বাড়ি লইয়া আসিতে পারিত?

প্রাণ দিয়া শ্যামা শীতলের সেবা করে। শ্রান্তি নাই শৈথিল্য নাই, অবহেলা নাই। চারটি সন্তান শ্যামার? আর একটি বাড়িয়াছে। শীতল তো এখন শিশু।

পরীক্ষার ফল বাহির হইলে জানা গিয়াছে বিধান ক্লাশে উঠিয়াছে প্রথম হইয়া।

আট

বনগাঁএ শ্যামার একে একে আরও চার বছর কাটিয়া গেল।

কলিকাতার বাড়িটা তাহাকে বিক্রয় করিয়া দিতে হইয়াছে। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া বিধান যখন কলিকাতায় পড়িতে গেল তখন শীতলের প্রত্যাবর্তনের এক বছর পরে।

শীতলের অসুখের জন্য অনেক টাকা খরচ করিতে না হইলে রাখাল হয়ত শেষ পর্যন্ত বিধানের পড়ার খরচ দিতে রাজি হইত। বড় খারাপ অসুখ হইয়াছিল শীতলের। বেশি জ্বর অনাহার দারুণ শীতে উপযুক্ত আবরণের অভাব মানসিক পীড়া এই সব মিলিয়া শীতলের স্নায়ুরোগ জন্মাইয়া দিয়াছিল দেহের সমস্ত স্নায়ু তাহার উঠিয়াছিল ফুলিয়া। চিকিৎসার জন্য তাহাকে কলিকাতা লইয়া যাইতে হইয়াছিল। তিনমাস সে পড়িয়া ছিল হাসপাতালে। তারপর শ্যামার কাঁদা-কাটায় রাখাল আরও তিনমাস তাহার বৈদ্যুতিক চিকিৎসা চালাইয়াছিল। তার ফলে যতদূর সুস্থ হওয়া সম্ভব শীতল তা হইয়াছে। কিন্তু জীবনে সে যে কাজকর্ম কিছু করিতে পারিবে সে ভরসা আর নাই। যতখানি তাহার অক্ষমতা নয় ভান করে সে তার চেয়ে বেশি। শুইয়া বসিয়া অলস অকর্মণ্য দায়িত্বহীন জীবন যাপনের সুখটা টের পাইয়া হয়ত সে মুগ্ধ হইয়াছে। হয়ত সে সত্যই বিশ্বাস করে দারুণ সে অসুস্থ কর্ম-জীবনের তাহার অবসান হইয়াছে। হয়ত সে হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত, অসুখের অজুহাতে সকলের দয়া ও সহানুভূতি মমতা ও সেবা লাভ করার চেয়ে বড় আর তার কাছে কিছুই নাই। তবে সবটা শীতলের ফাঁকি নয় শরীরে তাহার গোলমাল আছে, মাথাটা ভোঁতা হইয়া যাওয়াও কাল্পনিক নয়, অসুখের যে বাড়াবাড়ি ভানটুকু সে করে তার ভিত্তিও তো মানসিক রোগ।

তবু ছেলের পড়া চালানোর জন্য বাড়িটা শ্যামার হয়ত বিক্রয় করিতে হইত না, যদি বাঁচিয়া থাকিত হারান ডাক্তার। বিধানকে হারানের বাড়ি পাঠাইয়া সে লিখিত, বাবা, জীবনপাত করে ওর স্কুলের পড়া সাঙ্গ করেছি, আর তো আমার সাধ্য নেই, এবার দিন বাবা ওর আপনি কলেজে পড়ার একটা ব্যবস্থা করে। হারান তা দিত। শ্যামার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু হারানের অনেক বয়স হইয়াছিল, বিধানের স্কুলের পড়া শেষ হওয়া পর্যন্ত সে বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে কৈ?

হারান মরিয়াছে। মরিবে না? কপাল যে শ্যামার মন্দ! হারান বাঁচিয়া থাকিলে শ্যামার ভাবনা কি ছিল? বাড়িতে শ্যামার ভাড়াটে আসিয়াছিল তারা কুড়ি টাকা পাঠাইত শ্যামাকে আর হারান পাঠাইত পঁচিশ। হারানের মনি অর্ডারের কুপনে কোন অজুহাতের কথা লেখা থাকিত না শুধু অপাঠ্য হাতের লেখায় স্বাক্ষর থাকিত হারানচন্দ্র দে। শ্যামা তো তখন ছিল বড়লোক। কয়েক মাসে শ' দেড়েক টাকাও সে জমাইয়া ফেলিয়াছিল। কেন মরিল হারান? কত মানুষ সত্তর আশি বছর বাঁচিয়া থাকে পঁয়ষট্টি পার হইতে না হইতে হারানের মরিবার কি হইয়াছিল?

শ্যামা কি করিবে? ভগবান যার প্রতি এমন বিরূপ বাড়ি বিক্রি করিয়া না দিয়া তার উপায় কি।

শহরতলীর বাড়ি, তাও বড় রাস্তার উপরে নয়, দক্ষিণ খোলা নয়। একতলাটা পুরানো। বাড়ি বেচিয়া শ্যামা হাজার পাঁচেক টাকা পাইয়াছিল।

টাকা থাকিলে খরচ কেন বাড়িয়া যায় কে জানে। আগে ছোট-বড় অনেক খরচ মন্দার উপর দিয়া চালানো যাইত কিন্তু পুঁজি যার পাঁচ হাজার টাকা সে কেন তা পারিবে? মন্দাই বা দিবে কেন? দুধের কথাটা ধরা যাক। দুধ অবশ্য কেনা হয় না, বাড়িতে পাঁচ ছ'টা গরু আছে। কিন্তু গরুর পিছনে খরচ তো আছে? শ্যামার ছেলেমেয়েরা দুধ তো খায়? শ্যামা পাঁচ হাজার টাকা পাওয়ার মাসখানেক পরে মন্দা বলে পয়সা কড়ি হাতে নেই বৌ, এ-মাসের খোল কুঁড়োর দামটা দিয়ে দাও না,—সামনের মাসে আনাব'খন আমি।

কুঁড়ো কেনা হইবে কেন? সেদিন যে দু'মণ চাল করা হইল তার কুঁড়ো

গেল কোথায়? এবার মন্দা ধান ভানার মজুরি নগদ দেয় নাই ঃ ধান যে ভানিয়াছে কুঁড়ো পাইয়াছে সে। মন্দা তাহা হইলে শ্যামার টাকাগুলি খরচ করাইয়া দিবার মতলব করিয়াছে? ঘরের ধানের কুঁড়ো পরকে দিয়া শ্যামাকে দিয়া সে কুঁড়ো কিনাইবে!

মাসের শেষে মুদি তাহার সাঁইত্রিশ টাকা পাওনা লইতে আসিয়াছে, মন্দা তিনখানা দশ টাকার নোট গুনিয়া দেয়, একটু ইতস্তত করিয়া নগদ টাকাও দেয় একটা, তারপর শ্যামাকে বলে, ছ'টা টাকা কম পড়ল, দাও না বৌ টাকাটা দিয়ে?

বর্ষাকালে জল পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে শ্যামার ঘর দিয়া, দু'খানা টিন বদলানো দরকার,--কে বদলাইবে টিন? বাড়ি মন্দার, ঘরখানা মন্দার, শ্যামা তো শুধু আশ্রিতা অতিথি,- মন্দারই তো উচিত ঘরখানা সারাইয়া দেওয়া। বলিলে মন্দা চুপ করিয়া থাকে। একটু পরেই সংসার খরচের দু'টি একটি টাকা বাহির করিয়া দিবার সময় মন্দা এমন করিয়া বলিতে থাকে যে আর সে পারিয়া উঠিল না, এ যেন রাজার বাড়ি ঠাওরাইয়াছে সকলে, খরচ খরচ খরচ, চারিদিকে শুধু খরচ, খরচ ছাড়া আর কথা নাই--যে মনে হয় সে বুঝি শ্যামার ঘর সারাইয়া দিবার অনুরোধেরই জবাব দিতেছে এতক্ষণ পরে।

বাড়ি বেচিয়া এমনি কত খরচ যে শ্যামার বাড়িয়াছে বলিবার নয়।

বিধানের কলিকাতার খরচ, মণি স্কুলে যাইতেছে তার খরচ, শীতলের জন্য খরচ অসুখবিসুখের খরচ,—শ্যামার তো মনে হইত মন্দার নয়, খরচ খরচ খরচ, চারিদিকে শুধু খরচ, তার।

আর বকুল? বকুলের জন্য শ্যামার খরচ হয় নাই?

গত বৈশাখে তেরশ' টাকা খরচ করিয়া বকুলের শ্যামা বিবাহ দিয়াছে। কমিতে কমিতে পাঁচ হাজারের যা অবশিষ্ট ছিল, বকুল একাই প্রায় তা শেষ করিয়া দিয়াছে।

বকুলের বিবাহ হইয়াছে, আমাদের সেই বকুলের? কার সঙ্গে বিবাহ হইয়াছে বকুলের, শঙ্করের সঙ্গে নাকি? পাগল! শঙ্করের সঙ্গে বকুলের বিবাহ হয় না।

যে বৈশাখে আমাদের বকুলের বিবাহ হইল, তার আগের ফাল্গুনে

বিবাহ হইয়াছিল সুপ্রভার মেয়েটির, বিবাহের তিন চার দিন আগে কলিকাতা হইতে বিধানের সঙ্গে শঙ্করও আসিয়াছিল। বয়সের আন্দাজে বকুল মস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, শঙ্কর ভাবিতে পারে নাই বকুল এত বড় হইয়াছে, আর এত লজ্জা হইয়াছে বকুলের, আর এত সুন্দর হইয়াছে সে। মেয়ের সম্বন্ধে শ্যামা যে এত সাবধান হইয়াছে তাও কি শঙ্কর জানিত? বিবাহের পরদিন দুপুরবেলা বকুলকে আর শ্যামা দেখিতে পায় না। কোথায় গেল বকুল? বাড়িতে পুরুষ গিজগিজ করিতেছে, যেখানে যেখানে মেয়েরা একত্র হইয়াছে বকুল তো সেখানে নাই? হাতের কাজ ফেলিয়া রাখিয়া শ্যামা এখানে খোঁজে ওখানে খোঁজে, একে তাকে জিজ্ঞাসা করে। একজন বলিল, এই তো দেখলাম এখানে খানিক আগে, দেখ না কলাবাগানে গেছে নাকি?

বাড়ির পিছনে কলাবাগান, কলাবাগানে সেই ঢেঁকিঘর। তাই বটে, ঢেঁকিঘরে ঢেঁকিটার উপর বসিয়া শঙ্কর আর বকুল কথা বলিতেছে বটে। ঘরের কোণে এখানে বকুল আর এখন পুতুল খেলা করে না, খেলাঘর তার ভাঙিয়া গেছে, শুধু আছে চিহ্ন, কতবার ঘর লেপা হইয়াছে আজো চারিদিকে উঁচু আলের চিহ্ন, পুকুরের গর্ত, উনানের গর্ত মিলাইয়া যায় নাই, বেড়ায় যে শিউলিবোঁটার রঙে ছোপানো ন্যাকড়াটি গোঁজা আছে সে তো বকুলের পুতুলেরই জামা। পুতুল খেলার ঘরে কি ছেলেখেলা আজ করিতেছে বকুল? একটু বাড়াবাড়ি রকম কাছাকাছি বসিয়া আছে ওরা আর কিছু নয়। না, বকুলের হাতটিও শঙ্করের হাতে ধরা নাই। শ্যামা বলিয়াছিল, ও বকুল, এখানে বসে আছিস তুই? মেয়ে জামাই যাবে যে এখন, আয় চলে আয়।

বকুল তো আসিল, কিন্তু মেয়ের মুখ রাঙা কেন, চোখ কেন ছলো ছলো?—শঙ্কর আসিয়াছে চার পাঁচদিন, সকলের সামনে শঙ্করের সঙ্গে কত কথা বকুল বলিয়াছে দু'চার মিনিট একা কথা বলিবার সময়ও কতবার শ্যামা হঠাৎ আসিয়া ওদের দেখিয়াছে, শ্যামাকে দেখিয়াও কথা শঙ্কর বন্ধ করে নাই, বকুল হাসি থামায় নাই। ঢেঁকি ঘরে আজ ওরা কোন্ নিষিদ্ধ বাণীর আদান-প্রদান করিতেছিল, বকুলের মুখে যা রঙ আনিয়াছে, চোখে আনিয়াছে জল? কি বলিতেছিল শঙ্কর বকুলকে?

শ্যামা একবার ভাবিয়াছিল বকুলকে জিজ্ঞাসা করিবে। শেষে কিছু না

বলাই ভাল মনে করিয়াছিল। কিছুই হয় তো নয়। হয় তো নির্জন ঢেঁকি ঘরে শঙ্করের কাছে বসিয়া থাকার জন্যই বকুল লজ্জা পাইয়াছিল, ওখানে ও ভাবে বসিয়া থাকা যে তার উচিত হয় নাই বকুল কি আর তা বোঝে না।

তারপর যে কদিন শঙ্কর এখানে ছিল, আর তিনটি দিন মাত্র, বকুলকে শ্যামা একদণ্ডের জন্য চোখের আড়াল করে নাই।

বকুল রাগ করিয়া বলিয়াছিল, সারাদিন পেছন পেছন ঘুরছ কেন বলত?

বকুলের বোধ হয় অপমান বোধ হইয়াছিল।

শ্যামা বলিয়াছিল, পেছন পেছন আবার তোর ঘুরলাম কখন?

তারপর বকুল কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল গিয়া বসিয়া ছিল শীতলের কাছে, সারাটা দিন।

দুমাস পরে বৈশাখ মাসে বকুলের বিবাহ হইয়াছিল। ছেলের নাম মোহিনী, ছেলের বাপের নাম বিভূতি, নিবাস কৃষ্ণনগর। বিভূতি ছিল পোষ্টমাষ্টার, এখন অবসর লইয়াছে। মোহিনী পঞ্চাশ টাকায় ঢুকিয়াছে পোষ্টাপিসে, আশা আছে বাপের মত সেও পোষ্টমাষ্টার হইয়া অবসর লইতে পারিবে। মোহিনী কাজ করে কলিকাতায়, থাকে কাকার বাড়ি, যার নাম শ্রীপতি এবং যিনি মার্চেণ্ট আপিসের কেরাণী।

ছেলেটি ভাল, আমাদের বকুলের বর মোহিনী। শান্ত নম্র স্বভাব পঞ্চাশ টাকার চাকরী করে বলিয়া এতটুকু গর্ব নাই, প্রায় শঙ্করের মতই লাজুক। দেখিতে মন্দ নয়, বঙ একটু ময়লা কিন্তু কি চোখ!—বকুলের চোখের মতই বড় হইবে।

জামাই দেখিয়া শ্যামা খুসী হইয়াছে, সকলেই হইয়াছে। জামাইএর বাপখুড়ার ব্যবহারেও কারো অখুসী হওয়ার কারণ ঘটে নাই, শ্বশুর বাড়ি হইতে বকুল ফিরিয়া আসিলে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানা গিয়াছে শাশুড়ী ননদেরাও বকুলের মন্দ নয়, বকুলকে তারা পছন্দও করিয়াছে, আদর যত্ন মিষ্টি কথারও কমতি রাখে নাই, কেবল এক পিস্‌শাশুড়ী আছে বকুলের সেই যা রূঢ় কথা বলিয়াছে দু'একটা—বলিয়াছে, ধেড়ে মাগী, বলিয়াছে তালগাছ! ধোয়া পাকা মেঝেতে পা পিছলাইয়া পড়িয়া গিয়া বকুল

যখন ডান হাতের শাঁখাটি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল বিশেষ কিছু কেহ তখন তাহাকে বলে নাই, কেবল ওই পিস্‌শাশুড়ী অনেকক্ষণ বকাবকি করিয়াছিল, বলিয়াছিল অলক্ষ্মী, বলিয়াছিল বজ্জাত।

বলুক, পিস্‌শাশুড়ী কে? শাশুড়ী ননদই আসল, তারা ভাল হইলেই হইল।

বকুল বলিয়াছিল, না মা, পিস্‌শাশুড়ীর প্রতাপ ওখানে সবার চেয়ে বেশি, সবাই তার কথায় ওঠে বসে। ঘরদোর তার কিনা সব, নগদ টাকা আর সম্পত্তিও নাকি অনেক আছে শুনলাম, তাইতে সবাই তাকে মেনে চলে। বুড়ীর ভয়ে কেউ জোরে কথাটি কয় না মা।

তাহা হইলে ভাবনার কথা বটে। শ্যামা অসন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিল, কদিন ছিলি তার মধ্যে শাঁখা ভেঙ্গে বুড়ীর বিষনজরে পড়লি। বৌ-মানুষ তুই সেখানে, একটু সাবধানে চলাফেরা করতে হয়।

বকুল বলিয়াছিল, পা পিছলে গেল, আমি কি করব? আমি তো ইচ্ছে করে পড়িনি!

সুপ্রভা বলিয়াছিল, মরুক পিস্‌শাশুড়ী, জামাই ভাল হলেই হল। সব তো আর মনের মত হয় না।

তা বটে। স্বামীই তো স্ত্রীলোকের সব। স্বামী যদি ভাল হয়, স্বামী যদি ভালবাসে, হাজার দজ্জাল পিস্‌শাশুড়ী থাক, কি আসিয়া যায় মেয়ে-মানুষের?

মোহিনী ভালবাসে না বকুলকে?

মোটা মোটা চিঠি তো আসে সপ্তাহে দু'খানা! ভালবাসার কথা ছাড়া কি আর লেখে মোহিনী অত সব? আর কি লিখিবার আছে তাহার?

সুপ্রভার মেয়েকে বকুল বরের চিঠি পড়িতে দেয়। শ্যামা, সুপ্রভা, মন্দা সকলে আগ্রহের সঙ্গে একবার তাকে প্রশ্ন করিয়াছিল. সে হাসিয়া বলিয়াছিল. ভেবো না মামী ভেবো না. যা কবিত্ব করে চিঠিতে, জামাই তোমার ভেড়া বনে গেছে।

তবু, লুকাইয়া মেয়ের একখানা চিঠিতে শ্যামা চোখ বুলাইতে ছাড়ে নাই। টাঙ্গানো লেপের বস্তার কোথায় কোন ফাঁকে চিঠিখানা আপাতত গোপন

করিয়া বকুল স্নান করিতে গিয়াছিল, শ্যামার কি তা নজর এড়াইয়াছে! চোরের মত চিঠিখানা পড়িয়া শ্যামা তো অবাক। এসব কি লিখিয়াছে মোহিনী? সব কথার মানেও যে শ্যামা বুঝিতে পারিল না?

কে জানে, হয় তো ভালবাসার চিঠি এমনি হয়, শীতল তো কোনদিন তাকে প্রেমপত্র লেখে নাই, সে কি জানে প্রেমপত্রের?

না জানুক, জামাই যে মেয়েকে পছন্দ করিয়াছে তাই শ্যামার ঢের। একটি শুধু ভাবনা তাহার আছে। বকুল তো পছন্দ করিয়াছে মোহিনীকে? কে জানে কি পোড়া মন তাহার, ঢেঁকিঘরে সেই যে বকুল আর শঙ্করকে সে একসঙ্গে দেখিয়াছিল বার বার সে কথা তাহার মনে পড়িয়া যায়। বকুলের সেই রাঙ্গা মুখ আর ছল ছল চোখ সর্বদা চোখের সামনে ভাসিয়া আসে।

পূজার সময় বকুলকে নেওয়ার কথা ছিল। পূজার ছুটির সঙ্গে আরও কয়েকদিনের ছুটি লইয়া মোহিনী ষষ্ঠীর দিন বনগাঁ আসিল। বিধানের কলেজ অনেক আগে বন্ধ হইয়াছিল, কিন্তু সে শঙ্করের সঙ্গে কাশী গিয়াছে। শংকরের কে এক আত্মীয় থাকেন কাশীতে, সেখানে পূজা কাটাইয়া বিধান বাড়ি আসিবে।

মোহিনী থাকিতে চায় না। অষ্টমীর দিনই বকুলকে লইয়া বাড়ি যাইবে বলে। সকলে যত বলে, তা কি হয়? এসেছ, পূজোর কদিন থাকবে না?- লাজুক মোহিনী ততই সলজ্জভাবে একটু হাসিয়া বলে, না, তার যাওয়াই চাই।

কেন, যাওয়াই চাই কেন? সকলে জিজ্ঞাসা করে। পনেরদিনের ছুটি তো নিয়েছ দুদিন এখানে থেকে গেলে ছুটি তো তোমার ফুরিয়ে যাবে না?

শেষে মোহিনী স্বীকার করে, এটা তার ইচ্ছা অনিচ্ছার ব্যাপার নয়, পিসীমার হুকুম অষ্টমীর দিন রওনা হওয়াই চাই।

সুপ্রভা অসন্তুষ্ট হইয়া বলে, এ কি রকম হুকুম বাছা তোমার পিসীর? বেয়াই বর্তমানে পিসীই বা হুকুম দেবার কে? বেয়াইকে টেলিগ্রাম করে আমরা অনুমতি আনিয়ে নিচ্ছি, লক্ষ্মীপুজো পর্যন্ত তুমি থাকবে এখানে।

মোহিনী ভয় পাইয়া বলে টেলিগ্রাম যদি করতে হয় পিসীকে করুন। কিন্তু তাতে কিছু লাভ হবে না, অনুমতি পিসী দেবে না, মাঝ থেকে শুধু চটবে।

কেহ আর কিছু বলে না, মনে মনে সকলে অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে। বুঝিতে পারিয়া মোহিনী বড় অস্বস্তি বোধ করে। সুপ্রভার মেয়েকে সে বুঝাইবার চেষ্টা করে যে এ ব্যাপারে তার কোন দোষ নাই, পিসী তিনখানা চিঠিতে লিখিয়াছে অষ্টমীর দিন সে যেন অবশ্য অবশ্য রওনা হয়, কোন কারণে যেন অন্যথা না ঘটে কথা না শুনিলে পিসী বড় রাগ করে। সুপ্রভার মেয়ে শুনিয়া বলে, বোঝো তো ভাই আসার মত আসা এই তো তোমার প্রথম, দুদিন না থাকলে কেমন লাগে আমাদের?

মোহিনী কয়েক ঘণ্টা ভাবে, তারপর সুপ্রভার মেয়েকে ডাকিয়া বলে, আচ্ছা দশমী পর্যন্ত থাকব।

শুনিয়া শ্যামা আসিয়া বলে, থাকলে পিসী রাগ করবে বলছিলে?

গিয়ে বুঝিয়ে বলব'খন।—মোহিনী বলে।

শ্যামা তবু ইতস্ততঃ করে ঃ জোর করে ধরে রেখেছি বলে পিসী তো শেষে—?

মনটা শ্যামার খুঁত খুঁত করে। কি যে জবরদস্তি সকলের! যাইতে দিলেই হইত অষ্টমীর দিন। তার মেয়ে জামাই, পিসীর নাম শুনিয়া সে চুপ করিয়া গেল, সকলের এত মাথাব্যথা কেন? ওরা কি যাইবে পিসীর রাগের ফল ভোগ করিতে? ভুগিবে তার মেয়ে। সুপ্রভার মেয়ে একসময় তাহাকে একটা খবর দিয়া যায়। বলে, জান মামী জামাই তোমার তার পাঠালে পিসীর কাছে। কি লিখেছে জান, এখানে এক গণৎকার বলেছে পুজোর কদিন ওর যাত্রা নিষেধ।

শ্যামা নিশ্বাস ফেলিয়া বলে, কি সব কাণ্ড মা আমার ভাল লাগছে না খুকী, এমন করে কাউকে রাখতে আছে!

আমরা রেখেছি নাকি? জামাই নিজেই তো বললে থাকবে।

তখন শ্যামা হাসিয়া সুপ্রভার মেয়ের চিবুক ধরিয়া বলে, আরেকটি জামাই তো আমার এল না মা?

সে লক্ষ্মীপূজার পরেই আসিবে, শ্যামা তাই হাসিয়া একথা বলে, ব্যথার সঙ্গে বলিবার প্রয়োজন হয় না।

পূজা উপলক্ষে মন্দা সাধারণ ভাবে খাওয়া দাওয়ার ভাল ব্যবস্থা করিয়াছে, শ্যামা খরচপত্র করিয়া আরও বেশি আয়োজন করিল আসার মত আসা এই তো জামাইএর প্রথম। মোহিনীকে সে একপ্রস্থ ধুতিচাদর জামা জুতা কিনিয়া দিল দিল দামী জিনিস, জামাই যে পঞ্চাশ টাকার চাকরে। শ্যামার টাকা ফুরাইয়া আসিয়াছে, কিন্তু কি করিবে এসব তো না করিলে নয়।

কাজ করিতে করিতে শ্যামা বকুলের ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করে। মোহিনী আসিয়াছে বলিয়া খুসি হয় নাই বকুল? এমন চাপা মেয়েটা তার, মুখ দেখিয়া কিছু কি বুঝিবার যো আছে! খাওয়া দাওয়া শেষ হইতে অনেক রাত্রি হয় বকুল আসিয়া শ্যামার বিছানায় শুইয়া পড়ে, শ্যামা বলে রাত অনেক হল আর এখানে কেন মা? ঘরে যাও।

এখানে শুই না আমি?— বকুল বলে।

শ্যামা ভয় পাইয়া সুপ্রভার মেয়েকে ডাকিয়া আনে। সে টানাটানি করে বকুল যাইতে চায় না শ্যামার বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করিতে থাকে। শেষে ধৈর্য হারাইয়া শ্যামা দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বলে পোড়ারমুখি কেলেঙ্কারি করে সকলের মুখে তুই চুণকালি দিবি? যা বলছি যা মেরে ছেঁচে ফেলব তোকে আমি!

সুপ্রভার মেয়ে বলে আহা মামী বকো না গো যাচ্ছে।

তারপর বকুল উঠিয়া যায়। শ্যামা চুপ করিয়া তক্তপোষে বসিয়া ভাবে। নানা কারণে সে বড় বিষাদ বোধ করে। কে জানে কি আছে মেয়েটার মনে। পূজার সময় চারিদিকে আনন্দ উৎসব, বিধানও কাছে নাই যে ছেলের মুখ দেখিয়া মনটা একটু শান্ত হয়। ছেলে বড় হইয়াছে তাই আর কলেজ ছুটি হইলে ছুটিয়া মার কাছে আসে না, বন্ধুর সঙ্গে বেড়াইতে যায়।

শীতল বোধ হয় বাহিরে তাসের আড্ডায় বসিয়া আছে শ্যামার বারণ না মানিয়া সে আজ সিদ্ধি গিলিয়াছে একরাশি। কে আছে শ্যামার?

সারাদিনের খাটুনির পর শরীর শ্রান্ত অবসন্ন হইয়া আসিয়াছে, মনের মধ্যে একটা দুঃসহ ভার চাপিয়া আছে, কত যে একা আর অসহায় মনে হইতেছে নিজেকে সেই শুধু তা জানে, এতটুকু সান্ত্বনা দিবারও কেহ নাই।

ভাল করিয়া আলো হওয়ার আগে উঠিয়া শ্যামা বকুলের ঘরেব দরজায় চোখ পাতিয়া দাওয়ায় বসিয়া রহিল। বকুল বাহির হইলে একবার সে তাহার মুখখানা দেখিবে। খানিক বসিযা থাকিয়া শ্যামার লজ্জা করিতে লাগিল, এদিক ওদিক সে একটু ঘুরিয়া আসিল, পুকুর ঘাটে গিয়া মুখে চোখে জল দিল। এও এক শরৎকাল, শ্যামার জীবনে এমন কত শরৎ আসিযা গিয়াছে। পুকুরের শীতল জল, ঘাসের কোমল শিশির শ্যামাব মুখে আব চরণে কত কি নিবেদন জানায়। সে কি একদিন বকুলের মত ছিল? কবে?

তাবপর ভিতরে গিযা শ্যামা দেখিল, বকুলের ঘরের দবজা খোলা। কিন্তু বকুল কোথায়? শ্যামা এদিক ওদিক তাকায, সম্মুখ দিয়া পাব হইযা যাওয়ার সময় ভিতরে চাহিয়া দ্যাখে মশারি তোলা, বিছানা খালি, বকুল বা মোহিনী কেউ ঘরে নাই। এত ভোরে কোথায় গেল ওরা? শ্যামা গালে হাত দিয়া সিঁড়িতে বসিয়া রহিল।

রান্নাঘরের পাশ দিয়া চোরের মত বাড়িতে ঢুকিযা শ্যামাকে বসিযা থাকিতে দেখিয়া দুজনেই তাহারা লজ্জা পাইল। মোহিনী ঘরে চলিযা গেল। বকুল শ্লথ পদে মার কাছে আসিল।

কোথা গিয়েছিলি বকুল?

বকুল কথা বলে না। পাশে বসাইবা শ্যামা একটা হাতে তাহাকে বেষ্টন করিয়া থাকে। তাই বটে, তেমনি রাঙ্গা বটে বকুলের মুখ, ঢেঁকিঘবে সেদিন শ্যামা যেমন দেখিয়াছিল। শুধু আজ ওর চোখ দুটি ছলছল নয়।

দশমীর দিন বেলা দশটার সময় অপ্রত্যাশিত ভাবে বিধান আসিল। শ্যামা আনন্দে অধীর হইয়া বলিল, তুই যে চলে এলি খোকা? মন টিঁকল না বুঝি সেখানে তোর?

হঠাৎ শ্যামার মন হাল্কা হইয়া গিয়াছে। সেদিন ভোরে মোহিনীর সঙ্গে বেড়াইয়া আসিয়া বকুলের মুখ যে রাঙ্গা হইয়াছিল তা দেখিবার পরেও

শ্যামার মন কি ভার হইয়া ছিল? ছিল বৈকি! শ্যামার ভাবনা কি শুধু বকুলের জন্য। এমনি শরৎকালে যাকে শ্যামা কোলে পাইয়াছিল, সোনার টুকরার সঙ্গে লোকে যাকে তুলনা করে, তাকে না দেখিলে শ্যামার ভাল লাগে না। মোহিনীর জন্য মাছ মাংস রাঁধিতে রাঁধিতে উন্মনা হইয়া চোখের জল সে ফেলিয়াছিল কার জন্য?

বিধান আসিয়াছে। আব শ্যামার দুঃখ নাই। পৃথিবীতে শরৎ আসিযাছে হাসির মত, এতদিন শ্যামা হাসিতে পাবে নাই। এবার শ্যামার মুখেও হাসি ফুটিয়াছে।

পরদিন বকুলকে বিদায দিয়াও শ্যামার মুখ তাই বেশিক্ষণ ম্লান বহিল না। বান্না ঘবে গিযা তার কাছে পিঁড়ি পাতিয়া বিধান বসিতে না বসিতে কখন যে সে ভুলিয়া গেল মেয়ের বিরহ।

নয়

শ্যামার মনে আবার নিবিড় হইযা আর্থিক দুর্ভাবনা ঘনাইয়া আসিযাছে।

এবার আর কোনদিকে সে উপায় দেখিতে পায় না। আগে দুরবস্থায় পড়িয়া একটা ভরসা সে করিতে পারিত. বাড়িটা বিক্রয় করিয়া দিলে মোটা কিছু টাকা পাওয়া যাইবে। এখন সে ভরসাও নাই। বাড়ি বিক্রীর অতগুলি টাকা কেমন করিয়া নিঃশেষ হইযা গেল? অপচয় করিয়াছে নাকি সে? হযত আরও হিসাব করিযা খরচ করা উচিত ছিল। এক সঙ্গে অনেকগুলি টাকা হাতে পাইয়া নিজেকে হয় তো সে বড়লোক ঠাওরাইয়াই বসিয়াছিল।

তবে, একথা সত্য যে এ ক'বছর একটি পয়সাও ঘরে আসে নাই। ফোঁটা ফোঁটা করিয়া ঢালিলেও কলসীর জল একদিন শেষ হইয়া যায়। বিধানের পড়ার খরচও কি সহজ! বকুলের বিবাহেও ঢের টাকা লাগিয়াছে।

কিন্তু এখন উপায়?

শ্যামা এবার একটু মন দিয়া শীতলের ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করিতে লাগিল। খায় দায় তামাক টানিয়া তাস পাশা খেলিয়া দিন কাটায়, হাঁটে একটু খোঁড়াইয়া, বদহজমে ভোগে, রাত্রে ভাল ঘুম হয় না। তবু কিছু কি শীতল করিতে পারে না? ঘরে বসিয়া থাকিয়াই হয়ত সে একেবারে সারিয়া উঠিতে পারিতেছে না, কাজে কর্মে মন দিলে হয়ত সুস্থ হইবে!

চুলে শীতলের পাক ধরিয়াছে। বিবর্ণ কপালের ঠিক উপরে এক-গোছা চুল একেবারে সাদা হইয়া গিয়াছে। না, বয়স শীতলের কম হয় নাই। বিবাহ সে বেশি বয়সেই করিয়াছিল, বয়স এখন ওর পঞ্চাশের কাছে গিয়াছে বৈকি। তবু, পঞ্চাশ বছর বয়সে পুরুষ মানুষ কি রোজগার করে না? হারান পঁয়ষট্টি বছর পর্যন্ত কতটাকা উপার্জন করিয়াছে শীতল কি কিছু ঘরে আনিতে পারে না, যৎসামান্য? পঞ্চাশটা টাকা অন্তত? আর কিছু হোক বা না হোক, বিধানের পড়ার খরচ তো দিতে হইবে।

মৃদু মৃদু শীত পড়িয়াছে। কোঁচার খুট গায়ে জড়াইয়া বাহিরের অঙ্গনের জাম গাছটার গোড়ায় বেতের মোড়াতে বসিয়া শীতল তামাক টানে। বাড়ির পোষা কুকুরটা পায়ের কাছে মুখ গুঁজিয়া চুপচাপ শুইয়া থাকে মাঝে মাঝে শীতলের পা চাটিয়া দেয়। কুকুরটার সঙ্গে শীতলের বড় ভাব। কুকুরটাও তার বড় বাধ্য। শ্যামা কাছে আসিয়া মানুষ ও পশুর চোখ-বোজা নিবিড় তৃপ্তির আলস্য চাহিয়া দ্যাখে।

কিন্তু উপায় কি? শ্যামার আর কে আছে, কে তার জন্য বাহির হইবে উপার্জন করিতে?

ধীরে ধীরে মিষ্টি করিয়াই কথাগুলি সে বলে, ভীত বিস্মিত চোখে তার মুখের দিকে চাহিয়া শীতল শুনিয়া যায়। কিছু সে যেন বুঝিতে পারে না, সংসার, কর্তব্য, টাকার অভাব, খোকার পড়া সব জড়াইয়া শ্যামা যেন তাকে ভয়াবহ শাসনের ভয় দেখাইতেছে।

শীতল মাথা নাড়ে, সন্দিগ্ধভাবে। সে কি করিবে? কি করিবার ক্ষমতা তার আছে? শিশুর মত আহত কণ্ঠে সে বলে, আমার যে অসুখ গো?

অসুখ তা জানি, সেরে তো উঠেছ খানিকটা, ঠাকুরজামাইকে বলে কম

খাটুনিব একটা কাজ টাজ তুমি করতে পারবে। আমি আব কতকাল চালাব ?

বাড়ির টাকা পেলে, বাড়িটা কাব ?—শীতল বলে।

বটে! তাই তবে শীতল মনে কবিযাছে, তার বাড়িব টাকায় এতকাল চলিযাছে আর তাহাব কিছু কবিবাব প্রয়োজন নাই এতকাল সেই সংসাব চালাইযাছে এই কথা ভাবিযা বাখিযাছে শীতল ? এবাব তাই তাহাব বসিযা থাকাব অধিকার জন্মিযাছে!

এসব জ্ঞান তো টনটনে আছে দেখি বেশ ?—শ্যামা বলে।

কুকুবটা উঠিযা যায। শীতলের দৃষ্টি তাহাকে অনুসবণ কবে। তাবপব আবাব কাতব কণ্ঠে সে বলে আমাব অসুখ যে গো ?

একদিনে হাল ছাড়িবার পাত্রী শ্যামা নয। বাব বাব শীতলকে সে তাহাদেব অবস্থাটা বুঝাইবাব চেষ্টা কবে। কড়া কথা সে বলে না লজ্জা দেয না অপমান কবে না। আবাব বাহিব হইযা ঘবে টাকা আনা শীতলের পক্ষে এখন কত কঠিন সে তা বোঝে পাবুক না পাবুক গা ঝাড়া দিযা উঠিযা শীতল একবাব চেষ্টা কবুক এইটুকু শুধু তাব ইচ্ছা।

বাখালকে শ্যামা একদিন বলিযাছিল ঠাকুবজামাই আবাব তো আমি নিবুপায হলাম ?

কেন ? অতটাকা কি কবলে বৌঠান ? ব'লছিলাম টাকা তুমি বাখতে পাববে না—

ঠাকুবজামাই ছেলেকে আমাব বি-এটা আপনি পাশ কবিযে দিন।

পড়ার খবচ দেবাব কথা বলছ বৌঠান ?

হ্যাঁ বাখাল এবাব বাগ কবিযাছিল। সে কি বাজা না জমিদাব ? কতটাকা মাহিনা পায সে শ্যামা জানে না ? একি অন্যায কথা যে শ্যামা ভুলিযা যায ক্ষমতাব মানুষেব একটা সীমা আছে আজ কতবছব শ্যামা সকলকে লইযা এখানে আছে কত অসুবিধা হইযাছে বাখালেব কত টানাটানি গিযাছে তাহাব কিন্তু কিছু সে বলে নাই বলে নাই এই ভাবিযা যে যতদিন তাব দুমুঠা ভাত জুটিবে শ্যামার ছেলেমেযেকে একমুঠা তাকে দিতে হইবে সেটা তাব কর্তব্য। তাই কি শ্যামা যথেষ্ট মনে করে না একটা ছাঁপোষা মানুষেব পক্ষে ?

ঠাকুরজামাই, এ'কবছর আমিও তো কিছু কিছু সংসার খরচ দিয়েছি?

বলিয়া শ্যামা সঙ্গে সঙ্গে অনুতাপ করে। অনুগ্রহ চাহিতে আসিয়া এমন কথা বলিতে আছে! মুখখানা তাহার শুকাইয়া যায়! রাখাল বলে, তা জানি বৌঠান, আজ বলে নয় গোড়া থেকে জানি কৃতজ্ঞতা বলে তোমার কিছু নেই। যাক, আমার কর্তব্য আমি করেছি, নিন্দা প্রশংসার কথা তো আর ভাবিনি, এখানে থাকতেও তোমাদের আমি বারণ করিনে, তার বেশি আমি কিছু পারব না বৌঠান, আমায় মাপ কর—এই হাত জোড় করলাম তোমার কাছে।

শীতলের একটা ব্যবস্থা? বিধানের পড়ার খরচ না দিক শীতলের জন্য রাখাল কিছু করিতে পারে না?

শীতল? রাখাল অবাক হইয়া থাকে। শীতল চাকরী করিবে, ওই অসুস্থ আধপাগলা মানুষটা! কি বলছ বৌঠান তুমি, তোমার কি মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেছে?

আমার যে উপায় নেই ঠাকুরজামাই?

শেষে রাখাল বলে, আচ্ছা দেখি।

রাখাল সত্যই চেষ্টা করিল। শীতল বহুকাল কলিকাতার প্রেসে বড় চাকরি করিয়াছে, এই সব বলিয়া কহিয়া বোধ হয় স্থানীয় একটা ক্ষুদ্র ছাপাখানায় একটা কাজ সে যোগাড়ও করিয়া ফেলিল শীতলের জন্য। বেতন পনের টাকা। কাজ কর্ম দেখিবে, খাতা পত্র লিখিবে মফস্বলের ছোট ছাপাখানা, কাজ সামান্যই হয়, শীতল পারিবে হয়ত।

খবর শুনিয়া শীতল বিবর্ণ হইয়া বলিল, অসুখ যে আমার আমি পারব কেন? কলম ধরলে আমার যে হাত কাঁপে আমি যে লিখতে পারিনে রাখাল?

শ্যামা বলিল, আগে থেকে ভড়কাচ্ছ কেন বলত? গিয়েই দ্যাখো না পার কিনা, দুদিন যেতে আরম্ভ করলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

কোথায় পঞ্চাশ, কোথায় পনের। পঞ্চাশই বা কেন? ছাপাখানায় কাজ করিয়া তিনশ' টাকাও তো শীতল একদিন মাসে মাসে ঘরে আনিয়াছে। তবে আজ সে কথা ভাবা মিছে। সেদিন আর ফিরিবে না, সে শীতল নাই, সে

শ্যামাও নাই। পঞ্চাশ টাকার আশা করিয়া পনের টাকাতেই শ্যামা এখন খুসি হইতে জানে।

শীতল আপিসে যায়। ছাপাখানা প্রায় আধ মাইল দূরে। স্নান করিয়া খাইয়া শীতল ছেঁড়া কোটটি গায়ে চাপায়, বিষণ্ণ সকাতর মুখে হুকায় কয়েকটা শেষটান দিয়া মোটা লাঠিটা বাগাইয়া ধরে। বড় দুর্বল পা দুটি শীতলের, লাঠিতে ভর দিযা সে গুটিগুটি হাঁটিতে আরম্ভ কবে। পোষা কুকুরটি তখন উঠিয়া দাঁড়ায়, লেজ নাড়িতে নাড়িতে সে শীতলের সঙ্গে যায়। পুকুর ঘুরিয়া গলি পথ পাব হইয়া বড় সদব বাস্তা পর্যন্ত শীতলকে আগাইয়া দিয়া আসে।

বকুল চিঠি লিখিয়াছে, সে ভাল আছে। বিধান চিঠি লিখিযাছে সেও ভাল আছে। সকলে ভাল আছে।

শরীরটা শ্যামারও বহুকাল ভালই আছে। দুবেলা রাঁধে, সংসারেব কাজকর্ম করে, অবিশ্রাম খাটুনি শ্যামার, শক্ত সবল দেহ না থাকিলে কবে শ্যামা ক্ষয হইযা যাইত। এত খাটিতে হয কেন শ্যামাকে? আশ্রিতার সমস্ত অবসর মুহূর্তগুলি কেমন করিয়া কর্তব্যে ভরিয়া ওঠে কেহ টেরও পায না। একদিন দেখা যায় ভোব পাঁচটা হইতে রাত এগারোটা অবধি যত কাজ তার পক্ষে করা সম্ভব সব সে করিতেছে একা।

কস্তাপাড় মোটা একখানা সাড়ি পরিয়া শ্যামা কাজ কবে, দেখিয়া কে বলিবে সে এ বাড়ির দাসী নয়। হাতের চামড়া তাহাব কর্কশ হইয়াছে থাবা হইযাছে বড, আধমণ জলের বালতি সে অবলীলাক্রমে তুলিয়া নেয়, গাযে এত জোর। ছেলেমেযেরা বড় হইয়াছে, বাত্রে তাহাকে বারবার উঠিতে হয না, বিধানও এখানে নাই যে জাগিয়া বসিয়া সে তাহার পাঠরত পুত্রের দিকে চাহিয়া আকাশ পাতাল ভাবিবে, কাজকর্ম শেষ করিযা শোয়া মাত্র শ্যামা ঘুমাইয়া পড়ে, কোথা দিয়া রাত কাটিযা যায় সে টেরও পায় না। টাকার চিন্তা করে না শ্যামা? শীতলের পনের টাকার চাকরিতেই সে নির্ভাবনা হইয়া গিয়াছে নাকি! চিন্তার তাহার শেষ নাই। তবে রাত জাগিযা কোন ভাবনাই সে ভাবিতে পারে না। সারাদিন সহস্র কাজের সঙ্গে ভাবনাব কাজটাও সে করিয়া যায়, অনেকটা কলের মত, পাঠাভ্যাসের মত। এমনি হইয়াছে

আজকাল। আজীবন শ্যামা যে একা, কারো সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া ভাবিবার সুযোগ সে যে কোনদিন পায় নাই, অতীতের স্মৃতিতে, বর্তমানের সম্পদে বিপদে, ভবিষ্যতের জল্পনা-কল্পনায় চিত্ত তাহার নিঃসঙ্গ, নির্ভরহীন।

ফণী একবার নিউমোনিয়ায় মরমর হইয়া বাঁচিয়া উঠিল, মন্দার যমজ ছেলে দুটির একজন, সে কালু, মরিল জ্বর-বিকারে। পড়াশোনা ভাই দু'টি বেশি দূর করে নাই, পাটের ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিল। গত বছর একদিনে এক লগ্নে দু'ভাইএর বিবাহ দিয়া মন্দা আনিয়াছিল দু'টি বৌ! শ্যামার জীবনে ওদের বিশেষ কোন স্থান ছিল না, কালুর মরণ শ্যামার কাছে বিশেষ কিছু শোচনীয় ব্যাপার নয়, তবু সেও যেন গভীর শোক পাইল। মন খারাপ হইয়া যাওয়া আশ্চর্য ছিল না। মামী বলিয়া কোনদিন খাতির না করুক, আশ্রিতা বলিয়া মাঝে মাঝে অপমানজনক ব্যবহার করুক, যত্ন করিয়া ওকে তো দুবেলা সে ভাত বাড়িয়া দিয়াছে। কিন্তু এমন শোক কেন, পুত্রশোকের মত? কালুকে মনে করিয়া, কচি বৌটার বিধবার বেশ দেখিয়া শ্যামার বুকের ভিতরটা পাক দিয়া যেন ভাঙিয়া যাইতে লাগিল, উন্মাদিনী মন্দাকে দু'টি সবল বাহু দিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিয়া অসহ্য বেদনায় শ্যামাও অজস্র চোখের জল ফেলিল। কেন তার এই অস্বাভাবিক ব্যথা?

পরে মন্দার শোকও যখন শান্ত হইয়া আসিয়াছে তখনও শ্যামা যেন অশান্ত হইয়া রহিল মনে মনে। রহস্যময় মনোবেদনা নয়, সাময়িক মনোবিকার নয় একটা দিনও যে হাসিয়া কথা বলে নাই সেই কালুর জন্য স্পষ্ট দুরন্ত জ্বালা! শ্যামার মত কালুর বৌও অল্প বয়সে বাপ-মাকে হারাইয়াছিল, হঠাৎ শ্যামা যেন তার জন্য পাগল হইয়া উঠিল, নিজের মেয়েকেও সে বুঝি এত ভাল কখনো বাসে নাই। বৌএর বিধবা বেশ মন্দা দেখিতে পারে না, নিজের শোক লইয়াই সে বিব্রত, বৌ সামনে গেলে কখনো সে শাপিতে আরম্ভ করে, বৌকে বলে মানুষখেকো রাক্ষুসী, আবার কখনো বুকে জড়াইয়া হা হা করিয়া কাঁদে, তারপরেই দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দেয়, চোখের সামনে থেকে সরে যা তুই, সরে যা অলক্ষ্মী। শ্যামার মমতায় কালুর বৌ বড় একটি আশ্রয় পাইল। শ্যামার প্রশস্ত বুকে মাথা রাখিয়া সজল চোখে সে ঘুমায়, জাগিয়া ওঠে শ্যামারই বুকে, সারারাত ঠায় একভাবে কাটাইয়া

শ্যামার পিঠের মাংসপেশী খিঁচিয়া ধরিয়াছে তবু সে নড়ে নাই, কর্ণ যে ভাবে বজ্রকীটের কামড় সহিয়াছিল তেমনি ভাবে দেহের যাতনা সহিয়াছে,—নড়িতে গেলে ঘুম ভাঙিয়া বৌ যদি আবার কাঁদে?

কালুর জন্য শ্যামার শোক কেন বুঝিতে না পারা যাক, কালুর বৌএর জন্য তার ভালবাসা নিশ্চয় বকুলেব বিবহ? কিন্তু তা যদি হয় তবে কালুর জন্য শ্যামার এই শোক বিধানের বিরহ হইতে পাবে তো'

ওসব নয়। আসলে শ্যামার মনটাই আগলা হইয়া আসিতেছে, পচিযা যাইতেছে। গোড়াতে সাত বছর একদিকে পাগলা শীতলেব সঙ্গে বাস করিতে কবিতে কাঁচা বযসের মনটা তাহার কুঁক্‌ড়াইযা গিযাছিল, অন্যদিকে ছিল মাতৃত্বলাভের প্রাণপণ প্রযাসের ব্যর্থতা—দু'টি একটি সঙ্গী অথবা আত্মীয-স্বজন থাকিলে যাহা তাহাব এতটুকু ক্ষতি করিতে পারিত না, ' কিন্তু একা পাইয়া সাত বছবে যাহা তাহাকে প্রায় কাবু করিয়া আনিযাছিল,—এতকাল পবে এখন, জীবন-যুদ্ধে পবিশ্রান্ত মনটাতে যখন তাহার আর তেমন তেজ নাই, সেই অস্বাভাবিকতা, সেই বিকাব আবার অধিকার বিস্তার করিতেছে।

মানুষ নয় শ্যামা? জীবনের তিনভাগ কাটিয়া গেল, এর মধ্যে এক-দিন সে বিশ্রাম পাইযাছে? দেহের বিশ্রাম নয। দেহ তার ভালই আছে, গর্ভেব নবাগত সন্তানকে বহিয়া সে কাতর নয। বিশ্রাম পায় নাই তার মন। এখন তাহার একটু সুখ শান্তি ও স্বাধীনতার প্রযোজন আছে বৈকি। প্রসবের তিন-দিন আগেও শ্যামা একা একশ' জনের ভোজ রাঁধিয়া দিবে, শুধু পরের আশ্রয হইতে এবার তাকে লইযা চল, ভবিষ্যতকে একটু নিরাপদ করিয়া দাও, আর ওষুধের মত পথ্যেব মত একটু স্নেহ দাও শ্যামাকে। একটু নিঃস্বার্থ অকারণ মমতা।

স্বামী আর আত্মীয়স্বজন শ্যামার সেবা লইয়াছে। সন্তান লইযাছে সেবা ও স্নেহ। প্রতিদানে সেবা শ্যামা চায় না। আজ শ্যামাকে কেহ একটু স্নেহ দাও?

. বড়দিনের সময় বিধান আসিলে সুপ্রভা বলিল, বড় হয়েছো তুমি তোমার সব বোঝা উচিত বাবা, বাপ তো তোমার সাতেও নেই পাঁচেও নেই—মার দিকে একটু তাকাও? কি রকম হয়ে যাচ্ছে দেখতে পাও না? চাউনি

দেখলে বুকের মধ্যে কেমন করতে থাকে সেদিন দেখি বিড়বিড় করে কি সব বকছে আপন মনে, আমার তো ভাল মনে হয় না।

বিধানের দু'চোখ ভরা রোষ, বলিল তবু তো খাটিয়ে মারছেন।

সুপ্রভা আহত হইয়া বলিল আমাকে তুমি এমন কথা বললে বিধান, কত বলেছি আমি তুমি তার কি জানবে? মাকে তোমার একদণ্ড বসিয়ে রাখার সাধ্যি আছে কারো? নইলে এতলোক বাড়িতে, তোমার মা কিছু না করলে কাজ কি এ বাড়ির আটকে থাকবে?—সুপ্রভা অভিমান করিল বেশ আমরা না হয় পর তুমি তো এসেছ এবার পার যদি রাখ না মাকে তোমার বসিয়ে?

বিধান কারো অভিমানকে গ্রাহ্য করে না বলিল না ছোট পিসি মাকে আর এখানে আমি রাখব না, আমি নিতে এসেছি মাকে।

ওমা, কোথায়? কোথায় নিয়ে যাবে?

খবর রটিবামাত্র সুপ্রভার মুখের এই প্রশ্ন সকলের মুখে গুঞ্জরিত হইতে থাকে। বিধান শ্যামাকে লইতে আসিয়াছে? মাকে আর এখানে সে রাখিবে না? কোথায় লইবে? কার কাছে? অতটুকু ছেলে এখনো বি এটা পর্যন্ত পাশ দেয় নাই এসব কি মতলব সে করিয়াছে?

পড়া ছেড়ে দিয়েছিস খোকা? চাকরি নিয়েছিস? আমাকে না বলে এমন কাজ কেন করতে গেলি বাবা—বলিয়া শ্যামা কাঁদিতে আরম্ভ করে।

বিধান বলে কাঁদছ কেন, এ্যাঁ? ভাল খবর আনলাম কোথায় আহ্লাদ করবে তা নয় তুমি কান্না জুড়ে দিলে? পাশ তো দিতাম চাকরির জন্যে? ভাল চাকরি পেয়ে গেলাম আর পাশ দিয়ে কি করব? ব্যাঙ্কে লোক নেবার জন্য পরীক্ষা হল শংকর আমাকে পরীক্ষা দিতে বললে পাশ টাশ করব ভাবিনি মা তিনশ' ছেলের মধ্যে থার্ড হয়ে গেলাম। প্রথম সাতজনকে নিলে—নব্বই টাকায় সুরু।

নব্বই? বিশ পঁচিশ টাকার কেরাণী বিধান তবে হয় নাই? শ্যামা একটু শান্ত হয়, বলে, আমায় কিছু লিখিসনি যে?

এটা বোঝানো একটু কঠিন শ্যামাকে। পড়াশোনা করিয়া বিধান এক দিন বড় হইবে, এত বড় হইবে যে চারিদিকে রব উঠিবে ধন্য ধন্য—শ্যামার

এ স্বপ্নের খবব বিধানেব চেযে কে ভাল কবিযা বাখে? তাই পড়া ছাড়িযা চাকবি লইযাছে চিঠিতে শ্যামাকে একথা লিখিতে বিধানেব ভয হইয়াছিল। শুধু তাই নয। বিধান ভাবিযাছিল সে দু'শ চাবশ' টাকাব চাকরি করিবে এই প্রত্যাশায শ্যামা দিন গুনিতেছে নব্বই টাকার চাকবি শুনিযা সে যদি ক্ষেপিযা যায?

পবীক্ষা পর্যন্ত আবও একটা বছব ছেলেব পডাব খরচ দিতে পারিবে না ভাবিযাই শ্যামা যে ক্ষেপিযা যাইতে বসিযাছিল বিধান তো তাহা জানিত না চাকবিটা তাহাব নব্বই টাকাব শুনিযাই শ্যামা এমনভাবে কৃতার্থ হইযা গেল যে বিধান অবাক হইযা বহিল। সন্দিগ্ধভাবে সে জিজ্ঞাসা কবিল খুসি হওনি মা তুমি?

খুসি হয নাই! -খুসিতে শ্যামা আবোল তাবোল বকিতে আবম্ভ কবে এতকাল শ্যামাকে যাবা অবহেলা অপমান কবিযাছে তাদেব টিটকাবি দেয কলিকাতায মস্ত বাড়ি ভাডা নেয বকুলকে আনে বিধানেব বিবাহ দেয, দাস দাসীতে ঘববাডি ভাবযা ফেলে। তাবপব হাসিমুখে সকলকে ডাকিযা বিধানেব চাকবিব কথা শোনায তাব দুধেব ছেলে নব্বই টাকাব চাকবি যোগাড কবিযাছে কাবো সাহায্য চায নাই কাবো তোষামোদ কবে নাই—বল তো বাছা এবাব তাদেব মুখ বইল কোথায ছেলেকে আমাব পডাব খবচটুকু পর্যন্ত যাবা দিতে চায নি? কথাবার্তা শুনিযা মনে হয শ্যামা সত্যই বড অকৃতজ্ঞ! এতগুলি বছব যাব আশ্রযে সে থাকিযাছে এখন ছেলেব চাকবি হওযামাত্র নিন্দা আবম্ভ কবিযাছে তাব। এবা যে কত কবিযাছে তাব জন্য সব সে ভুলিযা গিযাছে, মনে বাখিযাছে শুধু ত্রুটি বিচ্যুতি, অপমান অবহেলা! মন্দা বাগিযা বলে ধন্যি তুমি বৌ, এতও ছিল তোমাব পেটে পেটে! এত যদি কষ্ট পেযেছ তুমি এখেনে থেকে থাকলে কেন? নিজেব বাজ্যপাটে গিযে বসলে না কেন বাজবাণী হযে? আজ পাঁচ বছর তোমাদেব পাঁচটি প্রাণীকে আমি পুষলাম ছেলে পডালাম মেযে বিযে দিলাম তোমাব, আজ দিন পেযে আমাদেব তুমি শাপছ!

অবাক হইযা শুনিযা শ্যামা কাঁদিতে কাঁদিতে বলে, না ঠাকুরঝি, তোমাদেব কিছু বলিনি তো আমি কেন বলব তোমাদেব? কম কবেছ আমার

তোমরা! আমাকে কিনে রেখেছ ঠাকুরঝি, তোমাদের ঋণ আমি সাত জন্মে শোধ দিতে পারব না। তোমাদের নিন্দে করে একটি কথা কইলে মুখ আমার খসে যাবে না, কুষ্ঠ হবে না আমার জিভে!—বলে আর হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া শ্যামা ভাসাইয়া দেয়।

শ্যামা কি পাগল হইয়া গিয়াছে? এতদিনে তার আবার সুখের দিন সুরু হইল, এমন সময় মাথাটা গেল তার খারাপ হইয়া? অনেক বলিয়া বিধান তাহাকে শোয়াইয়া রাখিল, বারবার জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কি হয়েছে মা?—তারপর শ্যামা অসময়ে আজ ঘুমাইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ ঘুমাইয়া সে যখন জাগিল আর তাকে অশান্ত মনে হইল না। সে শান্ত নীরব হইয়া রহিল।

কত কথা শ্যামার বলিবার ছিল, কত হিসাব কত পরামর্শ, কিন্তু এক অসাধারণ নীরবতায় সব চাপা পড়িয়া রহিল। বিধান বলিল, কলিকাতায় সে বাড়ি ভাড়া করিয়া আসিয়াছে, শ্যামা জিজ্ঞাসাও করিল না কেমন বাড়ি, ক'খানা ঘর, কত ভাড়া। এতকাল এখানে থাকিয়া তার চাকরি হওয়ামাত্র একটা মাসও অপেক্ষা না করিয়া সকলের চলিয়া যাওয়াটা বোধ হয় ভাল দেখাইবে না, বিধান এই কথা বলিলে শ্যামা সায় দিয়া গেল। কিন্তু ঝোঁকের মাথায় বাড়িটাড়ি যখন সে ঠিক করিয়াই আসিয়াছে দুচার দিন পরে চলিয়া তাদের যাইতে হইবে, বিধান এই কথা বলিলে শ্যামা তাতেও সায় দিল। ছেলের সব কথাতেই সে সায় দিয়া গেল।

শেষে বিধান বলিল, পড়া ছেড়েছি বলে তুমি নিশ্চয় রাগ করেছ মা?

শ্যামা একটু হাসিল, না খোকা রাগ করিনি, বড় হয়েছ এখন তুমি বুঝে শুনে যা করবে তাই হবে বাবা, তোমার চেয়ে আমি তো ভাল বুঝিনে, আমার বুদ্ধি কতটুকু?

কাজে যোগ দিতে বিধানের দিন দশেক দেরি ছিল, যাই যাই করিয়াও দিন সাতেক এখানে তাহারা রহিয়া গেল। শীতল চাকরি ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত মনে জামগাছের তলে বসিয়া তামাক টানিতে লাগিল, পোষা কুকুরটি শুইয়া রহিল তাহার পায়ের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া। শীতলের ইচ্ছা আছে কুকুরটিকেও সঙ্গে লইয়া যাইবে কলিকাতায়, কিন্তু মনের ইচ্ছা প্রকাশ করিতে তার সাহস হইল না।

পাগল হওয়ার আর কোন লক্ষণ শ্যামার দেখা গেল না, সেদিন ঘুমাইয়া উঠিয়া তার যে অসাধারণ নীরবতা আসিয়াছিল তাই শুধু কায়েমি হইয়া রহিল। আর যেন তাহার কোন বিষয়ে দায়িত্ব নাই, মতামত নাই, সে মুক্তি পাইয়াছে। জীবন যুদ্ধ তাহার শেষ হইয়া গিয়াছে এবার বিধান লড়াই চালাক, বিধান সব ব্যবস্থা করুক, সংসারের ভাল মন্দের দায়িত্ব থাক বিধানের শ্যামা কিছু জানে না, জানিতে চাহে না,—ঘরের মধ্যে অন্তঃপুরের গোপনতায় তার যা কাজ এবার তাই শুধু সে করিবে : উপকরণ থাকিলে রাঁধিয়া দিবে পোলাউ, না থাকিলে দিবে শাক ভাত। বিধান তাহাকে এখানে রাখিলে এখানেই সে থাকিবে, কলিকাতা লইয়া গেলে কলিকাতা যাইবে সব সমান শ্যামার কাছে। বিধানের চাকুরি-লাভও শ্যামার কাছে যেন আর উল্লাসের ব্যাপার নয় খুবই সাধারণ ঘটনা। এই তো নিয়ম সংসারের? স্বামী পুত্র উপার্জন করে স্ত্রী ও জননী ভাত রাঁধে। আর ভালবাসে। আর সেবা-যত্ন করে। আর নির্ভয় নিশ্চিন্ত হইয়া থাকে অক্ষয় অমর একটি নির্ভরে।

শহরতলীতে নয় এবার খাস কলিকাতায় নূতন বাড়িতে শ্যামা নূতন সংসার পাতিল। বাড়িটা নূতন সন্দেহ নাই এখনো রঙের গন্ধ মেলে। দোতালা বাড়ি একতলাতে বাড়িওলা থাকে' দোতালার মাঝামাঝি কাঠের ব্যবধান প্রত্যেক ভাগে দু'খানা ঘর। রান্নার জন্য ছাদে দুটি ছোট ছোট টিনের চালা। শ্যামারা থাকে দোতালার সামনের অংশটিতে, রাস্তার উপরে ছোট একটু বারান্দা আছে। একটি স্বামী ও দুটি কন্যা সহ অপর অংশে বাস করে শ্রীমতী সরযূবালা দে পাশকরা ধাত্রী।

সরযূ যেমন বেঁটে তেমনি মোটা, ফুটবলের মত দেখিতে। দেহের ভারেই সে যেন সব সময় হাঁপায়। কাজে যাওয়ার সময় সে যখন সাদা কাপড় ঢাকা রিক্সায় চাপে আর শীর্ণকায় কুলিটি রিক্সা টানিয়া লইয়া যায় উপর হইতে দেখিয়া শ্যামা হাসি চাপিতে পারে না।

সরযূর মেয়ে দুটি সুন্দরী। বড় মেয়েটির নাম বিভা বিধানের সে সমবয়সীই হইবে মেয়ে স্কুলে গান শেখায়। ছোট মেয়েটির নাম শামু, বিধানের বৌ হইলে মানায় এমনি বয়স, পড়ে স্কুলে। সরযূর সাধ শামুকে

মেডিকেল কলেজ হইতে পাশ করাইয়া একেবারে ডাক্তার করিয়া ছাড়িবে—পাশ করা ধাত্রী নয়, লেডি ডাক্তার। লেডি ডাক্তাররা বড় অবজ্ঞার চোখে দেখে সরযূকে, এতটুকু নিজের বুদ্ধি খাটাইতে গেলেই বকে। মেয়েকে এম. বি করিতে পারিলে গায়ের জ্বালা সরযূর হয়ত একটু কমিবে—অন্তত তাই আশা।

ওমা, সে কি, মেয়েদের বিয়ে দেবেন না দিদি? শ্যামা বলে।

করুক না বিয়ে? আমি কি ধরে রেখেছি? -বলিয়া সরযূ হাসে।

ওদের ব্যাপারটা শ্যামা ভাল বুঝিতে পাবে না। সরযূর স্বামী নৃত্যলাল কিছু করে না, বসিয়া বসিয়া খায় শীতলের মত, তবু গরীব ওরা নয়। সরযূ নিজে মন্দ রোজগার করে না, বিভাও পঞ্চাশ টাকা করিয়া পায়। কানা খোঁড়া কুৎসিতও নয় মেয়ে দুটি সরযূর। বিবাহ দেয় না কেন ওদের? বাধা কিসের? বিভার মত বয়স পর্যন্ত বকুলকে অবিবাহিতা রাখিলে শ্যামা তো ক্ষেপিয়াই যাইত! ভাবনা হয় না সরযূর?

কি আনন্দেই ওরা দিন কাটায়! সাজিয়া গুজিয়া ফিটফাট হইয়া থাকে, গান করে, গ্রামোফোন বাজায়, দিবারাত্রি শ্যামার কানে ভাসিয়া আসে ওদের হাসির শব্দ। মেয়ে দুটি শুধু নয়, মোটা সরযূ পর্যন্ত যেন উল্লাসের একটা হাল্কা হিল্লোলে ভাসিয়া বেড়ায়। বাপ মা আর মেয়েরা যেন বন্ধু, সমান-ভাবে তাহারা হাসি-তামাসা করে, তাস খেলে চারজনে মিলিয়া, একসঙ্গে সিনেমা দেখিতে যায়। বাড়িতে লোকজনও কি আসে কম! সকলে তাহারা-ধাত্রী ডাকিতে আসে না। অনেক বন্ধুবান্ধব আছে ওদের,—স্ত্রী ও পুরুষ। তাদের মধ্যে কয়েকটি যুবক যে প্রায়ই কেন আসে শ্যামা তাহা বেশ বুঝিতে পারে। কাঠের বেড়ার একটি ফোকরে চোখ রাখিয়া ও-বাড়িতে পুরুষ ও নারীর নিঃসঙ্কোচ মেলামেশা দেখিয়া শ্যামা থ বনিয়া যায়, গান শুনিতে শুনিতে তাহার ভাত পোড়া লাগে।

বিভা এ-বাড়িতে বেশি আসে না, সে একটু অহঙ্কারী। শামু হরদম আসা-যাওয়া করে। শামুর প্রকৃতিটা শ্যামার একটু অদ্ভুত মনে হয়, একদিকে যেমন সে সরল অন্যদিকে আবার তেমনি পাকা। পোকায় কাটা ফুলের মত সে, খানিক অসাধারণ ভাল খানিক অসাধারণ মন্দ। এমনি বয়সে বিবাহ

হইয়া বকুল শ্বশুরবাড়ি গিয়াছে, মেয়েটাকে শ্যামার একটু ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়, শিশুর মত সরল আগ্রহের সঙ্গে শামু তাহার ভালবাসাকে গ্রহণ করে, শ্যামা হয় খুসি। কিন্তু বিধানের সঙ্গে শামুর আলাপ করিবার ভঙ্গিটা শ্যামার ভাল লাগে না। কেমন সব হেঁয়ালিভরা ঠাট্টা শামু করে, কেমন দুষ্টু দুষ্টু মুচকি হাসি হাসে, আড়চোখে কেমন করিয়া সে যেন বিধানের দিকে তাকায়, —সকলের সামনে কি একটা অদ্ভুত কৌশলে সে যেন গোপন একটা ভাবতরঙ্গ তার আর বিধানের মধ্যে প্রবাহিত করিয়া রাখে। অতিশয় দুর্বোধ্য, সূক্ষ্ম ও গভীর একটা লুকোচুরি খেলা। শ্যামা কিছু বুঝিতে পারে না, তবু ভালও তাহার লাগে না। একটু সে সতর্ক হইয়া থাকে। শামু বিধানের ঘরে গেলে মাঝে মাঝে নানা ছলে দেখিয়া আসে ওরা কি করিতেছে। কোনদিন শামুকে বিধান পড়া বলিয়া দেয়, সেদিন শামুর শ্রদ্ধাপূর্ণ নিরীহ ভাবটি শ্যামার ভাল লাগে। কোনদিন বিধান জ্ঞানবিজ্ঞানের কথা বলে, বুঝিতে না পারিয়া শামু ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকায়, আর থাকিয়া থাকিয়া ঢোক গেলে, সেদিনও শ্যামার মন্দ লাগে না। সে অসন্তুষ্ট হয় সেদিন, যেদিন শামু করে দুষ্টামি। দরজার বাহিরে শ্যামা থমকিয়া দাঁড়ায়। চোখ ঘুরাইয়া মুখভঙ্গি করিয়া শামু কথা বলে, বিধানের মুখের কাছে তর্জনী তুলিয়া শাসায়, তারপর হাসিয়া যেন গলিয়া পড়ে— দেখিয়া রাগে শ্যামার গা রি রি করিতে থাকে। একি নির্লজ্জ ব্যবহার অতবড় আইবুড়ো মেয়ের! এত কিসের অন্তরঙ্গতা? বিধান ওকে এত প্রশ্রয় দেয় কেন?

ঘরে ঢুকিয়া শ্যামা বলে, কি হচ্ছে তোদের!--খুব সাবধানে বলে। বিধান না টের পায় সে অসন্তুষ্ট হইয়াছে।

শামু বলে, মাসিমা, আপনার ছেলে বাজি হেরে দিচ্ছে না-- দিন তো শাসন করে?

কিসের বাজি বাছা?—শ্যামা বলে।

বললে জিভ দিয়ে আমি যদি নাক ছুঁতে পারি দু'টাকার সন্দেশ খাওয়াবে। নাক ছুলাম, এখন দিচ্ছে না টাকা।

জিভ দিয়া নাক ছোঁয়া? এই ছেলেমানুষী ব্যাপার লইয়া ওদের হাসাহাসি? ছি, কি সব ভাবিতেছিল সে! তার সোনার টুক্‌রো ছেলে, তার

সম্বন্ধে ওকথা মনে আনাও উচিত হয় নাই। শ্যামা অপ্রতিভ হইয়া যায়।

বিভা আসিলে বসে না, দাঁড়াইয়া দু'চারটি কথা বলিয়া চলিয়া যায়। আঁচল লুটানো শিথিল-কবরী বিলাসী বাবু মেয়ে সে, উদাসী আনমনা তার ভাব, এ বাড়ির সকলের কত গভীর অপরাধ সে যেন ক্ষমা করিয়াছে এমনি উদার ও নম্র তাহার গর্ব। রাজরাণী যেন সখ করিয়া দরিদ্র প্রজার গৃহে আসিয়াছে স্মিত একটু হাসি, ছেঁড়া লেপ তোষক ভাঙ্গা বাক্স প্যাঁটরা ময়লা জামা কাপড় দেখিয়াও নাক-না-সিঁটকানোর মহৎ উদারতা, এই সব উপহার দিয়া সে চলিয়া যায়। বসিতে বলিলে বলে, এই যে বসি, বসার জন্য কি, বসেই তো আছি সারাদিন! এদিক ওদিক তাকায় বিভা, শ্যামার হাঁড়ি কলসী, লোহার চায়ের কাপ, ছেঁড়া চটের আসন, গোবর লেপা ন্যাতা সব লক্ষ্য করে—কিন্তু না, বিভার স্বপন-লাগা চোখে সমালোচনা নাই। কৃত্রিম না-থাকা নয়, সত্যই নাই। শ্যামা গামছা পরিয়া গা ধোয় বলিয়া বিভা তাকে অসভ্য মনে করে না, হাসে না মনে মনে। সে শুধু দুঃখ পায়। তার দয়া হয়। খাঁটি সমবেদনার সঙ্গেই সে মনে করে যে আহা, একটু শিক্ষা দীক্ষা পাইলে এমনটা হইত না, সকলের সামনে গামছা পরিতে শ্যামা লজ্জা পাইত।

হাসি যদি কখনো পায় বিভার, সে বিধানের জন্য। হঠাৎ ঘর হইতে বাহির হইয়া বিভাকে দেখিলে আবার সে ঘরে ঢুকিয়া যায়, বিভা যেন অসূর্যম্পশ্যা অন্তঃপুরচারিণী, নিচের বাড়িওয়ালার মেয়ে-বৌএর মত লজ্জাশীলা। বিধান নিজে লজ্জা পাইয়া সরিয়া গেলে কথা ছিল না, বিভার লজ্জা বাঁচানোর জন্য ভদ্রতা করিয়া সে সরিয়া যায় বলিয়াই বিভার হাসি পায়।

আপনার বড় ছেলে বুঝি?—সে জিজ্ঞাসা করে।

শ্যামা বলে, হ্যাঁ।

এত অল্প বয়সে পড়া ছেড়ে চাকরিতে ঢুকেছেন?

দুঃখের সংসার মা, উপায় কি! নইলে ছেলে আমার বড় ভাল ছিল পড়াশোনায়, ওর কি এ সামান্য চাকরি করার কথা?—বলিয়া শ্যামা নিশ্বাস ফেলে, কি পরীক্ষা দিয়ে ডেপুটি হয় না, তাই দেবার জন্যে তৈরি হচ্ছিল, ভগবান বিরূপ হলেন।

বিভা বলে, ও।

শ্যামার একদিকের প্রতিবেশিরা এমনি। নিচের তলার বাড়িওলা তাদের মতই ঘরোয়া গৃহস্থ মানুষ, সরযূদের মত উড়ু উড়ু পাখী নয। শ্যামার মত তাদেরও ছোট-ছেলের-গন্ধভরা ছেঁড়া লেপতোষক! কর্ত্তা ছিলেন আদালতের পেস্কার, পেনসন লইয়া এখন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেন। প্রতি মাসের দুই তারিখে সকালবেলা ভাড়ার রসিদ হাতে সিঁড়িব শেষ ধাপে উঠিয়া ডাকেন, বিধানবাবু! নেত্যবাবু! আছেন না কি?

বাড়িওলাব ছেলেমেয়ে বৌ নাতিনাতনিতে একতলাটা বোঝাই হইয়া থাকে, –ক'খানা মাত্র ঘর, কি করিয়া ওদেব কুলায় কে জানে! তিনটি বিবাহিত পুত্রকে তিনখানা ঘর ছাড়িযা দিলে বাকি সকলে থাকে কোথায়? বাকি ঘর তো থাকে মোটে একখানি। কর্তা গিন্নি, একটি বিধবা মেয়ে, ছোট মেয়ে আর মেয়ের জামাইও এখানে থাকে তাবা, পেটেণ্ট ওষুদেব ক্যানভাসার ভাইপোটি, সকলে ওই একখানা ঘরে থাকে নাকি? প্রথমটা শ্যামার বড় দুর্ভাবনা হইত। তাবপর একদিন বাত্রে বাঁধিযা বাড়িযা বাড়িওলা গিন্নির সঙ্গে খানিক আলাপ করিতে গিযা সে ব্যাপার বুঝিযা আসিয়াছে। বড দুখানা ঘরের প্রত্যেকটির মাঝামাঝি এ দেযাল হইতে ও দেয়াল পর্যন্ত তার টাঙ্গানো আছে, তাতে ঝুলানো আছে ছিটেব পর্দা। দিনেব বেলা পর্দা গুটানো থাকে, রাত্রে পর্দা টানিযা দুখানা ঘবকে চাবখানা করিযা তিন ছেলে আর মেযে-জামাই শযন করে। পর্দাব উপবে একটি বিদ্যুতেব বাতি জ্বালিযা দুদিকেব দম্পতিকে আলো দেয।

সিঁড়ির নিচে যে স্থানটুকু আছে ক্যানভাসার ভাইপোটি সেখানে থাকে। নাম তাহার বনবিহারী। সিঁড়ির উপরে রেলিং ঘেঁষিয়া দাঁড়াইলে নিচে বনবিহারীকে দেখিতে পাওযা যায। সারাদিন বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া রাত্রি আটটা ন'টার সময় সে ফিবিয়া আসে। ওষুধেব সুটকেশটি চৌকির নিচে ঢুকাইয়া জামাটি খুলিয়া সে পেরেকে টাঙ্গাইয়া দেয়, কাপড় গায়ে দিয়া চৌকিতে বসিযা জুতার ফিতা খোলে। তারপর চৌকিতে পা তুলিয়া নিজের পা টিপিতে আবন্ত করে নিজেই। হঠাৎ বাড়িওলা গিন্নি ডাক দেয়, বনু এলি, বনু? পাঁউরুটি আনা হয় নি, ভোলা ভুলে এসেছে, যা তো বাবা মোড়ের

দোকান থেকে চট করে একটা রুটি নিয়ে আয়,—সকালে উঠে খাই খাই করে সবাই তো খাবে আমায়। কোনদিন বড়বৌ কোলের ছেলেটিকে দিয়া যায়, বলে, দেখো তো ভাই পার নাকি ঘুম পাড়াতে হে'টে হে'টে? ডানা আমার ছি'ড়ে গেল। কোনদিন বাড়িওলা স্বয়ং আসেন দাবার ছক লইয়া, বলেন, আয় বনু বসি একদান।—বনুর ভাত ঢাকা দিয়ে রাখো বৌমা, দুধ থাকে তো দিও দিকি বনুকে একটু, দু' হাতাই দিও,—ক্ষীর করে রাখ বাকিটা। কালের মত ঘন কোরো না বাছা ক্ষীর, ঘন ক্ষীর খেয়ে আজ পেট কামড়েছে,—পাতলাই রেখো আর চিনি দিও একটু। ভানু, ও ভানু, তামাক দে দিকি মা—বড় কলকেতে দিস বেশি তামাক দিয়ে।

এসব দেখিয়া শুনিয়া শ্যামার চোখে যদি জল আসিত, সে জল সোজা গিয়া পড়িত বনবিহারীর মাথায় পথের ধুলোয় ধুসর রুক্ষ চুলে। এক এক-দিন বিভা আসিয়া দাঁড়ায়। ঝু'কিয়া দেখিয়া ফিস ফিস করিয়া বলে, অনেক মানুষ দেখেছি, এমন বোকা কখনো দেখিনি মাসিমা। এমন করে এখানে তোর পড়ে থাকা কেন? মেসে গিয়ে থাকলেই হয়!

রোজগারপাতি বুঝি নেই।—শ্যামা বলে।

কুড়ি পঁচিশ ও যা পায় মাসিমা, একজনের পক্ষে তাই ঢের। তা'ছাড়া এমন করে থাকার চেয়ে না খেয়ে মরাও ভাল।—পুরুষমানুষ নয় ও!

রাগে বিভা গরগর করে। শ্যামা একটু অবাক হয়, এত রাগ কেন বিভার? কোথায় কোন কাপুরুষ যুবক ক্রীতদাসের জীবন যাপন করে খেয়াল করিয়া বিচলিত হওয়ার স্বভাব তো বিভার নয়! হঠাৎ বিভা করে কি, ঝু'কিয়া ডাক দেয়, বনুবাবু, মা আপনাকে ডাকছেন, উপরে আসবেন একবার?

বনবিহারী মুখ তুলিয়া তাকায়, বলে, যাই।

সে উঠিয়া আসিলে শ্যামাকে অবাক করিয়া দিয়া বিভা তাহাকে বকে। রীতিমত ধমকায়। বলে, কি যে প্রবৃত্তি আপনার বুঝিনে কিছু, একেবারে আপনার ব্যাক্‌বোন নেই, সারাদিন ঘুরে এত রাত্রে ফিরে এলেন এখনও আপনাকে সংসারের কাজ করতে হবে? কেন করেন আপনি? আমি হলে তো সবাইকে চুলোয় যেতে বলে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়তাম, এত কি আহ্লাদ সকলের! বিনে মাইনের চাকর নাকি আপনি!—এমনি ভাবে কত

কথাই যে বিভা তাহাকে বলে। বলে সংসাবে এমন নিবীহ হইযা থাকিলে চলে না। একটু শক্ত হইতে হয। অপদার্থ জেলিফিশ তো নয বর্নবিহাবী!

বলিতে বলিতে এত বাগিযা ওঠে বিভা যে হঠাৎ মুখ ঘুবাইযা গটগট কবিযা সে ভিতবে চলিযা যায। মুখ নিচু করিযা বর্নবিহাবী নামে নিচে। শ্যামা দাঁডাইযা দাঁড়াইযা ভাবিতে থাকে যে বিভা অনেকদিন এখানে আছে বর্নবিহাবীব সঙ্গে পবিচয তাহাব অনেক দিনেব বিভাব গাযে পড়িযা বকাবকি কবাটা যেমন বিসদৃশ শোনাইল আসলে হযত তা তেমন খাপছাডা নয।

এখানে আসিযা অল্পে অল্পে শ্যামাব মন কিছু সুস্থ হইযাছে।

তবে শ্যামা আব সে শ্যামা নাই। বনগাঁযে হঠাৎ সে যেবকম শান্ত ও নির্বাক হইযা গিযাছিল এখানেও সে প্রায তেমনি হইযা আছে শুধু তাব এই পবিবর্তন এখন আব অস্বাভাবিক মনে হয না। আসন্ন সন্তান সম্ভাবনাব সঙ্গে পবিবর্তনটুকু খাপ খাইযা গিযাছে। চলাফেবা কাজকর্ম সমস্তই তাব ধীব মন্থব সংসাবটাকে ঠেলিযা তুলিবাব জন্য তাব ধৈর্যহীন উৎসাহ আব নাই নিজেব সংসাবে থাকিবাব সময সে একদিন ছেলেমেযেব জামাব ছাঁটটি পর্যন্ত ক্রমাগত উন্নততব কবিতে না পাবিলে স্বস্তি পাইত না সংসাবেব তুচ্ছতম খুটিনাটি ব্যাপাবগুলি পর্যন্ত তাব কাছে ছিল গুবুতব এখন সে শুধু মোটামুটি সংসাবটা চালাইযা যায ছোটখাট ত্রুটি ও ফাঁকি সে অবহেলা কবে। সংসারেব যেখানে বোতাম ছিঁড়িযা ফাঁক বাহিব হয সেখানে সেফটিপিন গুঁজিযা কাজ চালাইতে তাহাব বাধে না। ছেলেদের জীবনেব প্রত্যেকটি মিনিটেব হিসাব বাখা আব হইযা ওঠে না বিধান দেবি কবিযা বাডি ফিরিলে কাবণ জিজ্ঞাসা কবিতে সে ভুলিযা যায, শীতেব সন্ধ্যায ফণীব পাযে মোজা না উঠিলেও তাব চলে। ঘবেব আনাচে কানাচে ধুলাবালি জামাকাপড়ে মযলা চৌবাচ্চায শ্যাওলা জমিতে পায।

নূতন যাবা শ্যামাকে দেখিল তাবা কিছু বুঝিতে পাবে না আগে যাবা তাহাকে দেখিযাছে তাবাই শুধু টেব পায বনগাঁ তাহাকে কি ভাবে বদলাইযা দিযাছে।

আবাব শীত শেষ হইযা আসিল। ফাল্গুন মাসে একটি কন্যা জন্মিল শ্যামাব। বকুল বুঝি আবাব সুবু হইল গোড়া হইতে। কিন্তু বকুলেব কি

দ্'টি ডাগর চোখ ছিল। এ মেয়ের চোখ কোথায়? হায়, শ্যামার মেযে জন্মিয়াছে অন্ধ হইয়া। গর্ভের অনাদিকালের অন্ধকার তাকে ঘিরিয়া রহিল, এ জগতের আলো সে চিনিবে না কোনদিন।

জন্মান্ধ? কার পাপের ফল ভোগ করিতে তুই পৃথিবীতে আসিলি খ্কি! দৃষ্টি তোব হরণ করিল কে? ভাবিতে ভাবিতে শ্যামা স্মরণ করে, বনগাঁয় একদিন সন্ধ্যার সময় কলাবাগানে ছায়ার মত কি যেন দেখিযা তাব গা ছম্‌ছম্‌ করিয়াছিল, স্নানের আগে এলোচুলে তেল মাখিবার সময় আব একদিন পাগলা হাব্‌র ব্ড়ি দিদিমা তাহাকে দেখিয়া ফেলিয়াছিল, অজ্ঞাত-সারে আরও কবে কি ঘটিয়াছিল কে জানে!

কি আর করা যায়, অন্ধ মেয়েকে শ্যামা সমান আদরেই মান্ষ কবে, যেমন সে করিয়াছিল বকুলকে, যার ডাগর দ্'টি চোখ শ্যামাকে অবিরত অবাক করিয়া রাখিত। দ্'মাস বয়স হইতে না হইতে শীতল মেযেকে বড় ভাল বাসিল। বিধান একটা ঠাকুর আনিয়াছিল, তাহাকে ছাড়াইয়া দিয়া শ্যামা আবার রান্না আরম্ভ করিলে মেয়ে কোলে করিয়া বসিয়া থাকার কাজটা পাইযা শীতল ভারি খ্সি। এখানে আসিয়া বনগাঁর পোষা কুকুরটির জন্য শীতলেব মন কেমন করিত, খ্কিকে কোলে পাইয়া কুকুরেব শোক সে ভুলিযা গেল। শীতলের বাঁ পায়ের বেদনাটা আবার চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। এ জন্য দোষী করে সে শ্যামাকে। শ্যামারি জন্যই তো চাকরি করিতে দ্র্বল পা লইয়া দ্'বেলা তাহাকে হাঁটাহাঁটি করিতে হইত বনগাঁয়!

অবসর সময়টা শ্যামা তার পায়ে তার্পিন তেল মালিশ করিয়া দেয়। অস্স্থ স্বামীকে চাকরি করিতে পাঠাইয়া অপরাধ যদি তার হইয়া থাকে, এ তার অযোগ্য প্রায়শ্চিত্ত নয়।

মোহিনী কলিকাতায় চাকরি করে কিন্তু শ্বশ্রবাড়ি বেশি সে আসে না, বোধ হয় পিসির বারণ আছে। শ্যামা তাকে দ্'দিন নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, দ্দিন আসিয়া সে খাইয়া গিয়াছে, নিজে হইতে একদিনও খোঁজখবর নেয় নাই। বিধান প্রথম প্রথম কাকার বাড়ি গিয়া মোহিনীর সঙ্গে সর্বদা দেখা-সাক্ষাৎ করিত, এখন সেও আর যায় না। রাগ করিয়া শ্যামাকে সে বলে, এমনি লাজ্ক হলে কি হবে, মোহিনী বড় অহঙ্কারী মা,—কতবার গিয়েছি আমি,

কত বলেছি আসতে এল একবার? নেমন্তন্ন না করলে বাবুর আসা হয় না, ভাবি জামাই আমার! এদিকে তো মাছিমারা কেরানী পোস্টাপিসের!

কিন্তু মোহিনী একদিন বিনা আহ্বানেই আসিল। লজ্জায় মুখ রাঙা করিয়া বিধানের কাছে সে স্বীকার করিল যে বকুলের চিঠি পাইয়া সে আসিয়াছে। বকুলকে এখন একবার আনা দরকার। পনের দিনের ছুটি লইয়া সে বাড়ি যাইতেছে ইতিমধ্যে শ্যামা যদি তাহার পিসিকে একখানা চিঠি লিখিয়া দেয় আর চিঠির জবাব আসার আগেই বিধান যদি সেখানে গিয়া পড়ে, বকুলকে পাঠানোর একটা ব্যবস্থা মোহিনী তবে করিতে পারে।

মোহিনীর কথাবার্তা বিধানের কাছে হেঁয়ালির মত লাগে সে বলে, বোসো তুমি মাকে বলি।

মোহিনী বলে না না আমি গেলে বলবেন।

কিন্তু তা হয় না শ্যামাকে না বলিলে এসব সাংসারিক ঘোরপ্যাঁচ কে বুঝিতে পারিবে?

বিধান শ্যামাকে সব শোনায়। শুনিবামাত্র ব্যাপার আঁচ করিয়া শান্ত নির্বাক শ্যামার সহসা আজ দেখা দেয় অসাধারণ ব্যস্ততা।

কই মোহিনী? ডাক খোকা মোহিনীকে ডাক।

শ্যামার চোখ ছল ছল করে। আসিবার জন্য তাই বকুল ইদানিং এত করিয়া লিখিতেছিল! তারা আনিবার ব্যবস্থা করিতে পারে নাই বলিয়া মেয়ে তার জামাইকে এমন চিঠি লিখিয়াছে যে বিনা নিমন্ত্রণে যে কখনো আসে না সে যাচিয়া আসিয়াছে বকুলকে আনানোর ষড়যন্ত্র করিতে ছুটি লইয়া যাইতেছে বাড়ি! মোহিনীকে কত জেরাই যে শ্যামা করে! সজল চোখে কতবার যে সে মোহিনীকে মনে করাইয়া দেয় তার হাতে যেদিন মেয়েকে সঁপিয়া দিয়াছিল সেইদিন হইতে শ্যামার ছেলের সঙ্গে তার কোন পার্থক্য নাই, বিধান যেমন মোহিনীও তেমনি শ্যামার কাছে। অনুযোগ দিয়া বলে তোমার বাড়ির কারুর কি উচিত ছিল না বাবা একথাটা আমায় লিখে জানায়! আমি তার মা, আমি জানতেও পেলাম না ক'মাস কি বৃত্তান্ত? পিসি না বুঝুক, তুমি তো বোঝ বাবা মার দুঃখু?

মোহিনীকে সে-বেলা এখানেই খাইয়া যাইতে হয়। জামাই কোনদিন

পব নয তবু আজ মোহিনী যেন বিশেষ করিয়া আপন হইযা যায। মনটা ভাল মোহিনীব, বকুলেব জন্য টান আছে মোহিনীব, না আসুক সে নিমন্ত্রণ না কবিলে অবুঝ গোঁযাব সে নয মধুব স্বভাব তাব।

চাব পাঁচদিন পবে বিধান গিযা বকুলকে লইযা আসিল। বলিল উঃ মাগো কি গালটা পিসি আমাকে দিলে! বাড়িতে পা দেযা থেকে সেই যে বুড়ি মুখ ছুটাল মা, থামল গিযে একেবাবে বিদায দেবাব সময অমঙ্গল হবে ভেবে তখন বোধ হয কিছু বলতে সাহস হ'ল না মুখ গোমডা কবে দাঁডিযে বইল। আমি আব যাচ্ছিনে বাবু খুকিব শ্বশুববাডি এ জন্মে।

বকুল তো আসিল, এ কোন বকুল? একি বোগা শবীব বকুলেব নিষ্প্রভ কপোল ভীবু চোখ কান্তিবিহীন মুখ লাবণ্যহীন বর্ণ! মেযেকে তাব এমন কবিযা দিযাছে ওবা!—পেট ভবে খেতেও ওবা তোকে দিত না বুঝি খুকি? খাটিযে মাবত বুঝি তোকে দিনবাত? আমি কি জানতাম মা এত তোকে কষ্ট দিচ্ছে! আনবাব জন্যে লিখতিস ভাবতাম আসবাব জন্যে মন কেমন করছে তাই ব্যাকুল হযেছিস,—পোড়া কপাল আমাব!

শ্যামাব মুখে হঠাৎ যে খিল পডিযাছিল বকুল আসিযা যেন তা খুলিয়া দিযাছে। সেটা আশ্চর্য নয। মনেব অবস্থা অস্বাভাবিক হইযা আসিলে এই তো তাব সবাব বড চিকিৎসা, এমনি ভাবে মশগুল হইতে পাবা জীবনেব স্বাভাবিক বিপদে সম্পদে যাব মহা সমন্বয সংসাবধর্ম। বহু দিনেব দুর্ভাবনায, বনগাঁব পবাশ্রিত জীবনযাপনে, শ্যামাব মনে যদি বৈকল্য আসিযা থাকে, ছেলেব চাকরি অন্ধ মেযেব জন্ম বকুলেব এভাবে আসিযা পড়া এততেও সেটুকু কি শোধবাইবে না? আগেব মত হওযা শ্যামার পক্ষে আব সম্ভব নয, তবু পবিবর্তিত পবিশ্রান্ত ক্ষয পাওযা শ্যামাব মধ্যে একটু শক্তি ও উৎসাহ, একটু চাঞ্চল্য ও মুখবতা এখন আসিতে পাবে আসিতে পাবে জীবনেব হাসি-কান্নাব আবও তেজী মোহ সুখেব নিবিড়তব স্বাদ।

মহোৎসাহে শ্যামা বকুলের সেবা আবম্ভ করিল।

বনগাঁয়ে চুরি করিযা বিধানকে সে ভাল জিনিস খাওযাইত এখানে নিজের মুখেব খাবারটুকু সে মেযেব মুখে তুলিযা দিতে লাগিল। নব্বই টাকা আয়ে তো কলিকাতা শহবে বাজার হালে থাকা যায না, নিজেকে বঞ্চিত না

করিয়া মেয়েকে দিবার দুধটুকু ঘিটুকু ফলটুকু কোথায় পাইবে সে? কাঁচ মেয়ে মাই খায় শ্যামার নিজেরও দারুণ ক্ষুধা, পাতের মাছটি তবু সে বকুলের থালায় তুলিয়া দেয় মণিকে দিয়া চিনিপাতা দই আনায় দু'পয়সার, বলে দই মুখে রুচবে লো ভাতকটা সব মেখে খেয়ে নে চে'ছেপুছে, লক্ষ্মী খা। দই খেলে আমার বমি আসে তুই খা তো। ও মণি দে বাবা একটু আচার এনে দে দিদিকে।

বকুলকে সে বসাইয়া রাখে, কাজ করিতে দেয় না।

দেখিতে দেখিতে বকুলের চেহারার উন্নতি হয়।

কিন্তু মুস্কিল বাধায় সরযূ। বলে মেয়েকে কাজকর্ম করতে দিচ্ছ না এ কিন্তু ভাল নয় ভাই।

শ্যামা বলে খেটে খেটে সারা হয়ে এল ওকে আর কাজ করতে দিতে কি মন সরে দিদি? অল্পবিস্তর কাজ ধরতে গেলে করে বৈকি মেয়ে বিছানা টিছানা পাতে। বিকেলে খানিকক্ষণ হে'টেও বেড়ায় ছাতে তা তো দেখতেই পাও?

মনে হয় সরযূর অনধিকার চর্চায় শ্যামা রাগ করে। পাশকরা ধাত্রী! পাঁচটি সন্তানের জননী সে মেয়ের কিসে ভাল কিসে মন্দ সে তা বোঝে না পাশকরা ধাত্রী তকে শিখাইতে আসিয়াছে!

শ্যামা প্রাণপণে মেয়েকে এটা ওটা খাওয়াইবার চেষ্টা করে বকুলের কিন্তু অত খাওয়ার সখ নাই তার সব চেয়ে জোরালো সখটি দেখা যায়, বিধানের বিবাহ সম্বন্ধে। শ্যামাকে সে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। বলে, কি করছ মা তুমি? চাকরী বাকরি করছে এবার দাদার বিয়ে দাও? শামুর সঙ্গে দাদার অত মাখামাখি দেখে ভয়ও কি হয় না তোমার?

কিসের মাখামাখি লো?– শ্যামা সভয়ে বলে।

নয়? বিয়ের যুগ্যি মেয়ে ও কেন রোজ পড়া জানতে আসবে দাদার কাছে? পড়া জানবার দরকার হয় মাস্টার রাখুক না! না মা দাদার তুমি বিয়ে দাও এবার।

শামুর আসা যাওয়া শ্যামার চেয়েও বকুল বেশি অপছন্দ করে। কি পাকা গিন্নিই বকুল হইয়াছে! সাংসারিক জ্ঞান বুদ্ধিতে কাঁচ মনটি যেন তার

টইটম্বুর, আঁটিতে চায় না। শামুর কাপড়পরা বেণীপাকানো, পাউডার-মাখার ঢং দেখিয়া গা যে তার জ্বলিয়া যায় শ্যামা ভিন্ন কার সাধ্য আছে তা টের পাইবে মনে হয় শামুর সঙ্গে সখিত্বই বুঝি তার গড়িয়া উঠিল। বনগাঁর সেই ঢেঁকি ঘরখানার চালায় ইতিমধ্যে বুঝি নূতন খড়ও ওঠে নাই এক আঁটি শঙ্করের গায়ের সেই জামাটি বুঝি আজও ছেঁড়ে নাই অশ্রুমুখী সেই অবোধ বালিকা বকুল আজ এই বকুল হইয়াছে দু'টি ছেলেমানুষ ছেলেমেয়ের সহজ বন্ধুত্বে সে আঁসটে গন্ধ পায় এবং বেমালুম তাহা গোপন রাখিয়া ওদের দেখায় হাসিমুখ নাক সিঁটকায় মার কাছে আর করে ষড়যন্ত্র। শ্বশুরবাড়ির লোকেরা গড়িয়া পিটিয়া বকুলকে মানুষ করিয়া দিয়াছে সন্দেহ নাই।

ষড়যন্ত্রে শ্যামার সায় আছে। মিথ্যা নয় বিধানের এবার বিবাহ দেওয়া দরকার বটে।

বিধান শুনিয়া হাসে। বলে পিসির গাল সয়ে নিয়ে এলাম কি না, মাকে বুঝি তাই এসব কুপরামর্শ দিচ্ছিস খুকী? তারপর গম্ভীর হইয়া বলে এদিকে খরচ চলে না সে খবর রাখিস তুই? ট্রামের টিকিট না কিনে মণির স্কুলের মাইনে দিয়েছি এবার, তুই আছিস কোন তালে!

বকুল বলে আমাকে এনে তোমার খরচ বাড়ল দাদা।

তবু তো আছিস আমায় ডুবিয়ে যাবার ফিকিরে।

বকুল অভিমান করে। সে আসিয়া খরচ বাড়াইয়াছে বিধান একথার প্রতিবাদ করিলে সে খুসি হইত। কারো মন বুঝিয়া একটা কথা যদি বিধান কোনদিন বলিতে পারে। খানিক পরে আবার উল্টা কথা ভাবিয়া বকুলের অভিমান কমিয়া যায়। তাই বটে। দাদা কি পর যে তোষামোদ করিয়া কথা কহিবে তার সঙ্গে? আবার সে প্যান প্যান সুরু করিয়া দেয়। যুক্তি দেখায় যে ও-সব বাজে ওজোর বিধানের এই যে সে আসিয়াছে, সংসার অচল হইয়াছে কি? একটা বৌ আসিলেও স্বচ্ছন্দে সংসার চলিবে। তার চেয়ে বেশি ভাত বৌ খাইবে না নিশ্চয়।

সংসারের ভার গ্রহণ করার আনন্দ বিধানের এদিকে কয়েক মাসের মধ্যেই তিতো হইয়া গিয়াছিল : এই বয়সে ভাইএর স্কুলের মাহিনা দিতে

রোজ হাঁটিয়া আপিস করা যদি বা সহ্য হয়, একেবারে নব্বই নব্বইটা টাকাতেও যে মাসের খরচ কুলায় না, এটুকু মাথা গরম করিয়া দেয় তরুণ মানুষের। বকুলকে একদিন বিধান ভয়ানক ধমকাইয়া দিল। বলিল, বিয়ে! বিয়ে! একটা ট্যুসনি খুঁজে পাচ্ছি না, বিয়ে বিয়ে করে পাগল করে দিল আমায়। ফের ও কথা বললে চড় খাবি খুকী।

বলিয়া সে আপিস গেল। বকুল নাইল না খাইল না, গোসা করিয়া শুইয়া রহিল। বিকালে বাড়ি ফিরিয়া বিধান শুনিল শ্যামার বকুনি, তারপর সে বকুলকে তুলিয়া খাওয়াইতে গেল।

আজ বিভা বসিয়াছিল বকুলের কাছে।

বিধানের সঙ্গে আগে সে কোনদিন কথা বলে নাই, আজ দয়া করিয়া বলিল, পালাচ্ছেন কেন, আসুন না। কি বলেছেন বোনকে, বোন আজ রাগ করে সারাদিন খায় নি?

তারপর বিভা বলিল, শামু খুব প্রশংসা করে বিধানের। জগতে নাকি এমন বিষয় নাই বিধান যা জানে না? পড়াটড়া জানিতে আসিয়া শামু বোধ হয় খুব বিরক্ত করে বিধানকে? আশ্চর্য মেয়ে, মানুষকে এমন জ্বালাতন করিতে পারে ও! বিভা এই সব বলে, বিধান মুখ লাল করিয়া আড়ষ্ট ভাবে শোনে। শ্যামাও তো পিছু পিছু আসিয়াছিল বিধানের, সে আর বকুল ভাবে শামুর কথা ওঠায় বিধানের মুখ লাল হইয়াছে। তারা তো বুঝিতে পারে না জীবনে যে কখনো মেয়েদের ধারে কাছে ঘেঁষে নাই, বিভার মত গান জানা মন টানা আধুনিক মেয়ের কাছে কি তার দারুণ অস্বস্তি।

গভীর বিষাদে শ্যামার মন ভরিয়া যায়। এইবার বুঝি তার একেবারে হাল ছাড়িয়া দিবার দিন আসিয়াছে। অন্ধ মেয়ে দিয়া ভগবানের সাধ মিটিল না, ছেলে কাড়িয়া নেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবার। বিধানের স্নেহের স্রোত আর কি তার দিকে বহিবে? তার কড়া হাতের সেবা আর কি ভাল লাগিবে বিধানের? জননীকে আর তো বিধানের প্রয়োজন নাই। নিজের জীবন এবার নিজেই সে গড়িয়া তুলিবে, যে অধিকার এতদিন শ্যামার ছিল নিজস্ব। শ্যামা বুঝিতে পারে, জগতে এই পুরস্কার মা পায়। বকুলকে বড় করিয়া দান করিয়াছে পরের বাড়ি, তার চোখের সামনে বিধানের নিজের স্বতন্ত্র জগৎ

গড়িয়া উঠিতেছে, যেখানে তার ঠাঁই নাই এতটুকু। মণির বেলা ফণীর বেলাও হইবে এমনি। আপন হইয়া কেহ যদি চিরদিন থাকে শ্যামার, থাকিবে ওই অন্ধ শিশুটি, যার নিমীলিত আঁখি দুটিব জন্য শ্যামার আঁখি সজল হইয়া থাকিবে আজীবন।

এক বাড়িতে বাস করিলে পরের জীবনেব গোপন ও গভীর জটিলতাগুলি, কেহ বলিয়া না দিলেও, ক্রমে ক্রমে সকলেই টের পাইয়া যায়। বিভা ও বনবিহারীর ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া শ্যামা ও বকুল হাসাহাসি কবে নিজেদের মধ্যে। বিভার জন্য ভেড়া বনিয়া এখানে পড়িয়া আছে বনবিহারী, একটু চোখের দেখা, একটু গান শোনা, বিভার যদি দয়া হয় কখনো দুটি কথা বলা এইটুকু সম্বল বনবিহারীর,—মাগো মা, কি অপদার্থ পুরুষ! না জানিস ভালরকম লেখাপড়া, করিস ক্যানভাসারি, থাকিস পরের বাড়ি দাস হইয়া, তোর একি দুরাশা! সিঁড়ির নিচে ভাঙ্গা চৌকীতে যার বাস তার কেন আকাশের চাঁদ ধরার সাধ? বনবিহারীর পাগলামি বিশেষ অস্পষ্ট নয়, সকলেই জানে: সে নিজেই শুধু তা জানে না, ভাবে গোপন কথাটি তার গোপন হইয়াই আছে, ছড়াইয়া পড়ে নাই বাহিরে। টের পাওয়া অবশ্য কারো উচিত হয় নাই, কারণ বনবিহারী কিছুই করে না প্রেমিকের মত, বিভা সিঁড়ি দিয়া নামিলে শুধু চাহিয়া থাকে, বিভা গান ধরিলে যদি আশেপাশে কেহ না থাকে তবেই সে সিঁড়ি দিয়া দুটি দুটি উপরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, আর যা কিছু সে করে সব চুরি করিয়া, কারো তা দেখিবার কথা নয়। ক্যানভাস করিতে বাহিব হইয়া বিভার স্কুলের কাছাকাছি কোথাও সে বোজই দাঁড়াইয়া থাকে ছুটির সময়, কোনদিন সাহস করিয়া সামনে গিয়া বলে, ছুটি হয়ে গেল আপনার ?—কোনদিন দূর হইতেই সরিয়া পড়ে। এইটুকু যে সকলে জানিযা ফেলিয়াছে টের পাইলে লজ্জায় বনবিহারী মরিয়া যাইবে। তারপর বিভার কাজ করিয়া দিতেও সে ভালবাসে বটে। লণ্ড্রিতে কাপড় দিযা লইয়া আসে, ফর্দ মাফিক মার্কেট হইতে জিনিসপত্র কিনিয়া আনে, যে দুটি ছোট ছোট মেয়ে সকালবেলা গান শিখিতে আসে বিভার কাছে, দরকার হইলে তাদের বাড়ি

পেঁছাইয়া দেয়। এখন এসব ছোটখাট উপকার কে না কার করে জগতে? বাড়ির কাজও তো সে কম করে না। বিভার দুটি একটি কাজ করিয়া দেওয়ার মধ্যে তার গোপন মনের প্রতিচ্ছবি যে সকলে দেখিয়া ফেলিবে কেমন করিয়া সেটুকু অনুমান করিবে বনবিহারী? বিভার যে ফটোখানা সে চুরি করিয়াছে সেখানা সে লুকাইয়া রাখিয়াছে ক্যানভাসিংএ যাওয়ার সুটকেশটির মধ্যে, আর পুরানো ব্লাউজটি রাখিয়াছে তার ট্রাঙ্কে তালাচাবি দিয়া। চুপি চুপি লুকাইয়া এগুলি সকলে যে আবিষ্কার করিয়াছে তাই বা সে জানিবে কিরূপে?

বিভা বিব্রত হইয়া থাকে। বনবিহারী এমন নিরীহ যত স্পষ্টই হোক এমন মূক ও নিষ্ক্রিয় তার প্রেম তার বিরুদ্ধে নালিশ খাড়া করিবার তুচ্ছতম প্রমাণটিরও এমন অভাব যে এ বিষয়ে সকলের যেমন তারও তেমনি কিছু বলিবার অথবা করিবার উপায় নাই। মনে মনে সে কখনো রাগে কখনো বোধ করে মমতা সিঁড়ি দিয়া নামার সময় কোনদিন তাকায় ক্রুদ্ধ ভর্ৎসনার চোখে কোন দিন দুটি একটি স্নিগ্ধ কথা বলে। ভাল যে লাগে না একেবারে তা নয়। একটা কুকুরও কুকুরের মত পোষ মানিলে মানুষের তাতে কত গর্ব কত আনন্দ এতো একটা মানুষ। অথচ এরকম পূজা গ্রহণ করিবার উপায় না থাকিলে কি বিশ্রীই যে লাগে মানুষের মনে যার একফোঁটা দয়ামায়া থাকে!

বকুলের সঙ্গে হাসাহাসি করে বটে মনে মনে শ্যামা কিন্তু ব্যথা পায়। শক্ত সমর্থ যুবক একি ব্যাধি তার মনের! মেরুদণ্ডটা পর্যন্ত যে ওর গলিয়া গেল সুযোগ পাইয়া কি ব্যবহারটাই বাড়ির লোকে করে ওর সঙ্গে নিজের মনুষ্যত্ব যে বিসর্জন দিয়াছে কে তাকে মানুষ জ্ঞান করিবে দোষ কারো নাই।

আচ্ছা শামুর জন্য বিধানও যদি অমনি হইয়া যায়? অমনি উন্মাদ? ও ভগবান শ্যামা তবে নিজেই পাগল হইয়া যাইবে!

অনেক ভাবিয়া শ্যামা শেষে একদিন বকুলকে বলে শোন খুকী বলি দ্যাখ শামুকে যদি খোকার পছন্দ হয়ে থাকে ওর সঙ্গেই না হয় দিই খোকার বিয়ে? স্বঘর তো, দোষ কি!

বকুল স্তম্ভিত হইয়া যায় বলে ক্ষেপেছ নাকি তুমি মা কি বলছ তার ঠিক ঠিকানা নেই ওই মেয়ের সঙ্গে তুমি বিয়ে দিতে চাও দাদার! শামু

ভাল নয় মা—সয়তানের একশেষ। এমন কথা মনেও ঠাঁই দিও না।

কি হইবে তবে? একদিন শামু না আসিলে বিধান যে উসখুস করিতে থাকে। শামুর হাসির হিল্লোলে সংসার যে শ্যামার ভাসিয়া যাইতে বসিয়াছে!

ভগবান মুখ তুলিলেন।

অনেক দুঃখ শ্যামা পাইয়াছে, আর কি তিনি তাকে কষ্ট দিতে পারেন। একদিন বিধান বলিল, শঙ্করের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম মা, আমাদের বাড়িটা দেখে আসতে ইচ্ছে হ'ল, গিযে দেখি ভাড়ার নোটিশ ঝুলছে। যাবে ও বাড়িতে?

আমাদের বাড়ি' আজও সে-বাড়ির কথা বলিতে ইহারা বলে আমাদের বাড়ি!

শ্যামা সাগ্রহে বলিল, সত্যি খোকা?—যাব, চল সামনের মাসেই আমরা চলে যাই, পয়লা তারিখে।

সামনের মাসে পয়লা তারিখে ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করিয়া তাহারা বাড়ি বদলাইয়া ফেলিল। বিধান ছুটি লইল একদিনের। সকালে একা গিয়া জিনিসপত্র রাখিয়া আসিতে বেলা তার বারোটা বাজিয়া গেল। শামু আর বিভা দুজনেই তখন স্কুলে গিয়াছে, বাড়িওয়ালার ছেলেরা গিয়াছে আপিস, বনবিহারী গিয়াছে ওষুদ ক্যানভাস করিতে। দুপুরে এখানেই পাতা পাতিয়া তাহারা ভাত খাইল। তারপর বাকি জিনিসপত্র সমেত রওনা হইয়া গেল সহরতলীর সেই বাড়ির উদ্দেশে, শ্যামার জীবনের দুটি যুগ যেখানে কাটিয়াছিল।

তেমনি আছে ঘরবাড়ি শ্যামার। শেষবার এবাড়ি হইতে সে যখন বিদায় লইয়াছিল তখন বাড়িটা শুধু ছিল একটু বিবর্ণ, বাড়ির মালিক এখন আগাগোড়া চুণকাম করিয়াছে, রঙ দিয়াছে। শ্যামা সোজা উঠিয়া গেল উপরে। উপরের ঘরখানাকে আর নূতন বলিয়া চেনা যায় না, বাড়ির বাকি অংশের সঙ্গে মিশ খাইয়া গিয়াছে। নকুড় বাবু দোতলায় ঘর তুলিয়াছে একখানা। রেলের বাঁধটার খানিকটা আড়াল পড়িয়া গিয়াছে। আর কিছুই বদলায় নাই। ধানকলের বিস্তৃত অঙ্গনে তেমনি ধান মেলা আছে, পায়রার

বাঁক তেমনি খাইতেছে যান, উঁচু চোঙাটা দিয়া তেমনি অল্প অল্প ধোঁয়া বাহির হইয়া উড়িয়া যাইতেছে বাতাসে।

দশ

বকুলের একটি মেয়ে হইয়াছে।

প্রথম বারেই মেয়ে? তা হোক! শ্যামার শেষবারের মেয়ের মত ওতো অন্ধ হইয়া জন্মায় নাই, বকুলের চেয়েও ওর বুঝি চোখ দুটি ডাগর! কাজল দিতে দিতে ওই চোখ যখন গভীর কালো হইয়া আসিবে দেখিয়া অবাক মানিবে মানুষ। কি আসিয়া যায় প্রথমবার মেয়ে হইলে, মেয়ে যদি এমন ফুটফুটে হয়, এমন অপরূপ চোখ যদি তার থাকে?

শ্যামার একটু ঈর্ষা হইয়াছিল বৈকি! বকুলের মেয়ের চোখ আশ্চর্য সুন্দর হোক শ্যামার তাতে আনন্দ, আহা তার মেয়েটির চোখ দুটি যদি অন্ধ না হইত!

বকুলের মেয়ে মানুষ করে শ্যামা, প্রসবের পর বকুলের শরীরটা ভাল যাইতেছে না, তা ছাড়া সন্তান পরিচর্যার সে কি জানে? নিজের মেয়ে, বকুল আর বকুলের মেয়ে, শ্যামা তিনজনেরই সেবা করে। বকুলের মেয়ে আর নিজের মেয়েকে হয়ত সে কোনদিন কাছাকাছি শোয়াইয়া রাখে, বকুলের মেয়ে তাকায় বড় বড় চোখ মেলিয়া, শ্যামার মেয়ের অন্ধ আঁখি দুটিতে পলকও পড়ে না,—পলক পড়বে কিসে, চোখের পাতা যে মেয়েটার জড়ানো। শ্যামার মনে পড়ে বাদুর কথা—মন্দার সেই হাবা মেয়েটা, দিনরাত যে শুধু লালা ফেলিত। এমন সন্তান কেন হয় মানুষের,—অন্ধ, বোবা, অঙ্গহীন, বিকল? কেন এই অভিশাপ মানুষের? এক একবার শ্যামার মনে হয়, হয়ত বকুলের মেয়ে তার মেয়ের চোখ দুটি হরণ করিয়াছিল তাই ওর ডবল চোখের মত অতবড় চোখ হইয়াছে! তারপর সবিষাদে শ্যামা মাথা নাড়ে। না, এসব অন্যায় কথা মনে আনা উচিত নয়। কিসে কি হইয়াছে কে তা জানে, সত্য মিথ্যা কিছুতো জানিবার উপায় নাই, আবোল তাবোল যা তা

ভাবিলে বকুলের মেয়ের চোখ দুটির যদি কিছু হয়! প্রথম সন্তান বকুলের, বড় সে আঘাত পাইবে।

মেয়ের দুমাস বয়স করিয়া বকুল শ্বশুর বাড়ি গেল। যাওয়ার আগে কি কান্নাই যে বকুল কাঁদিল। বলিল, চেহারা তোমার বড্ড খারাপ হয়েছে মা, এবার তাকাও একটু শরীরের দিকে, এখনও এত খাটুনি তোমার সইবে কেন এ শরীরে? বিয়ে দিয়ে বৌ আনো এবার দাদার, সারাজীবন তো প্রাণ দিয়ে করলে সকলের জন্যে এবার যদি না একটু সুখ করে নেবে—

বলিল, আমার যেমন কপাল! সেবা নিয়েই চললাম, তোমার কাছে থেকে একটু যে যত্ন করব তা কপালে নেই!

কি গিন্নিই বকুল হইয়াছে! ছাঁচে ঢালা হইয়া আসিতেছে তাহার চালচলন, কথার ধরণ! যেন দ্বিতীয় শ্যামা।

শীতকাল। বকুল শ্বশুরবাড়ি গেল শীতকালে। শীতে সংসারের কাজ করিতে এবছর শ্যামার সত্যই যেন কষ্ট হইতে লাগিল। ছেলেকে আপিসের ভাত দিতে হয়, শীতের সকাল দেখিতে দেখিতে বেলা হইয়া যায়, খুব ভোরে উঠিতে হয় শ্যামার। আগুনের আঁচে রান্না করিয়া আসিয়া রাত্রে লেপের নিচে গা যেন শ্যামার গরম হইতে চায় না, যত সে জড়সড় হইয়া শোয় হাতে পায়ে কেমন একটা মোচড় দেওয়া ব্যথা জাগে, কেমন একটা কষ্ট হয় তাহার। ভোরে এই কষ্ট দেহে লইয়া সে লেপের বাহিরে আসে, আঁচল গায়ে জড়াইয়া হিহি করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে নিচে যায়। ঠিকা ঝি আসিবে বেলায়, তার আগে কিছু কিছু কাজ শ্যামাকে আগাইয়া রাখিতে হয়। বিধান বাহিরের ঘরে শোয়। ঝি আসিয়া ডাকাডাকি করিলে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়—শ্যামা তাই আগে সন্তর্পণে সদর দরজাটা খুলিয়া রাখিয়া আসে। ঘুম সে ভাঙ্গায় মণির। মণির পরীক্ষা আসিতেছে, নিচের যে ঘরে আগে শ্যামা সকলকে লইয়া থাকিত, সেই ঘরে মণি একা থাকে—পড়াশোনা করে, ঘুমায়। ভোর ভোর ছেলেকে ডাকিয়া তুলিতে বড় মমতা হয় শ্যামার কিন্তু আজও তো তার কাছে ভবিষ্যতের চেয়ে বড় কিছু নাই, জোর করিয়া মণিকে সে তুলিয়া দেয়। বলে, ওঠ্ বাবা ওঠ্, না পড়লে পরীক্ষায় যে ভাল নম্বর পাবিনে?

মণি কাতর কণ্ঠে বলে, আর একটু ঘুমোই মা, কত রাত পর্যন্ত পড়েছি জানো?

জানে না! শ্যামা জানে না তার ছেলে কত রাত অবধি পড়িয়াছে! দোতলা একতলার ব্যবধান কি ফাঁকি দিতে পারে শ্যামাকে!—কতবার উঠিয়া আসিয়া সে উঁকি দিয়া গিয়াছে মণি তার কি জানে!

একটু চা বরং তোকে করে দি চুপি চুপি, খেয়ে চাঙ্গা হয়ে পড়তে সুরু কর। পড়ে শুনে মানুষ হয়ে কত ঘুমোবি তখন—ঘুম কি পালিয়ে যাবে!

কনকনে হাড় কাঁপানো শীত, বকুলকে সঙ্গে করিয়া শীতল যেবার পালাইয়া গিয়াছিল সেবার ছাড়া শীত শ্যামাকে কোনবার এমন কাবু করিতে পারে নাই। উনানে আঁচ দিয়া ডালের হাঁড়িটা মাজিতে বসিয়া হাত পা শ্যামার যেন অবশ হইয়া আসে। কি হইযাছে দেহটার? এই ভাল থাকে এই আবার খারাপ হইয়া যায়? মাঝে মাঝে এক একদিন তো শীত লাগে না, ঝরঝরে হাল্কা মনে হয় শরীরটা, আবছা ভোরে ঘুমন্ত-পুরীতে মনের আনন্দে কাজে হাত দেয়? কোনদিন মনে হয় বয়সটা আজো পঁচিশের কোঠায় আছে, কোনদিন মনে হয় একশো বছরের সে বুড়ী! এমন অদ্ভুত অবস্থা হইল কেন তাহার?

বোদের সঙ্গে বিধান ওঠে। এখুনি সে ছেলে পড়াইতে বাহির হইয়া যাইবে কিন্তু তাহার হৈ চৈ হাঁক ডাক নাই। নিঃশব্দে মুখ হাত ধুইয়া জামা গায়ে দেয়, নীরবে গিযা রান্না ঘরে বসে, শ্যামা যদি বলে, ডালটা হয়ে এল, নামিয়ে রুটি সেঁকে দি?—সে বলে না দেরি হইয়া যাইবে, আগে রুটি চাই। দুটো একটা কথা সে বলে, বেশির ভাগ সময় চুপ করিয়া ভোরবেলাই শ্যামার শ্রান্ত মুখখানার দিকে চাহিয়া থাকে। সে বুঝিতে পারে শ্যামার শরীর ভাল নয়, ভোরে উঠিয়া সংসারের কাজ করিতে শ্যামার কষ্ট হয়, কিন্তু কিছুই সে বলে না। মুখের কথায় যার প্রতিকার নাই সে বিষয়ে কথা বলিতে বিধানের ভাল লাগে না। ভোরে উঠিতে বারণ করিলে শ্যামা কি শুনিবে?

বিধান চলিয়া গেলে খানিক পরে শ্যামা দোতালায় যায়, এতক্ষণে ছাদে রোদ আসিয়াছে। জানালা খুলিয়া দিতে শীতলের গায়ে রোদ আসিয়া পড়ে। শীতল ক্ষীণকণ্ঠে বলে, ক'টা বাজল গা?

শ্যামা বলে, আটটা বাজে।—শীতলকে শ্যামা ধরিয়া তোলে, জানালার কাছে বালিশ সাজাইয়া তাহাকে রোদে ঠেস দিয়া বসায়, লেপ দিয়া ঢাকিয়াও দেয় গলা পর্যন্ত। শরীরটা শীতলের ভাঙিয়া গিয়াছে। দুর্বল পা'টি তাহার ক্রমে ক্রমে একেবারে অবশ হইয়া গিয়াছে, আর সারিবে না। দেহের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিও দুর্বল হইয়া আসিতেছে, ক্রমে ক্রমে তারাও নাকি অবশ হইয়া যাইবে,—যাইবেই। কে জানে সে কতদিনে? শ্যামা ভাবিবারও চেষ্টা করে না। জীবনের অধিকাংশ পথ সেও তো অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, ভাবিবার বিষয়বস্তু খানিক খানিক বাছিয়া লইবার শক্তি তাহার জন্মিয়াছে—কত অভিজ্ঞতা শ্যামার, কত জ্ঞান! সধবা থাকিবার জন্য এ বয়সে আর নিরর্থক লড়াই করিতে নাই। এ তো নিয়মের মত অপরিহার্য। আশা যদি থাকিত, শ্যামা কোমর বাঁধিয়া লাগিত শীতলের পিছনে, অবশ পা'টিকে সবল করিয়া তাহাকে খাড়া করিয়া দিত।

মিছামিছি হল্লা শ্যামা আর করিতে চায় না। ক্ষমতাও নাই শ্যামার—অর্থহীন উদ্বেগ, ব্যর্থ প্রয়াসে ব্যয় করিবার মত জীবনীশক্তি আর কই? কতকাল পরে সে সুখের মুখ দেখিয়াছে। এবার সংসারের বাঁধা নিয়মে যতখানি আনন্দ ও শান্তি তাহার পাওয়ার কথা সে শুধু তাই খুঁজিবে, যেদিকে দুঃখ ও পীড়ন চোখ বুজিয়া সেদিকটাকে করিবে অস্বীকার।

ভাল কথা। শ্যামার এতটুকু প্রার্থনা অননুমোদন করিবে কে? স্বামীর আগামী মৃত্যুকে শ্যামা অগ্রাহ্য করুক, ক্ষমা সে পাইবে সকলের। কিন্তু সন্তানের কথা এত সে ভাবিবে কেন? ঝড়ঝাপ্টা আসিলে ওদের আড়াল করিবার জন্য আজও সে থাকিবে কেন উদ্যত হইয়া? পঙ্গু স্বামীর কাছে বসিয়া খুকির অন্ধ চোখ দু'টি দেখিতে দেখিতে কেন সে হিংসা করিবে বকুলের মেয়ের পদ্মপলাশ আঁখি দু'টিকে? একি অন্যায় শ্যামার! জননী হিসাবে শ্যামা তো দেবীর চেয়েও বড়, এত সে মন্দ স্ত্রী কেন? শ্যামার এ পক্ষপাতিত্ব সমর্থনের যোগ্য নয়।

শীতলের অবস্থার জন্য শ্যামার মনে সর্বদা আকুল বেদনা না থাকাটা হয়ত দোষের, তবে সেবাযত্নে শীতলকে সে খুব আরামে রাখে, শীতলের কাছে থাকিবার সময় এত সে শান্ত এত তার সন্তোষ যে রোগযন্ত্রণার মধ্যে শীতল

একটু শান্তি পায়। আদর্শ পত্নীর মত স্বামীর অসুখে শ্যামা যে উতলা নয়, এইটুকু তার সুফল।

খুকিকে দুধ দিয়া শ্যামা নিচে যায়। পথ্য আনে শীতলের। ঘটিভরা জল দেয়, গামলা আগাইয়া ধরে, বিছানায় বসিয়া মুখ ধোয় শীতল। মুখ মোছে শ্যামার আঁচলে। কাঁচা পাকা দাড়ি গোঁফে শীতলের মুখ ঢাকিয়া গিয়াছে, ঋষির মত দেখায় তাহাকে। দীর্ঘ তপস্যা যেন সাঙ্গ হইয়াছে, এবার মহামৃত্যুর সমাধি আসিবে।

কখন? কেহ জানে না। শ্যামা কাজের ফাঁকে ফাঁকে শতবার উপরে আসে, ডাক্তার বলিযাছে শেষ মুহূর্ত আসিবে হঠাৎ, সে সময়টা কাছে থাকিবার ইচ্ছা শ্যামার।

মোহিনী মাঝে মাঝে আসে।

ওরা ভাল আছে বাবা? বকুল আর খুকি?

চিঠি পান নি মা?—মোহিনী জিজ্ঞাসা করে।

শ্যামা একগাল হাসিয়া বলে, হ্যাঁ বাবা, চিঠি তো পেয়েছি—পরশু পেয়েছি যে চিঠি। লিখেছে বটে ভালই আছে—এমনি দশা হয়েছে বাবা আমার, সব ভুলে যাই। কখন কোথায় কি রাখি আর খুঁজে পাইনে, খুঁজে খুঁজে মরি সারা বাড়িতে।

বিধানবাবুর বিয়ে দেবেন না মা?—মোহিনী এক সময় জিজ্ঞাসা করে। বকুল বুঝি চিঠি লিখিয়াছে তাগিদ দিতে। এই কথা বলিতেই হয়ত আসিয়াছে মোহিনী।

শ্যামা বলে, ছেলে যে বিয়ের কথা কানে তোলে না বাবা? বলে মাইনে বাড়ুক। ছেলের মত নেই, বিয়ে দেব কার?

এ বাড়িতে আসিয়া বিবাহের জন্য ছেলেকে শ্যামা যে পীড়াপীড়ি করিয়াছে তা নয়, ভয়ে সে চুপ করিয়া আছে, ধরিয়া লইয়াছে বিবাহ বিধান এখন করিবে না। এর মধ্যে শামুকে বিধান কি আর ভুলিতে পারিয়াছে? যে মায়াজাল ছেলের চারিদিকে কুহকী মেয়েটা বিস্তার করিয়াছিল কয়েক মাসে তাহা ছিন্ন হইবার নয়। শামুর অজস্র হাসি আজও শ্যামার কানে লাগিয়া

আছে। এখন ছেলেকে বিবাহের কথা বলিতে গিয়া কি হিতে বিপরীত হইবে? যে রহস্যময় প্রকৃতি তাহার পাগল ছেলের, কিছুদিন এখন চুপচাপ থাকাই ভাল।

মোহিনী বলে, বিধানবাবুর অমত হবে না মা, আপনি মেয়ে দেখুন।

মোহিনীর বলার ভঙ্গিতে শ্যামা অবাক হইয়া যায়। এত জোর গলায় মোহিনী কি করিয়া ঘোষণা করিতেছে বিধানের অমত হইবে না? বিধানের মন সে জানিল কিসে?

তারপর মোহিনী কথাটা পরিষ্কার করিয়া দেয়। বলে যে ক'দিন আগে বিধান গিয়াছিল তাহার কাছে, বিবাহের ইচ্ছা জানাইয়া আসিয়াছে।

যেচে বিয়ে করতে চান শুনে প্রথমটা অবাক হয়ে গিয়েছিলাম মা, তারপর ভেবে দেখলাম কি জানেন,—আপনার শরীর ভাল নয় কাজকর্ম করতে কষ্ট হয় আপনার। ভেবে চিন্তে তাই সম্মত হয়েছেন। ওসব কিছু বললেন না অবিশ্যি, বলবার মানুষ তো নন্,—

শ্যামা জানে না! পড়া ছাড়িয়া বিধান একদিন হঠাৎ চাকুরি গ্রহণ করিয়াছিল, আজ বিবাহে মত দিয়াছে। সেদিন অভাবে অনটনে শ্যামা পাগল হইতে বসিয়াছিল, আজ সংসারের কাজ করিতে তাহার কষ্ট হইতেছে। সেবার বিধান ত্যাগ করিয়াছিল বড় হওয়ার কামনা, এবার ত্যাগ করিয়াছে মত। শুধু মত হয়ত নয়। মৃত আর শামুর স্মৃতি হয়ত আজও একাকার হইয়া আছে ছেলের মনে।

তা হোক, ছেলেরা এমনি ভাবেই বিবাহে মত দিয়া থাকে, মায়ের জন্য। নহিলে স্বপন দেখিবার বয়সে কেহ কি সাধ করিয়া বিবাহের ফাঁদে পড়িতে চায়। তারপর সব ঠিক হইয়া যায়। বৌএর দিকে টান পড়িলে তখন আর মনেও থাকে না কিসের উপলক্ষে বৌ আসিয়াছে, কার জন্য। চোখের জলের মধ্যে শ্যামা হাসে। খুঁজিয়া পাতিয়া ছেলের জন্য বৌ সে আনিবে পরীর মত রূপসী, মার জন্য বিবাহ করিতে হইয়াছিল বলিয়া দু'দিন পরে আর আপশোষ থাকিবে না ছেলের—মনে থাকিবে না শামুকে।

শ্যামার মনে আবার উৎসাহ ভরিয়া আসিল। জীবনে কাজ তো এখনো তার কম নয়! আনন্দ উৎসবের পথ তো খোলা কম নয়! এত সে শ্রান্ত হইয়া

গিয়াছিল কেন? কত বড় সংসার গড়িয়া উঠিবে তাহার। এখনি হইয়াছে কি! বিধানের বৌ আসিবে, মণির বৌ আসিবে, ফণীর বৌ আসিবে,—যে ঘরে ওদের সে প্রসব করিয়াছিল সেই ঘরে এক একটি শুভদিনে আসিতে থাকিবে নাতিনাতনির দল। দোতালায় সে আরও ঘর তুলিবে, পিছন দিকের উঠানে দালান তুলিয়া আরও বড় করিবে বাড়ি। অত বড় বাড়ি তাহার ভরিয়া যাইবে নবীন নবনারীতে—ও-বাড়ির নকুড় বাবুর শাশুড়ির মত মাথায় শনের নুড়ি ঝুলাইয়া কুঁজো হইয়া সে দাঁড়াইয়া থাকিবে জীবনের সেই বিচিত্র উজ্জ্বল আবর্তের মাঝখানে!

সবই তো এখনো তাহাব বাকি?

কেবল একটা দুঃখ তাহাকে আজীবন দহন করিবে। তার অন্ধ মেয়েটা। ওর জন্য অনেক চোখের জল ফেলিতে হইবে তাহাকে।

শ্যামা মেয়ে খুঁজিতে লাগিল। সুন্দরী, সদ্বংশজাতা, স্বাস্থ্যবতী, গৃহকর্মনিপুণা, কিছু কিছু গানবাজনা লেখাপড়া সেলাইএর কাজ জানা, চোদ্দ পনর বছর বয়সের একটি মেয়ে। খানিকটা শামুর মত, খানিকটা শ্যামার ভাড়াটে সেই কনকের মত আর খানিকটা শ্যামার কল্পনার মত হইলেই ভাল হয়। টাকা শ্যামা বেশি চায় না, অসম্ভব দাবী তার নাই।

কয়েকটি মেয়ে দেখা হইল, পছন্দ হইল না। তারপর পাড়ার এক-বাড়ির গৃহিণী, শ্যামার সঙ্গে তার মোটামুটি আলাপ ছিল, একটি খুব ভাল মেয়ের সন্ধান দিলেন। শহরের অপরপ্রান্তে গিয়া মেয়েটিকে দেখিবামাত্র শ্যামা পছন্দ করিয়া ফেলিল। বড় সুন্দরী মেয়েটি, যেমন রঙ তেমনি নিখুঁত মুখ চোখ। আর কোমল আর ক্ষীণ আর ভীরু। শ্যামাকে যখন সে প্রণাম করিল মনে হইল দেহের ভার তুলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না, এমন নরম সে মেয়ে, এত তার কোমলতা।

মেয়ে পছন্দ করিয়া শ্যামা বাড়ি ফিরিল। সে বড় খুসি হইয়াছে। এমন মেয়ে যে খুঁজিলেও মেলে না! কি রূপ, কি নম্রতা! ওর কাছে কোথায় লাগে শামু?

মোহিনীর সঙ্গে বিধানকে সে একদিন জোর করিয়া মেয়ে দেখিতে পাঠাইয়া দিল। ফিরিয়া আসিয়া মোহিনী বলিল, না মা, পছন্দ হল না মেয়ে।

শ্যামা যেন আকাশ হইতে পড়িল।

কার পছন্দ হল না, তোমার?

আমার পছন্দ হয়েছে। বিধানবাবুর পছন্দ নয়।

পছন্দ নয়? ওই মেয়ে পছন্দ নয় বিধানের? বাংলাদেশ খুঁজিলে আর অমন মেয়ে পাওয়া যাইবে? বিধান বলে কি?

কেন পছন্দ হল না খোকা?

বিধান বলিল, দুর, ওটা মানুষ নাকি? ফুঁ দিলে মটকে যাবে।

না, শামুকে ছেলে আজও ভোলে নাই। শামুর নিটোল গড়ন, শামুর চপল চঞ্চল চলা-ফেরা, শামুর নির্লজ্জ দুরন্তপনা আজও ছেলের দৃষ্টিকে ঘেরিয়া রহিয়াছে, আর কোনো মেয়েকে তার পছন্দ হইবে না। শ্যামার মুখে বিষাদ নামিয়া আসে। ফুঁ দিলে মটকাইয়া যাইবে? মেয়েমানুষ আবার ফুঁ দিলে মটকায় নাকি! শামুর মত সবল দেহ থাকে কটা মেয়ের? থাকা ভালও নয়। কাঠ কাঠ দেখায়, পাকা পাকা দেখায়, অসময়ে সর্বাঙ্গে যৌবন আসিলে কি বিসদৃশ দেখায় মেয়েমানুষকে বিধান তার কি জানে? ও যে ধ্যান করিতেছে শামুর, শামুর পুরন্ত সুঠাম দেহটা যে চোখের সামনে ভাসিয়া বেড়াইতেছে ওর।

লজ্জায় দুঃখে ছেলের মুখের দিকে শ্যামা চাহিতে পারে না। রূপ ও সুষমাই যথেষ্ট নয়, ছেলে তার যৌবন চায়। দেহ অপরিপুষ্ট হইলে ছবির মত সুন্দরী মেয়েও ওর পছন্দ হইবে না। ছি, একি রুচি বিধানের?

ওরকম বৌ আসিলে শ্যামা তো তাকে ভালবাসিতে পারিবে না!

আবার মেয়ে খোঁজা হইতে লাগিল। মেয়ে খুঁজিতে খুঁজিতে কাবার হইয়া গেল মাঘ মাস।

ফাল্গুনের গোড়ায় শীত কমিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে শ্যামা সতেজে সুস্থ হইয়া উঠিল।

ফাল্গুনের শেষের দিকে বাগবাজারের উকিল হারাধন বাবুর মা-হারা মেয়েটার সঙ্গে বিধানের বিবাহ হইয়া গেল। মেয়ের নাম সুবর্ণলতা।

শ্যামা যা ভাবিয়াছিল তাই। মস্ত ধাড়ি মেয়ে, যৌবনের জোয়ার নয় একেবারে বান ডাকিয়াছে! রঙ মন্দ নয়, মুখ চোখ মন্দ নয়, কিন্তু শ্যামার

চোখে ওসব পড়িল না, সে সভয়ে শুধু বৌএর সুস্থ ও সুন্দর শরীরটি দেখিয়া মনে মনে সকাতর হইয়া রহিল।

বাড়ন্ত বৌ এনেছ, না গো?—বলিল সকলে।

হ্যাঁ বাছা, জেনে শুনেই এনেছি, ছোট মেয়ে ছেলেরও পছন্দ নয়, আমারও নয়। একা আর পেরে উঠিনে মা সংসারের ঘানি টানতে, বড় সড় বৌটি এল শেখাতে হবে না কিছু, নিজেই সব পারবে।—বলিযা শ্যামা কষ্টে একটু হাসিল।

তা, মন্দ কি হযেছে বৌ? প্রিতিমের মত মুখখানা। সকলে বলিল।

তাই নাকি? শ্যামা ভাল করিয়া সুবর্ণের মুখের দিকে চাহিল। তা হইবে।

বিবাহ উপলক্ষে বকুল আসিয়াছিল, বাখালের সঙ্গে মন্দাও আসিয়াছিল। বকুল আসিয়াছিল তিন দিনের জন্য, বিবাহের হৈ চৈ থামিবার আগেই সে চলিযা গেল। বৌকে ভাল লাগিয়াছে বকুলের। যাওয়ার সময় এই কথা সে শ্যামাকে বলিয়া গেল।

শ্যামা বলিল, তোর কি পছন্দ বুঝিনে বাবু, এত কি ভাল যে একেবারে গদগদ হয়ে গেলি?

বকুল বলিল, দেখো, ও বৌ যদি ভাল না হয় কান কেটে নিও আমার, মা-মরা মেযে একটু আদরযত্ন পাবে যার কাছে প্রাণ দেবে তার জন্যে। কি বলছিল জান? বলছিল তুমি নাকি ওর মার মত।

তাই নাকি? তা হইবে।

বকুল চলিযা গেল, বৌ চলিয়া গেল, বিবাহ বাড়ি নিঝুম হইয়া আসিল, রহিয়া গেল মন্দা। এই তো সেদিন শ্যামা মন্দার আশ্রয় ছাড়িয়া আসিযাছে, দাসীর মত খাটিয়াছে মন্দাব সংসারে, অহোরাত্র মন যুগাইয়া চলিযাছে, সে স্মৃতি ভুলিবার নয়। একবিন্দু কৃতজ্ঞতা নাই শ্যামার, মন্দা রহিয়া গেল বলিয়া সে এতটুকু কৃতার্থ হইয়া গেল না। কয়েক বছর আশ্রয় দিয়াছিল বলিয়া শ্যামার কাছে কি সমাদর মন্দা আশা করিয়াছিল সেই জানে, বোধ হয় ভাবিয়াছিল আজও শ্যামার উপর কর্তৃত্ব করিতে পারিবে। কিন্তু

সে না পাইল মনের মত সমাদর, না পারিল কোনদিকে কর্তৃত্ব করিতে। শ্যামার সংসারে কি কর্তৃত্ব আর সে করিতে চাহিবে, ভাল করিয়া আবার শীতলের চিকিৎসা করানোর জন্যই তাহার উৎসাহ দেখা গেল সব চেয়ে বেশি। বলিল, রয়ে কি গেলাম সাধে? কি করে রেখেছ তোমরা দাদাকে। দাদাকে ভাল না করে আমি এখান থেকে নড়ছিনে বৌ!

কত সে দরদী বোন, কত তার ভাবনা। কে জানে, হইতেও পারে। আজ তো সপুত্র সকন্যা শ্যামার ভবিষ্যৎ অন্ধকার নয়, কিছুই তো ওদের জন্য আর তাহাকে করিতে হইবে না, শীতলের জন্য হয় তো তাই আন্তরিক ব্যাকুলতাই মন্দার জাগিয়াছে। শ্যামাকে সে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল।

শ্যামা বলিল, ওর আর চিকিচ্ছে নেই ঠাকুরঝি, ওর চিকিচ্ছে এখন সেবাযত্ন।

মন্দা স্তম্ভিত হইয়া বলিল, মুখ ফুটে এমন কথা তুমি বলতে পারলে বৌ! তুমি কি গো, এ্যাঁ?

শ্যামা বলিল, কি বলতে হবে তুমিই না হয় তবে বলে দাও?

মন্দা রাগিয়া উঠিল, কাঁদিয়াও ফেলিল। কে জানে অকৃত্রিম বেদনায় মন্দা কাতর হইয়াছে কিনা। এতো অর্থ সাহায্যের কথা নয়, ভারবহনের কথা নয়, ভাইএর জীবন তাহার। চিকিৎসা নাই, ভাই তাহার বাঁচিবে না? মন্দার হয় তো ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। শীতলের অসংখ্য পাগলামি আর অজস্র স্নেহ,—বড় ভালবাসিত শীতল তাহাকে। সেই দিনগুলি কোথায় হারাইয়া গিয়াছে, কিন্তু এই বাড়িতেই সে সব ঘটিয়াছিল। এখানে বসিয়া অনায়াসে কল্পনা করা চলে সে সব ইতিহাস। হয় তো তাই মন্দার কান্না আসে।

বলে, দাদার জন্যে কিছুই করবে না তুমি? ডাক্তার কবরেজ দেখাবে না?

শ্যামা বলে, ডাক্তার কি দেখানো হয় নি ঠাকুরঝি? ডাক্তার না দেখিয়ে চুপ করে বসে আছি আমি? ষোল টাকা ভিজিট দিয়ে ডাক্তার এনেছি, কলকাতার সেরা কবরেজকে দেখিয়েছি—জবাব দিয়েছে সবাই। আমি আর কি করব?

তবে আর কি, কর্তব্য করেছ এবার টান দিয়ে ফেলে দাও দাদাকে

রাস্তায়! আজ বুঝতে পারছি বৌ দাদা কেন বিবাগী হয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

এতকাল পরে মন্দা তবে শ্যামাকে চিনিতে পারিয়াছে?

শীতলের পায়ের কাছে বসিয়া মন্দা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। চমকাইয়া উঠিয়া বড় ভয় পায় শীতল। দাড়ির ফাঁকে একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করে, আমার সেই কুকুরটা আছে মন্দা?

দাদা গো! বলিয়া মন্দা হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ওঠে।

শীতল থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে। মনে হয় আর কিছুদিন যদি বা সে বাঁচিত মন্দার বুকফাটা কান্নায় এখুনি মরিযা যাইবে। বড় কষ্ট হয় শীতলের, বড় ভয় করে। বড় বড় কালো লোমশ পা ফেলিয়া নিজের মরণকে সে যেন আগাইযা আসিতে দেখিতে পায়। বিহ্বল দৃষ্টিতে সে চাহিয়া থাকে মন্দার দিকে।

দরজার কাছে দাঁড়াইয়া শ্যামা বলে, ঠাকুরঝি, শোন, বাইরে এসো একবার—

সকলেই বুঝিতে পারে মরণাপন্ন মানুষের কাছে এভাবে কাঁদিতে নাই এই কথা বলিতে চায় শ্যামা। মন্দা চোখ মুছিয়া উদ্ধত ভঙ্গিতে সোজা হইয়া বসে। বেশ করিয়াছে কাঁদিয়া। শীতলও বুঝি তাই মনে করে। মন্দার আকস্মিক কান্নায় আঁতকাইয়া উঠিয়া তাহার দম বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল, তবু শ্যামার বুদ্ধি বিবেচনার চেয়ে যে দরদের কান্না মারিয়া ফেলার উপক্রম করে তাই বুঝি ভাল শীতলের কাছে। কি উৎসুক চোখেই সে মন্দার অশ্রুসিক্ত মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। ছেলেবেলা বকুল আর বনগাঁয় মন্দার সেই কুকুরটা ছাড়া এ জগতে সকলে ফাঁকি দিযাছে শীতলকে।

দিন কুড়ি থাকিয়া মন্দা চলিয়া গেল। আসিল নববর্ষ আর গ্রীষ্ম। শীতের শেষে শ্যামার শরীরটা ভাল হইয়াছিল, গরমে আবার যেন সে দুর্বল হইয়া পড়িল। কাজ করিতে শ্রান্তি বোধ হয়। সন্ধ্যার সময় হাত-পা চিবাইতে থাকে। কিন্তু কাহাকেও সে তাহা বুঝিতে দেয় না, চুপ করিয়া থাকে। কেন, দুর্বল শরীরে খাটিয়া মরে কেন শ্যামা? তার সেবা করার জন্য ছেলে না তার বিবাহ করিয়াছে? বৌকে আনাইয়া লইলেই তো এবার সে অনায়াসে বসিয়া

বসিয়া আয়াস করিতে পারে! কিন্তু কেন যেন বৌকে আনিবার ইচ্ছা শ্যামার হয় না। না আনিলে অবশ্য চলিবে না, ছেলের বৌকে কি বাপের বাড়ি ফেলিয়া রাখা যায় চিরদিন? যাক্, দুদিন যাক্।

একদিন বিধান আপিস গিয়াছে, কোথা হইতে রঙীন খাম আসিল একখানা, আকাশের মত নীল রঙের! শ্যামা অবাক হইয়া গেল। এর মধ্যে চিঠি লিখিতে সুরু করিয়াছে বৌ? ওদের ভাব হইল কবে? কদিনের বা দেখা-শোনা! বিধান লুকাইয়া লুকাইয়া যায় না তো শ্বশুরবাড়ি? নিজের মনে শ্যামা হাসে। লুকাইয়া শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার ছেলেই বটে তার! কি লিখিয়াছে বৌ? চিঠিখানা সে বিধানের মশারির উপব রাখিয়া দিল।

বিধান আসিলে বলিল, তোর একখানা চিঠি এসেছে খোকা, রেখে দিয়েছি মশারির ওপোর।

বিধান চিঠি পড়িয়া পকেটে রাখিয়া দিল।

বাগবাজারের চিঠি বুঝি? ওরা ভাল আছে?—শ্যামা জিজ্ঞাসা করিল।

বিধান বলিল, আছে।

ছেলের সংক্ষিপ্ত জবাবে শ্যামা যেন একটু রাগ করিয়াই সরিয়া গেল।

কয়েকদিন পরে একটা ছুটির দিনে শ্যামা একটু বিশেষ আয়োজন করিয়াছিল রান্নার। রাঁধিতে রাঁধিতে অনেক বেলা হইযা গেল। রান্নাঘরেব ভিতরটা, অসহ্য গরম, শ্যামা যেই বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ওমনি মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গেল। সামান্য ব্যাপার, মূর্ছাও নয, সন্ন্যাস-রোগও নয়, মাথায় একটু জলটল দিতেই শ্যামা সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিল। বিধান কিন্তু তাহাকে সেদিন আর উঠিতে দিল না, শোয়াইয়া রাখিল। বিকালে বিধান বাহির হইযা গেল। রাত্রি আটটার সময ফিরিয়া আসিল সুবর্ণকে সঙ্গে করিয়া।

বিধানের নিষেধ অমান্য করিয়া শ্যামা তখন রাঁধিতে গিয়াছে। সুবর্ণ প্রণাম করিতে সে একেবারে উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

একি রে খোকা? বলা নেই কওয়া নেই বৌমাকে নিয়ে এলি যে তুই? জিজ্ঞেস করা দরকার মনে করলি নে বুঝি একবার?

এরকম অভ্যর্থনার জন্য বিধান প্রস্তুত ছিল না। সে চুপ করিয়া

রহিল। সুবর্ণকে দেখিয়া শ্যামা খুসি হয় নাই? তার সেবা করার জন্য সে যে হঠাৎ বৌকে লইয়া আসিয়াছে এটা সে খেয়াল করিল না? বিধান দুঃখিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সুবর্ণের কি হইল বোঝা গেল না।

শ্যামা মণিকে বলিল, যা ত মণি, তোর বৌদিকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসা গে। .কি সব কান্ড বাবা এদের! রাতদুপুরে হুট করে নতুন বৌকে এনে হাজির—কিসে কি ব্যবস্থা হবে এখন ?

বিধান ভয়ে ভয়ে বলিল. বাইরে তোমার বেযাই বসে আছেন মা।

তাকেও এনেছিস? আমি পারবো না বাবু রাত দুপুরে রাজ্যের লোকের আদব আপ্যেন কবতে. মাথা বলে ছিঁড়ে যাচ্ছে আমার. গা হাত ধা চিবুচ্ছে যেন মুচড়ে যাচ্ছে.— কি বলে ওদেব তুই নিযে এলি খোকা? এক ফোঁটা বুদ্ধি কি তোর নেই?

কি রাগ শ্যামার! ছেলেবেলা যাকে সে ধমক দিতে ভয় পাইত সেই ছেলেকে কি তার শাসন ' বেশ গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়াই সে রাঁধিতে আসিয়া-ছিল। সুবর্ণকে দেখিযাই তার মাথা ধরিয়া গেল, গা-হাত চিবাইতে আরম্ভ কবিল, শ্যামার অন্ত পাওযা ভার। কি শোচনীয় ভাবে তার মনের জোর কমিয়া গিযাছে! তারই সেবার্থে পরিণীতা পত্নীকে তারই সেবার জন্য অসময়ে বিধান টানিয়া লইযা আসিয়াছে.—শুধু অনুমতি নেয নাই, আগে ছেলের এই কাণ্ডে শ্যামা কত কৌতুক বোধ করিত, কত খুসি হইত, আজ শুধু বিরক্ত হওয়া নয়, বিরক্তিটুকু চাপিয়া পর্যন্ত রাখিতে পারিতেছে না। এ আবার কি রোগ ধরিল শ্যামাকে? ছেলে একটি যৌবনোচ্ছলা মেয়েকে বাছিয়া বিবাহ করিয়াছে বলিযা জননীর কি এমন অবুঝ হওয়া সাজে।

ছেলে তো এখনো পর হইয়া যায় নাই? মেনকা উর্বশী তিলোত্তমার মোহিনী মায়াতেও পর হইয়া যাওয়ার ছেলে তো সে নয? শ্যামা কি তা জানে না? এমন অন্ধ জ্বালাবোধ কেন তার ?

বোধ হয় হঠাৎ বলিয়া, ওরা খবর দিয়া আসিলে এতটা হয়ত হইত না। ক্রমে ক্রমে শ্যামা শান্ত হইল। একবার পরণের কাপড়খানার দিকে চাহিল. —না, হলুদ-কালি-মাখা এ কাপড়ে কুটুমের সামনে যাওয়া যায় না।—যা ত' খোকা, চট করে ওপোর থেকে একটা সাফ কাপড় এনে দে তো আমায়। কাপড়

বদলাইয়া শ্যামা বাহিরের ঘরে গেল। হারাধন বিধানের বিছানায় বসিয়াছিল, শীর্ণদেহ লম্বাকৃতি লোক, হাতের ছাতিটার মত জরাজীর্ণ, দেখিতে অনেকটা সেই পরাণ ডাক্তারের মত।

শ্যামাকে দেখিযা হারাধন বুঝি একটু অবাক হইল। বলিল, আহা, আপনি কেন উঠে এলেন? কেমন আছেন এখন ?

শ্যামা বলিল, খোকা বুঝি বলেছে আমার খুব অসুখ?

হারাধন বলিল, তাই তো বললে, গিয়ে একদণ্ড বসলে না, তাড়াহুড়ো করে সবাইকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল,—কাপড় ক'খানা গুছিয়ে আনার সময়ও মেয়েটা পায় নি। মেয়ের মাসি কেঁদে মরছে, অমন করে কেউ মেয়ে পাঠাতে পারে বেয়ান?

বোঝা গেল, শ্যামাকে সুস্থ দেখিযা হারাধন অসন্তুষ্ট হইয়াছে। হারাধনের অসন্তোষে শ্যামা কিন্তু খুসি হইল। মধুর কণ্ঠে বলিল, ওমনি পাগল ছেলে আমার বেয়াই, আমার একটু কিছু হলে কি করবে দিশে পায় না। সকালে উনুনের ধাব থেকে বাইরে এসে মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল, পড়ে গেলাম উঠানে, তাইতে ভড়কে গেছে ছেলে।—বড় তো কষ্ট হ'ল আপনাদের?

শ্যামা মিষ্টি আনাইল, খাইতে পীড়াপীড়ি করিল, হারাধন কিছু খাইল না। খাইতে নাই। বলিয়া গেল, নাতি হইলে যাচিয়া আসিয়া পাত পাড়িবে। হারাধনকে বিদায় করিয়া শ্যামা সুবর্ণের খোঁজে গেল।

কোথায় গেল সুবর্ণ? সে তো একতলায় নাই!

সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া শ্যামা উপরে গেল। শীতলের পায়ের কাছে মাথা নত করিয়া সুবর্ণ বসিয়া আছে, তার কোলে শ্যামার অন্ধ মেয়েটি। থাবা পাতিয়া বসিয়া ফণী হাঁ করিয়া বৌদিদির মুখখানা দেখিতেছে, আহ্লাদে গদগদ হইয়া মণি কথা কহিতে গিয়া ঢোঁক গিলিতেছে। ধীরে ধীরে শীতল কি যেন জিজ্ঞাসা করিতেছে সুবর্ণকে। সুবর্ণের মুখখানা ঈষৎ আরক্ত, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, চন্দনের স্বচ্ছ ফোঁটার মত।

ঘরের মেয়ে? তাই তো বটে! তার স্বামী-পুত্রের মাঝখানে ওকে তো অনভ্যস্ত, আকস্মিক আগন্তুক মনে হয় না। ঘরের মেয়ের মতই যে দেখাইতেছে সুবর্ণকে?

শ্যামা আগাইয়া গেল, বলিল, বৌমা, কিছু খাওনি বিকেলে, এসো তোমায় খেতে দি।

নতুন বৌএর আর ভাল মন্দ কি, সে তো শুধু একতাল লজ্জা ভয় নম্রতা, তবু ওর মধ্যেই মনটা বোঝা যায়, সরল না কুটিল, কুড়ে না কাজের লোক। মা-হারা মেয়ে? কথাটা শ্যামার মনে থাকে না,--তুমিই আমার হারাণো মা, বলিয়া শ্যামার স্নেহের ভাণ্ডারে ডাকাতি করিবার মেয়েও সুবর্ণ নয়, সে সরল কিন্তু বুদ্ধিমতী, কাজের মানুষ কিন্তু কুলরমণী নয়। দরকার মত একখানা দুখানা বাসন সে বাসন-মাজার মতই মাজিয়া আনে, কাজটুকু করিতে পাইয়া এমন উৎফুল্ল হইয়া ওঠে না যে মনে হইবে পুষ্প-চয়ন করিতে পাইয়াছে। শাশুড়ীর হাতের কাজ কাড়িয়া যে বৌ কাজ করে কোনো শাশুড়ীই তাকে দেখিতে পারে না, সুবর্ণ সে চেষ্টা করে না, স্বাভাবিক নিয়মে যে সব কাজ শ্যামার হাত হইতে খসিয়া তাহার হাতে আসে মন দিয়া সেইগুলিই সে করিয়া যায়, আব একটি সজাগ দৃষ্টি পাতিয়া রাখে শ্যামার মুখে, আলো নিভিয়া মেঘ ঘনাইযা আসিবার উপক্রমেই চালাক মেয়েটা ত্রুটি সংশোধন করিযা ফেলে।

নেহাৎ দোষ করিয়া ফেলিলে প্রয়োগ করে একেবারে চরম অস্ত্র! চোখ দুটা জলে টাবুটুবু ভর্তি করিয়া শ্যামাব সামনে মেলিয়া ধরে। ভাল করিযা সুরু করার আগেই শ্যামার মুখের কথাগুলি জমিয়া যায়।

শ্যামা হঠাৎ সুর বদলাইয়া সস্নেহে হাসিয়া বলে, আ আবাগের বেটি, এই কথাতে চোখে জল এল! কি আর বলেছি মা তোকে এ্যাঁ?

চোখ! অশ্রুসজল চোখকে শ্যামা বড় ডরায়। মানুষের চোখের সম্বন্ধে সে বড় সচেতন। চোখ ছিল তার বকুলের আর চোখ হইয়াছে বকুলের মেয়েটার! শ্যামার মেয়েটি অন্ধ, এত যে আলো জগতে একটি রেখাও তার খুকির চেতনায় পৌঁছায় না। সজল চোখে চাহিয়া যে-কোন দৃষ্টিমতী শ্যামাকে সম্মোহন করিতে পারে।

বড় দোটানায় পড়িয়াছে শ্যামা।

ছেলের বৌটাকে ভালবাসিবে কি বাসিবে না।

এমনি মন্দ লাগে না, মায়া করিতে ইচ্ছা হয়, বকুল যে ফাঁকটা রাখিয়া গিয়াছে সুবর্ণকে দিয়া তাহা ভরিয়া তুলিবার কল্পনা প্রিয়ই মনে হয় শ্যামার। কিন্তু হঠাৎ তাহার চমক ভাঙে, উঃ একি হিল্লোল তুলিয়া সামনে দিয়া হাঁটিয়া গেল বৌ, একি আগুন ওর দেহময়? এমন করিয়া কে ওকে গড়িয়াছিল, রক্তমাংসের এই মোহিনীকে? সুবর্ণ ম্লান করে, চাহিয়া দেখিয়া শ্যামার বুকের রক্ত যেন শুকাইয়া যায়। বড় ভয় করে শ্যামার। কে জানে ওর ওই ভয়ানক সুন্দর দেহের আকর্ষণে কোথা দিয়া অমঙ্গল ঢুকিবে সংসারে।

কড়া শীতে যেমন হইয়াছিল, চড়া গরম পড়িতে শ্যামার শরীর আবার তেমনি খারাপ হইয়া গেল। এবার একটা অতিরিক্ত উপসর্গ দেখা দিল—তিরিক্ষে মেজাজ। অল্পে অল্পে আরম্ভ করিয়া জ্যৈষ্ঠের শেষে বকুনি ছাড়া কথা বলাই যেন সে বন্ধ করিয়া দিল। থাকে থাকে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া ওঠে, যাকে পায় তাকেই যত পারে বকে, তারপর অদৃষ্টের নিন্দা করিতে করিতে কাঁদিয়া ফেলে। শ্যামার ভয়ে বাড়িশুদ্ধ সকলের মুখ সর্বদা শুকনো দেখায়। সবচেয়ে মুস্কিল হয় সুবর্ণের। অন্য সকলে শ্যামার সম্মুখ হইতে পালাইয়া বাঁচে, তার তো পালানোর উপায় নাই। তার উপর বিধান আবার তাহাকে হুকুম দিয়া রাখিয়াছে, সব সময় কাছে কাছে থাকবে মার, যা বলেন শুনবে, আগুনের আঁচে বেশি যেতে দেবে না, ওপোর-নিচ করতে দেবে না, সেবাযত্ন করবে—মার শরীর ভাল নয় জানত? বিধান বলিয়া খালাস, সকালে উঠিয়া ছেলে পড়াইতে যায়, বাড়ি ফিরিয়াই ছোটে আপিসে, ফেরে সন্ধ্যার পর, সারাদিন শ্যামা কি কাণ্ড করে সে তো দেখিতে আসে না, সুবর্ণের অবস্থা সে কি বুঝিবে! কিছু বলিবার উপায়ও সুবর্ণের নাই। কি বলিবে? যদি বলিতে যায়, বিধান যে ভাবিয়া বসিবে, দ্যাখো এর মধ্যে নালিশ করা সুরু হইয়াছে।

কিন্তু বিধান সব বোঝে। চিরকাল বুঝিয়া আসিয়াছে। সুবর্ণ এখনো জানে না যে বুঝিয়াও বিধান কোনদিন কিছু বলে না, চুপচাপ নিজের কাজ করিয়া যায়, চুপচাপ উপায় ঠাওরায়। বনগাঁয় শ্যামা একবার পাগল হইতে বসিয়াছিল এবারও সেই রকম আরম্ভ হইয়াছে দেখিয়া বিধান কম ভয় পায় নাই, প্রতিবিধানের কোন উপায় শুধু সে খুঁজিয়া পাইতেছে না। ব্যাপারটা

সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যঘটিত, শ্যামাকে লইয়া কোথাও চেঞ্জে যাইতে পারিলে ভাল হইত, কোন ঠাণ্ডা দেশে, দার্জিলিং অথবা সিমলা। সে অনেক টাকার কথা। অত টাকা কোথায় পাইবে সে?

সংসার চালানোর ভাবনাতেই এই বয়সে সে বুড়া হইয়া গেল। এ বাড়িতে সে ছাড়া আর সকলেই বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছে বাড়িটা পর্যন্ত তাদের নয়, মাসে মাসে ভাড়া গুণিতে হয় বিধানকে।

সত্যই কি শ্যামার আবার সেইরকম হইতেছে, বনগাঁয়ে যেমন হইয়াছিল, যেজন্য পড়া ছাড়িয়া চাকরি লইতে হইয়াছিল বিধানকে? শ্যামার চোখের দিকে তাকাও, বাহিরে দুরন্ত রোদের যেমন তেজ তেমনি জ্বালা শ্যামার চোখে। এ বুঝি জীবনব্যাপী দুঃখের অভিশাপ। আজীবন শান্ত আবেষ্টনীর মধ্যে সুরক্ষিত আশ্রয়ের আড়ালে বাস করিতে না পারিলে এমনি বুঝি হইয়া যায় অসহায়া নারী, আজীবন দুঃখ দুর্দশার পীড়ন সহিয়া শেষে যখন সুখী হওয়াব সময় আসে তখন তুচ্ছ আবহাওয়ার উত্তাপেই গলিয়া যায়। আঁচল গায়ে জড়াইয়া শ্যামা কত শীত কাটাইয়া দিয়াছে, তিনটি উনানেব আঁচে বসিয়া পার করিয়া দিয়াছে কত গ্রীষ্ম। এবার সে এত কাবু হইয়া গেল!

তারপর একদিন আকাশে ঘনঘটা আসিল। মাটি জুড়াইল, জুড়াইল মানুষ। বিকারের শেষের দিকে ধীরে ধীরে চুপ করিয়া মানুষ যে ভাবে ঘুমাইয়া পড়ে শ্যামাও তেমনি ভাবে ক্রমে ক্রমে শান্ত ও বিষণ্ন হইয়া আসিল।

সকলে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

তবু, সুবর্ণকে শ্যামা পুরাপুরি সুনজরে দেখিতে পারিল না। একটা বিদ্বেষের ভাব রহিয়াই গেল। বিধান কত আদরের ছেলে শ্যামার, সাত বছর বন্ধ্যা থাকিয়া, প্রথম সন্তানকে বিসর্জন দিয়া ওকে শ্যামা কোলে পাইয়াছিল,—সুবর্ণ তার বৌ। তবু সুবর্ণকে বুকের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিল না, কি দুর্ভাগ্য শ্যামার!

শীতল তেমনি অবস্থায় এখনো বাঁচিয়া আছে, ডাক্তারের ভবিষ্যদ্বাণী বুঝি ব্যর্থ হইয়া যায়! এতদিনে তার মরিয়া যাওয়ার কথা। মৃত্যু কিন্তু দুটি

একটি অঙ্গ গ্রাস করিয়া, সর্বাঙ্গের প্রায় সবটুকু শক্তি শুষিয়া তৃপ্ত হইয়া আছে, হঠাৎ কবে আবার ক্ষুধা জাগিবে এখনো কেহ তাহা বলিতে পারে না।

শ্যামা বলে, হ্যাঁ গা, বড় কি কষ্ট হচ্ছে? কি করবে বল দেখি? বৌমা বসবে একটু কাছে? গায়ে হাত বুলিয়ে দেবে? কোন্‌খানে কষ্ট তোমার? ও মণি ডাকতো তোর বৌদিকে, ওষুদ মালিশ করে দিয়ে যাক।—কোথায় যে যায়, ফাঁক পেয়েছে কি ছেলের সঙ্গে ফুসফাস গুজগাজ করতে চলল—কি মন্ত্র দিচ্ছে কানে কে জানে!

সুবর্ণ ওষুদ মালিশ করিতে বসে।

শ্যামা বলে, দেখ তো মণি ও-বাড়ির ছাদে কে? নকুড়বাবুর বাঁশি বাজানে ভাইটে বুঝি? দেতো দরজাটা ভেজিয়ে,—বৌমা, আরেকটু সামলে সুমলেই না হয় বসতে বাছা, একটু বেশি লজ্জা থাকলে ক্ষোতি নেই কারো।

সুবর্ণ জড়সড় হইয়া যায়, রাঙা মুখ নত করে। শ্যামা যখন এমনি-ভাবে বলে কোন উপায়ে মিশাইয়া যাওয়া যায় না শূন্যে?

ভাল লাগে না, বলিয়া শ্যামারও ভাল লাগে না! সুবর্ণের ম্লান মুখখানা দেখিয়া কত কি সে ভাবে। ভাবে, সে যদি আজ ওমনি বৌ হইত এবং আর কেহ যদি ওমনি করিয়া তাকে বলিত, কেমন লাগিত তার? বিধানের কানে গেলে কত ব্যথা পাইবে সে! মণি বড় হইতেছে, কথাগুলি তার মনে না-জানি কি ভাবে কাজ করে! একি স্বভাব, একি জিহ্বা হইয়াছে তার? কেন সে না বলিয়া থাকিতে পারে না? শ্যামা বাহিরে যায়। বর্ষার মেঘলা দিন। ধানকলের অঙ্গনে আর ধান মেলিয়া দেয় না, অতবড় অঙ্গনটা জনহীন, কুলিরমণী নাই, পায়রার ঝাঁক নাই। খুকিকে শ্যামা বুকের কাছে আরও উঁচুতে তুলিয়া ধরে। বিধানের বৌকে কি কটু কথা শ্যামা বলিয়াছে, কি বিষাদ শ্যামার মনে—দিগদিগন্ত চোখের জলে ঝাপসা হইয়া গেল।

আশ্বিনের গোড়ায় হারাধন মেয়েকে লইয়া গেল।

যাওয়ার সময় সুবর্ণ অবিকল মা-হারা মেয়ের মতই ব্যবহার করিয়া গেল। শ্যামা ভালবাসে না, শ্যামা কটু কথা বলে, তবু মনে হইল সুবর্ণ

যাইতে চায় না, এখানে থাকিতে পারিলেই খুসি হইত। শ্যামা নির্বিবাদে ভাবিয়া বসিল, এ'টান বিধানের জন্য—সে যা ব্যবহার করিয়াছে তার জন্য সুবর্ণের কিসের মাথাব্যথা ?

পুজোর পরেই আমায় আনবেন মা।—সুব" সজল চোখে বলিয়া গেল।

শ্যামা শুধু বলিল, আনব।

বিধানের বৌ! সে বাপের বাড়ি যাইতেছে। বুকে জড়াইয়া একটু তো শ্যামা কাঁদিতে পারিত? কিন্তু কি করিবে শ্যামা, যাওয়ার জন্য সুবর্ণ তখন সাজগোজ করিয়াছে, বৌএর সে চোখ-ঝলসানো মূর্তির দিকে শ্যামা চাহিতে পারিতেছিল না, মনে হইতেছিল, যাক্, ও চলিয়া যাক্, দু'দিন চোখ দু'টা একটু জুড়াক শ্যামার।

পুজোর সময় মন্দা আসিয়া কয়েকদিন রহিল। শীতলকে দেখিতে আসিয়াছে। মন্দার জন্য সুবর্ণকেও দু'দিন আনিয়া রাখা হইল। সুবর্ণ ফিরিয়া গেলে একদিন মন্দা বলিল, হ্যাঁ বৌ, একটা কথা বলি তোমায়, ভাল করে তাকিয়ে দেখেছ বৌমাব দিকে? আমার যেন সন্দেহ হ'ল বৌ।

শ্যামা চমকাইয়া উঠিল। তারপর হাসিয়া বলিল, না ঠাকুরঝি, ও তোমার চোখের ভুল।

মন্দার চোখের ভুলকে শ্যামা কিন্তু ভুলিতে পারিল না, দিবারাত্রি মনে পড়িতে লাগিল সুবর্ণকে আর মন্দার ইঙ্গিত। কি বলিয়া গেল মন্দা? সত্য হইলে শ্যামা কি অন্ধ, তার চোখে পড়িত না? শ্যামা বড় অন্যমনস্ক হইযা গেল। সংসারের কাজে বড় ভুল হইতে লাগিল শ্যামার। কি মন্ত্র মন্দা বলিযা গিয়াছে, সুবর্ণকে দেখিবার জন্য শ্যামার মন ছটফট করে, সে ধৈর্য ধরিয়া থাকিতে পারে না। একদিন মণিকে সঙ্গে করিয়া সে চলিযা গেল বাগবাজারে।' মন্দার মন্ত্র কি শ্যামার চোখে অঞ্জনও পরাইয়া দিয়াছে? কই, সুবর্ণের দিকে চাহিয়া এবার তো শ্যামার চোখ পীড়িত হইয়া উঠিল না?

.শ্যামা বলিয়া আসিল, সামনের রবিবার দিন ভাল আছে, ওইদিন বিধান আসিয়া সুবর্ণকে লইয়া যাইবে। না, তাকে বলা মিছে, বৌকে সে আর বাপের বাড়ি ফেলিয়া রাখিতে পারিবে না।

সুবর্ণের মাসি বলিল, এই তো সেদিন এল, এর মধ্যে এত তাড়া কেন? আরেকটা মাস থেকে যাক্।

শ্যামা বলিল, না বাছা না, তুমি বোঝ না,—যার ছেলের বৌ সে ছাড়া কারো বুঝবার কথা নয়,—ঘর আমার আঁধার হয়ে আছে।

একে একে দিন গেল। ঋতু পরিবর্তন হইল জগতে। শীত আসিল, শীতল পরলোকে গেল, শ্যামা ধরিল বিধবার বেশ, তারপর শীতও আর রহিল না। সুবর্ণকে শ্যামা যেন বুকের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া একটি দিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, কোথায় গেল ক্ষুদ্র বিদ্বেষ, তুচ্ছ শত্রুতা! সুবর্ণের জীবন লইযা শ্যামা যেন বাঁচিয়া রহিল। তারপর এক চৈত্র নিশায় এ বাড়ির যে ঘরে শ্যামা একদিন বিধানকে প্রসব করিয়াছিল সেই ঘরে সুবর্ণ অচৈতন্য হইযা গেল, ঘরে রহিল কাঠকয়লা পুড়িবার গন্ধ, দেয়ালে রহিল শাযিত মানুষের ছায়া, জানালার অল্প একটু ফাঁক দিয়া আকাশের কয়েকটা তারা দেখা গেল আর শ্যামার কোলে স্পন্দিত হইতে লাগিল জীবন।

শেষ